উপক্রমণিকা

মহান দেশনায়ক সুভাষচন্দ্র বসুর নামাঙ্কিত নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্মুক্ত শিক্ষাঙ্গনে আপনাকে স্বাগত। ২০২১-এ এই প্রতিষ্ঠান দেশের সর্বপ্রথম রাজ্য সরকারি মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে ন্যাক (NAAC) মূল্যায়নে 'এ' গ্রেড প্রাপ্ত হয়েছে এবং ২০২৪-এ সমগ্র দেশের মুক্ত শিক্ষাব্যবস্থাক্ষেত্রে NIRF মূল্যায়নে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে। পাশাপাশি, ২০২৪-এই ১২ B-র অনুমোদন প্রাপ্তি ঘটেছে।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন প্রকাশিত জাতীয় শিক্ষানীতি (NEP, 2020)-র নির্দেশনামায় সিবিসিএস পাঠক্রম পদ্ধতির পরিমার্জন ঘটানো হয়েছে। জাতীয় শিক্ষানীতি অনুযায়ী Curriculum and Credit Framework for Undergraduate Programmes (CCFUP)-এ চার বছরের স্নাতক শিক্ষাক্রমকে ছ'টি পৃথক প্রকরণে বিন্যস্ত করার কথা বলা হয়েছে। এগুলি হল- 'কোর কোর্স', 'ইলেকটিভ কোর্স', 'মাল্টি ডিসিপ্লিনারি কোর্স' 'স্কিল এনহান্সমেন্ট কোর্স', 'এবিলিটি এনহ্যান্সমেন্ট কোর্স' এবং ভ্যালু অ্যাডেড কোর্স। ক্রেডিট পদ্ধতির ভিত্তিতে বিন্যস্ত এই পাঠক্রম শিক্ষার্থীর কাছে নির্বাচনাত্মক পাঠক্রমে পাঠ গ্রহণের সুবিধে এনে দেবে। এরই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ষান্মাসিক মূল্যায়ন ব্যবস্থা এবং ক্রেডিট ট্রান্সফারের সুযোগ। জাতীয় শিক্ষানীতি পরিমাণগত মানোন্নয়নের পাশাপাশি গুণগত মানের বিকাশ ঘটানোর লক্ষ্যে National Higher Education Qualifications Framework (NHEQF) এবং National Skills Qualification Framework (NSQF)-এর সঙ্গে সাযুজ্য রেখে চার বছরের স্নাতক পাঠক্রম প্রস্তুতির দিশা দেখিয়েছে। শিক্ষার্থী-কেন্দ্রিক এই ব্যবস্থা মূলত গ্রেড-ভিত্তিক, যা অবিচ্ছিন্ন ও অভ্যন্তরীণ মূল্যায়নের মাধ্যমে সার্বিক মূল্যায়নের দিকে অগ্রসর হবে এবং শিক্ষার্থীকে বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে যথোপযুক্ত সুবিধা দেবে। শিক্ষাক্রমের প্রসারিত পরিসরে বিবিধ বিষয় চয়নের সক্ষমতা শিক্ষার্থীকে দেশের অন্যান্য উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আন্তঃব্যবস্থায় অর্জিত ক্রেডিট স্থানান্তরে সাহায্য করবে। শিক্ষার্থীর অভিযোজন ও পরিগ্রহণ ক্ষমতা অনুযায়ী পাঠক্রমের বিন্যাসই এই জাতীয় শিক্ষানীতির লক্ষ্য। উচ্চশিক্ষার পরিসরে এই পদ্ধতি এক বৈকল্পিক পরিবর্তনের সূচনা করেছে। আগামী ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষ থেকে স্নাতক স্তরে এই নির্বাচনভিত্তিক পাঠক্রম কার্যকরী করা হবে, এই মর্মে নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। বর্তমান পাঠক্রমগুলি উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রের নির্ণায়ক কৃত্যকের যথাবিহিত প্রস্তাবনা ও নির্দেশাবলী অনুসারে রচিত ও বিন্যস্ত হয়েছে। বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে সেইসব দিকগুলির প্রতি যা ইউ.জি.সি-র জাতীয় শিক্ষানীতি, ২০২০ কর্তৃক চিহ্নিত ও নির্দেশিত।

মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে স্ব-শিক্ষা পাঠ-উপকরণ শিক্ষার্থী-সহায়ক পরিষেবার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সি.বি.সি.এস পাঠক্রমের এই পাঠ-উপকরণ মূলত বাংলা ও ইংরেজিতে লিখিত হয়েছে। শিক্ষার্থীদের সুবিধের কথা মাথায় রেখে আমরা ইংরেজি পাঠ-উপকরণের বাংলা অনুবাদের কাজেও এগিয়েছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের আভ্যন্তরীণ শিক্ষকরাই মূলত পাঠ-উপকরণ প্রস্তুতির ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছেন, যদিও পূর্বের মতোই অন্যান্য বিদ্যায়তনিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংযুক্ত অভিজ্ঞ বিশেষজ্ঞ শিক্ষকদের সাহায্য আমরা অকুণ্ঠচিত্তে গ্রহণ করেছি। তাঁদের এই সাহায্য পাঠ-উপকরণের মানোন্নয়নে সহায়ক হবে বলেই বিশ্বাস। নির্ভরযোগ্য ও মূল্যবান বিদ্যায়তনিক সাহায্যের জন্য আমি তাঁদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। এই পাঠ-উপকরণ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষণ পদ্ধতি প্রকরণে নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। উন্মুক্ত শিক্ষাঙ্গনের পঠন প্রক্রিয়ায় সংযুক্ত সকল শিক্ষকের সদর্থক ও গঠনমূলক মতামত আমাদের আরও সমৃদ্ধ করবে। মুক্ত শিক্ষাক্রমে উৎকর্ষের প্রশ্নে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

পাঠ-উপকরণ প্রস্তুতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল শিক্ষক, আধিকারিক ও কর্মীদের আমি আন্তরিক অভিনন্দন জানাই এবং ছাত্রদের সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করি।

অধ্যাপক ইন্দ্রজিৎ লাহিড়ি

ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য

নেতাজী সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

Netaji Subhas Open University

Four Year Undergraduate Degree Programme
Under National Higher Education Qualifications Framework (NHEQF) &
Curriculum and Credit Framework for Undergraduate Programmes
Bachelor of Arts in Honours [Economics] (FUHEC)
Course Title: Development Economice-I
Course Code: 6CC-EC-03

1st Print : <Month>, 2025
Print Order : <memo no. and Date>

Printed in accordance with the regulations of the Distance Education Bureauof the University Grants Commission.

F/Ranjan/2024/FCC_HI_63_(DSC-5)_FCC-HI_63_New_Book_1st Proof/28_11_2024

Netaji Subhas Open University

Four Year Undergraduate Degree Programme
Under National Higher Education Qualifications Framework (NHEQF) &
Curriculum and Credit Framework for Undergraduate Programmes
Bachelor of Arts in Honours [Economics] (FUHEC)
Course Title: Development Economice-I
Course Code: 6CC-EC-03

: Board of Studies :

Members

Prof. Anirban Ghosh
Director (i/c), SPS, NSOU

Prof. Biswajit Chtterjee
NSOU

Dr. Bibekananda Roy Chowdhury
NSOU

Dr. Seikh Salim,
NSOU

Dr. Asim Kumar Karmakar,
NSOU

Mrs. Priyanthi Bagchi
NSOU

Dr. Anindita Sen
Assistant Professor, NSOU

Dr. Sumita Banerjee
Associate Professor,
Chow Chandra College

Dr. Satarupa Bandopadhyay
Associate Professor, Bratone College

Dr. Purba Roychoudhuri
Associate Professor,
Bhauwnipara Education Society College

: Course Writer :
Dr. Mainak Roy
Associate Professor of Economic, NSOU

: Course Editor :
Dr. Monojit Ghosh
Associate Professor, CU

: Format Editor :
Priyanthi Bagchi
NSOU

Notification

All rights reserved. No part of this book may be reproduced in any form without the written permission from Netaji Subhas Open University.

Ananya Mitra
Registrar (Add'l Charge)

Netaji Subhas Open University

UG: Economics

Course Title: Development Economice-I
Course Code: 6CC-EC-03

একক ১	❑	অর্থনৈতিক উন্নয়নের মৌলিক ধারণাগুলি	৭-১৫
একক ২	❑	অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন	১৬-৩০
একক ৩	❑	অর্থনৈতিক উন্নয়নের তত্ত্ব	৩১-৫৭
একক ৪	❑	অনুন্নয়ন এর নিরন্তরতা	৫৮-৭৯
একক ৫	❑	উন্নয়নের কৌশল সমূহ	৮০-১০২
একক 6	❑	Concept of Surplus Labour	১০৩-১২০
একক ৭	❑	অর্থনৈতিক উন্নয়নের বিভিন্ন স্তর গুলি	**১২১-১৩৮**
একক ৮	❑	অর্থনৈতিক অসাম্য সংজ্ঞা, পরিমাপ ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন	১৩৯-১৫১
একক ৯	❑	দারিদ্র্য	**১৫২-১৬০**
একক ১০	❑	দারিদ্র্য পরিমাপের বিভিন্ন সূচকগুলি	১৬১-১৭২

একক ১ ❑ অর্থনৈতিক উন্নয়নের মৌলিক ধারণাগুলি

গঠন

১.১ উদ্দেশ্য

১.২ প্রস্তাবনা

১.৩ অর্থনৈতিক উন্নয়নের সংজ্ঞা

১.৪ উন্নয়নের বিভিন্ন পন্থা

১.৪.১ অংশগ্রহণ মূলক উন্নয়ন

১.৪.২ অন্তর্ভুক্তি মূলক উন্নয়ন

১.৪.৩ স্ববহনক্ষম বা দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়নের ধারণা

১.৫ মানব সম্পদের উন্নয়ন

১.৬ সারাংশ

১.৭ অনুশীলনী

১.৮ গ্রন্থপঞ্জী

১. উন্নয়নের মৌলিক ধারনা (Basic Concepts of Development)

১.১ উদ্দেশ্য

এই এককে আমরা অর্থনৈতিক উন্নয়নের সংজ্ঞা নির্ধারণ করার চেষ্টা করব। বিভিন্ন ধরনের উন্নয়ন সম্পর্কে একটি সম্যক ধারণা দেওয়া হবে। এছাড়া অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির (growth) এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন (development)-এর মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করা হবে। পাশাপাশি অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিমাপ করার সূচক নির্ধারণ করা হবে। মানব সম্পদের উন্নয়ন বলতে ঠিক কী বোঝায় সেটাও ব্যাখ্যা করা হবে।

১.২ প্রস্তাবনা

উন্নয়ন অর্থনীতি নিয়ে আলোচনা শুরু করার আগে আমাদের জানতে হবে উন্নয়ন বলতে কী বোঝায়। এছাড়া অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির সঙ্গে অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূল পার্থক্য কোথায় এটাও আমাদের বিচার্য হবে। জন প্রতি আয়ের ক্রমাগত বৃদ্ধি কি অর্থনৈতিক উন্নয়ন নির্দেশ করে? আমরা দেখব যে মাথাপিছু আয় উন্নয়নের ব্যাখ্যা করার জন্য যথেষ্ট নয়। মানব সম্পদের উন্নতি উন্নয়নের ব্যাখ্যার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয়।

১.৩ অর্থনৈতিক উন্নয়নের সংজ্ঞা

অর্থনৈতিক উন্নয়নের কোনো সর্বসম্মত সংজ্ঞা খুঁজে পাওয়া কঠিন। বস্তুতপক্ষে, অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারণাকে একটি সংজ্ঞার মাধ্যমে প্রকাশ করা বেশ কষ্টসাধ্য। তবে অধ্যাপক Meier এবং Baldwin অর্থনৈতিক উন্নয়নের যে সংজ্ঞা দিয়েছেন তা অনেকটাই সন্তোষজনক। তাঁদের মতে "অর্থনৈতিক উন্নয়ন হল এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে কোনো দেশের মাথাপিছু প্রকৃত জাতীয় আয় দীর্ঘকাল ধরে বৃদ্ধি পায়।"

এই সংজ্ঞাটি বিশ্লেষণ করলে অর্থনৈতিক উন্নয়নের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আমরা লক্ষ করতে পারি।

প্রথমত ঃ অর্থনৈতিক উন্নয়ন একটি প্রক্রিয়া। প্রক্রিয়া বলতে কতকগুলি শক্তির পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া বা ঘাত-প্রতিঘাতকে বোঝায়। বিভিন্ন শক্তির ঘাত-প্রতিঘাতের ফলে যে শেষ ফল পাওয়া যায় সেটি হল মাথাপিছু প্রকৃত জাতীয় আয় বৃদ্ধি।

দ্বিতীয়ত ঃ মাথাপিছু প্রকৃত জাতীয় আয় বৃদ্ধি পেলে তবেই অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটেছে বলা যেতে পারে। মাথাপিছু প্রকৃত আয় বৃদ্ধি পেতে হলে প্রকৃত জাতীয় আয় বৃদ্ধির হার জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অপেক্ষা বেশি হতে হবে। যদি প্রকৃত জাতীয় আয় এবং জনসংখ্যা একই হারে বৃদ্ধি পায় তাহলে মাথাপিছু প্রকৃত জাতীয় আয় একই থাকবে। সেক্ষেত্রে অর্থনৈতিক উন্নয়ন হবে না।

তৃতীয়ত ঃ যদি দ্রব্যসামগ্রীর দামস্তর বাড়তে থাকে তাহলে টাকার অঙ্কে মাথাপিছু আয় বাড়তে পারে, কিন্তু মাথাপিছু প্রকৃত আয় বাড়ছে না। এক্ষেত্রে অর্থনৈতিক উন্নয়ন হয়েছে বলা যাবে না। অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য মাথাপিছু প্রকৃত আয়ের বৃদ্ধি প্রয়োজন। সে জন্য প্রয়োজন দেশের দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন বৃদ্ধি অর্থাৎ প্রকৃত জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধি প্রয়োজন।

চতুর্থত ঃ অর্থনৈতিক উন্নয়ন একটি দীর্ঘকালীন প্রক্রিয়া। এর অর্থ হল যে মাথাপিছু প্রকৃত আয় শুধুমাত্র যদি স্বল্পকালে বৃদ্ধি পায় তাহলে সেটিকে অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলা হবে না। অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটাতে হলে মাথাপিছু প্রকৃত আয়কে দীর্ঘস্থায়ী ভাবে বৃদ্ধি পেতে হবে। স্বল্পকালে মাথাপিছু আয়ের হ্রাস-বৃদ্ধি বাণিজ্যচক্রের প্রভাবে ঘটতে পারে। কিন্তু যদি মাথাপিছু আয় দীর্ঘকালব্যাপী একটি ঊর্ধ্বমুখী গতিধারা (trend) অনুসরণ করে তবে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটেছে বলা যেতে পারে। অনেক অর্থনীতিবিদ্গণ দেশের মাথাপিছু প্রকৃত জাতীয় আয় বৃদ্ধিকে অর্থনৈতিক উন্নয়ন না বলে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি (economic growth) বলে থাকেন। তাঁদের হিসাবে অর্থনৈতিক উন্নয়ন হবে মাথাপিছু প্রকৃত জাতীয় আয় বৃদ্ধি এবং সেইসঙ্গে অর্থনীতির কাঠামোয় পরিবর্তন। অর্থাৎ অর্থনৈতিক উন্নয়ন হল অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি এবং পরিবর্তনের সম্মিলিত ফল। পরিবর্তন বলতে সামাজিক, অর্থনৈতিক, প্রতিষ্ঠানগত, রাজনৈতিক সকল ধরনের পরিবর্তনকেই বোঝানো হয়। এই পরিবর্তনের ফলে সমাজ ও অর্থব্যবস্থা রূপান্তরিত হতে থাকে। এর ফলে দেশের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। জাতীয় আয় ও মাথাপিছু আয় বাড়তে থাকে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের সময় অর্থনীতির মধ্যে যেসব উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটে থাকে সেগুলি হল :

(ক) জাতীয় আয়ে কৃষির অংশ হ্রাস পেতে থাকে এবং শিল্পক্ষেত্র ও সেবাক্ষেত্রের অংশ বৃদ্ধি পেতে থাকে।

(খ) জনসাধারণের জীবিকা কাঠামোতেও পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। প্রাথমিক ক্ষেত্রের (primary sector) জীবিকায় নিযুক্ত জনসংখ্যার অনুপাত হ্রাস পায়, অন্যদিকে মাধ্যমিক ও সেবামূলক ক্ষেত্রে (secondary and tertiary sector) নিযুক্ত জনসংখ্যার অনুপাত বৃদ্ধি পেতে থাকে।

(গ) অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে সাথে নগরের বিস্তার ঘটতে থাকে। জনগণ বেশি সংখ্যায় গ্রাম ছেড়ে শহরে আসতে থাকে। মোট জনসংখ্যায় শহুরে জনসংখ্যার অনুপাত বাড়তে থাকে।

(ঘ) অর্থনৈতিক উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে দেশের রাজনৈতিক কাঠামোতেও পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। পূর্বে জমির মালিকরাই (Landed Aristocracy) ছিল অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক দিক থেকে শক্তিশালী শ্রেণি। অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে সাথে জমির মালিকদের অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ক্ষমতা হ্রাস পেতে থাকে। অন্যদিকে শিল্প এবং ব্যবসা বাণিজ্যে নিযুক্ত ব্যক্তিদের অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পেতে থাকে। শিল্প এবং ব্যবসা বাণিজ্যে নিযুক্ত ব্যক্তিরাই দেশের রাজনীতিকে নিয়ন্ত্রণ এবং পরিচালিত করে থাকে।

অবশ্য Meier এবং Baldwin-এর সংজ্ঞার মধ্যে কিছুটা অসম্পূর্ণতা আছে। এই সংজ্ঞায় জনসাধারণের আয় বণ্টনের বিষয়টিকে উপেক্ষা করা হয়েছে। মাথা পিছু আয় একটি গড় হিসাব মাত্র। যদি কোনো দেশের প্রকৃত জাতীয় আয় বৃদ্ধি পেতে থাকে কিন্তু বাড়তি জাতীয় আয় মুষ্টিমেয় কয়েকজন অত্যন্ত ধনী ব্যক্তির হাতে কেন্দ্রীভূত হয় তাহলে মাথাপিছু আয় বাড়বে ঠিকই কিন্তু তার ফলে দেশের জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নত হবে না। সেজন্য দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটেছে কিনা সেটি বিচার করার জন্য দেশের জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান বিচার করা উচিত। জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য শুধুমাত্র জাতীয় আয় বৃদ্ধি পেলেই চলবে না। জাতীয় আয় যাতে সমভাবে বণ্টিত হয় সেদিকেও দৃষ্টি দিতে হবে। জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পাচ্ছে কিনা সেটি বিভিন্ন সূচকের মাধ্যমে জানা সম্ভব। একটি হল মাথাপিছু ভোগের পরিমাণ বৃদ্ধি। অপরটি হল শিশুর মৃত্যুর হার হ্রাস। দেশের জনসাধারণের নিরক্ষরতার হার হ্রাস এবং দারিদ্র্যসীমার নিচে অবস্থিত জনসংখ্যার অনুপাত হ্রাস। এগুলিই হল দেশের জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের নির্ণায়ক।

সুতরাং অর্থনৈতিক উন্নয়নের সংজ্ঞা হল: এটি এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে কোনো দেশের মাথাপিছু প্রকৃত জাতীয় আয় দীর্ঘকালব্যাপী ক্রমাগত বৃদ্ধি পায় এবং যার ফলে মোট ও আনুপাতিক হিসাবে দেশের দরিদ্র জনসংখ্যা কমে এবং দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তন হয়।

১.৪ উন্নয়নের বিভিন্ন পন্থা

অর্থনৈতিক উন্নয়নের বিভিন্ন পন্থা আছে যেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল অংশগ্রহণমূলক উন্নয়ন, অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন, স্ববহনক্ষম বা দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়নের ধারণা ও মানব উন্নয়ন (participatory development, inclusive development, sustainable development and human development)।

১.৪.১ অংশগ্রহণমূলক উন্নয়ন (Participatory Development)

অংশগ্রহণমূলক উন্নয়নে স্থানীয় লোকজনকে উন্নয়নের কাজে ব্যবহার করা হয়। অংশগ্রহণমূলক উন্নয়ন ১৯৭০ সালের পর থেকে বিভিন্ন রকমভেদে স্থানীয় লোকজনদের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পে যোগদান করানো হয়। এই প্রকল্পগুলি মূলতঃ মানুষের দৈনন্দিন প্রয়োজন মেটানোর জন্য উপযুক্ত।

যেমন পানীয় জলের জন্য নলকূপ খনন, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির জন্য রাস্তা তৈরি করা। জমিতে সেচের কাজের জদন্য ছোট ছোট বাঁধের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি। এই ধরনের অংশগ্রহণের মাধ্যমে প্রকৃতপক্ষে সুশীল সমাজের এবং অর্থনীতির ভিত অত্যন্ত শক্ত হয়। এর প্রধান কারণ হল সমাজের বিভিন্ন দল, গোষ্ঠীর এবং সংস্থার মধ্যে শক্তি সঞ্চারিত হয়। ফলে এই স্থানীয় লোকেরাই অর্থনৈতিক উন্নয়নের নিয়ন্ত্রণ নিজেদের হাতে নিয়ে সরকার কর্তৃক গৃহীত কর্ম পরিকল্পনাকে প্রভাবিত করে।

১.৪.২ অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন (Inclusive Development)

অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের উদ্ভব হয় প্রধানত দারিদ্রের অভিশাপ থেকে অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলিকে উদ্ধার করতে। এই উন্নয়নের ফলে কোনো দল বা কোনো গোষ্ঠী যেন মনে না করে যে তারা ঐ উন্নয়নের পরিধির বাইরে অবস্থান করছে। অর্থাৎ পিছিয়ে পড়া গোষ্ঠীরাও যাতে সমান সুযোগ পায় এবং তাদের অর্থনৈতিক উন্নতি যেন তাদের একটি উৎপাদনশীল, সুরক্ষিত এবং মর্যাদাপূর্ণ জীবন ধারণ করতে সাহায্য করে।

ভারতীয় অর্থনীতির একটি দুর্বলতা হল উন্নয়ন পরিকল্পনায় তফসিলি জাতি (Scheduled Caste), তফসিলি উপজাতি (Scheduled Tribe) এবং অন্যান্য অনগ্রসর জনজাতি নিজেদের উপেক্ষিত মনে করে। এছাড়া লিঙ্গ বৈষম্য চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছে। কিছু পরিকাঠামো পরিবর্তনের ফলে মহিলাদের উপর বিরূপ প্রভাব পড়েছে। অর্থনৈতিক উন্নয়নকে অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন বলা যাবে না যদি কোনো কোনো জনগোষ্ঠীকে বঞ্চিত ও অবহেলিত অবস্থায় দেখা যায়। এই অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন ভারতের ১১তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রধান স্তম্ভ হিসাবে বিবেচিত হয়। এই অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের মূল উদ্দেশ্য ছিল দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং অর্থনৈতিক বৈষম্য হ্রাস। এই লক্ষ্য পূরণের জন্য যে সব প্রকল্প গ্রহণ করা হয় তার মধ্যে প্রধান হল: শিশু শিক্ষার বিস্তার, শিক্ষার মান বৃদ্ধি, উচ্চতর শিক্ষার সুব্যবস্থা, দক্ষতা বৃদ্ধির সুব্যবস্থা, জীবন জীবিকার সংস্থান করা, সর্বসাধারণের জন্য মৌলিক সুবিধার যেমন পানীয় জল, বিদ্যুৎ, রাস্তা, খাদ্য ও জ্বালানির নিরাপত্তা, ১০০ দিনের কাজের নিরাপত্তার মাধ্যমে মজদুরী রোজগারের ব্যবস্থা করা, স্বাস্থ্যকর পরিবেশে আবাসের সুব্যবস্থা করা ইত্যাদি।

১.৪.৩ স্ববহনক্ষম বা দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়নের ধারণা (Sustainable or Longterm Development)

অর্থনৈতিক উন্নয়নের যে অগ্রগতি ঘটছে তাকে কি ভবিষ্যতে ধরে রাখা সম্ভবপর হবে? যে সমস্ত প্রাকৃতিক সম্পদগুলির উপর নির্ভর করে মানুষের সভ্যতার অগ্রগতি হয়েছে যেমন পেট্রোলিয়াম, প্রকৃতিতে এদের অধিকাংশের সঞ্চিত পরিমাণ অপরিবর্তনশীল। এই প্রাকৃতিক সম্পদগুলির সঞ্চয় দ্রুত হ্রাসমান।

দীর্ঘস্থায়ী ও স্ববহনক্ষম উন্নয়নের সংজ্ঞা দীর্ঘস্থায়ী ও স্ববহনক্ষম উন্নয়ন আমরা তাকেই বলব যে উন্নয়ন ভবিষ্যত প্রজন্মের প্রয়োজন মেটানোর ক্ষমতাটি হ্রাস না করেই বর্তমান প্রজন্মের প্রয়োজন মেটাবে। স্ববহনক্ষম

দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়ন যেমন বর্তমান ও ভবিষ্যত প্রজন্মের প্রয়োজনের কথা মাথায় রাখবে তেমনই গুরুত্ব দেবে দরিদ্র মানুষের প্রয়োজনের দিকেও। কিন্তু মনে রাখতে হবে দারিদ্র্য সামগ্রিকভাবে পরিবেশের এবং জীবনের গুণগত মান ক্ষুণ্ণ করে। ১৯৮৭ সালে World Commission on Environment and Development (ব্রান্ডল্যান্ড কমিশন) এই দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়ন নিয়ে বিচার বিবেচনা করেছে।

দু'ভাবে এই স্ববহনক্ষম দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়নকে বিশ্লেষণ করা হয়। প্রথমটি ফলাফল পদ্ধতি (outcome approach)। এই পদ্ধতিতে দীর্ঘকালে মাথাপিছু উপযোগিতা এবং মাথাপিছু ভোগ-কোনোটিই ক্রমহ্রাসমান অবস্থায় পৌঁছায় না। Neo-classical Theory অনুযায়ী ভোগের স্তর যদি সর্বাপেক্ষা আকাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে পৌঁছায়, তাহলে সেটি কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী হয় না।

দ্বিতীয়তঃ, সুযোগ পদ্ধতির (opportunity approach) সাহায্যে দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়নের বিশ্লেষণ করা হয়। এই পদ্ধতি অনুযায়ী উন্নয়নের যে প্রক্রিয়ায় মূলধনের মোট পরিমাণটি প্রজন্মের পর প্রজন্ম অটুট থাকবে সেটিকেই দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়ন বলা হয়। মূলধন বলতে আমরা তিনধরনের মূলধনের কথা বলে থাকি-মানব মূলধন (Human CapitalV Kh, মনুষ্যসৃষ্ট মূলধন (Km) এবং প্রাকৃতিক মূলধন (Kn) মানব মূলধন বলতে আমরা বুঝি সেই শ্রমকে যা শ্রমিকের জ্ঞান ও দক্ষতার ফসল। শিক্ষা ও অনুশীলনের সাহায্যে এই মূলধন বাড়ানো সম্ভব। মনুষ্যসৃষ্ট মূলধন হল অতীত উৎপাদনের ফসল, যে উৎপাদন ভোগের কাজে পুরোটা ব্যবহৃত হয়নি। এর মানে হল ভোগের পরিমাণ বাড়লে মনুষ্যসৃষ্ট মূলধনের পরিমাণ কমবে। আর প্রাকৃতিক মূলধন প্রকৃতির দান। এই প্রাকৃতিক সম্পদের মধ্যে আছে নবীকরণ যোগ্য ও নবীকরণ অযোগ্য সম্পদ। মানুষের অতিরিক্ত ভোগ এবং পরিবেশ দূষণের ফলে এই প্রাকৃতিক মূলধন ক্রমশ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। দীর্ঘস্থায়িত্বের ব্যাখ্যা অনুযায়ী উন্নয়নের কোনো প্রক্রিয়াকে তখনই দীর্ঘস্থায়ী বলা হবে যখন তার ফলে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মূলধনের অভ্যন্তরীণ কাঠামোটি পরিবর্তিত হলেও মোট মূলধনের পরিমাণটি অপরিবর্তিত থাকবে। অর্থাৎ মোট মূলধন K = Kh+ Km+ Kn, এই যোগফলটির কোনো পরিবর্তন ঘটল না কিন্তু Kh, Km এবং Kn-এর বিন্যাস এমন ভাবে পাল্টানো হল যাতে অর্থনীতির সামগ্রিক মঙ্গল বা সামগ্রিক ভোগের পরিমাণে কোনো পরিবর্তন ঘটবে না।

আবার অন্যদিকে একটা কঠোর দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়নের ধারণা আছে যাতে উন্নয়ন প্রক্রিয়াটিকে দীর্ঘস্থায়ী হবার জন্য শুধুমাত্র মোট মূলধনের পরিমাণটি অপরিবর্তিত থাকলেই চলবে না, প্রতিটি মূলধনকে আলাদাভাবে, বিশেষত প্রাকৃতিক মূলধনকে, অপরিবর্তিত থাকতে হবে। অর্থাৎ এই ধারণাতে বিভিন্ন মূলধন একে অপরের পরিপূরক হতে পারে সে কথা স্বীকার করা হয়নি। উন্নয়নের কাজটি সঠিক ভাবে তখনই হবে যখন বিভিন্ন ধরনের মূলধনের পরিমাণের মধ্যে একটি আনুপাতিক ভারসাম্য থাকবে।

কিন্তু প্রাকৃতিক মূলধনের বিকল্প অন্য মূলধন হতে পারে না ঠিকই তবে তা একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত। প্রাকৃতিক মূলধনের একটি ন্যূনতম পরিমাণ আছে যে পরিমাণ প্রাকৃতিক মূলধন না থাকলে পৃথিবীতে মনুষ্য প্রজাতির অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে পড়বে। এই নির্দিষ্ট সীমার পরে অন্য যে কোনো ধরনের মূলধনই প্রাকৃতিক মূলধনের বিকল্প হতে পারে।

১.৫ মানব সম্পদের উন্নয়ন (Development of Human Resources)

অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটি বিশেষ দিক হল মানব সম্পদের উন্নয়ন। জীবনধারণের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যের বন্টন আরও ব্যাপক করা-যেমন খাদ্য, আশ্রয়, স্বাস্থ্য এবং সব ধরনের সামাজিক সুরক্ষার ব্যবস্থা করা উন্নয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক।

মানব সম্পদ হল দেশের মোট জনসমষ্টি। জনসমষ্টির বৃদ্ধি হওয়া (Growth of population) দেশের পক্ষে দায় (liability) হিসাবে বিবেচিত না হয়ে সম্পদ (asset) হিসাবেও বিবেচিত হতে পারে যদি সেই জনসমষ্টিকে উন্নয়নের কাজে ঠিকভাবে ব্যবহার করা যায়। এক্ষেত্রে প্রয়োজন হল মানব সম্পদের যথাযথ উন্নয়ন এবং সেটা হতে পারে যদি জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়, এবং অধিকতর আয় উপার্জন করে মৌলিক প্রয়োজনগুলি মেটাবার মতো সক্ষমতা (Capacity) জনসাধারণ অর্জন করে। দেশের কর্মক্ষম মানুষের জন্য কাজের সংস্থান হওয়া, শিক্ষার মান উন্নত হওয়া এবং কারিগরী দক্ষতার সম্প্রসারণ হওয়া, এগুলি হল মানব সম্পদ যথাযথ ব্যবহারের বিভিন্ন দিক। এগুলি অর্জিত হলে শুধু যে ব্যক্তির বস্তুগত কল্যাণই (material welfare) বাড়ে তা নয়, জাতীয় পর্যায়েও দেশের মর্যাদা বাড়ে।

রাষ্ট্রসংঘের উন্নয়ন কর্মসূচী (United Nations Development Programme) অনুযায়ী ১৯৯০ সাল থেকে প্রতিবছর যে মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন (Human Development Report) বেরোয় তাতে বিভিন্ন দেশের উন্নয়নের মাত্রা তুলনা করার জন্য একটি মানব উন্নয়ন সূচক (Human Development Index) তৈরি করা হয়। জনসাধারণের প্রত্যাশিত আয়ু, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, শিক্ষা, সক্ষমতা (capability), মাথাপিছু আয় উৎপাদিত দ্রব্যের ওপর স্বত্বাধিকার (entitlement) এবং সবরকম সামাজিক সুরক্ষার (social safety net) ভিত্তিতে এই সূচক তৈরি করা হয়। মাহবুব-উল হকের (Mahbub-ul Haq) প্রচেষ্টা এবং অমর্ত্য সেনের প্রেরণা মানব উন্নয়ন সূচক তৈরি করার পেছনে কাজ করেছে।

১.৬ সারাংশ

অর্থনৈতিক উন্নয়নের সংজ্ঞা নির্ধারন একটি গুরুত্বপূর্ন ও জটিল বিষয় সেটির বিষদ আলোচনা করা হয়েছে এই এককে। মাথাপিছু আয়ের বৃদ্ধি যে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সূচক হিসাবে সবসময় বিবেচিত হতে পারে না তার আলোচনা এই এককে স্থান পেয়েছে। তবে মাথাপিছু প্রকৃত আয়ের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যদি বর্ধিত আয়ের সমবণ্টন হয় তবে সেটা অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম সূচক হিসাবে বিবেচিত হয়। অনেক সময় জনসংখ্যা বেড়ে গেলে অথচ জাতীয় আয় স্থির থাকলে মাথাপিছু আয় কমে যায়। আবার এমনও হতে পারে, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার এবং জাতীয় উৎপাদন আয় স্থির আছে। মাথাপিছু আয়কে ভিত্তি করে বিভিন্ন দেশের উন্নয়নের মাত্রার পরিমাপ করা হলেও অর্থনৈতিক উন্নয়নের সবকিছু মাথাপিছু আয় দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না। রাষ্ট্রসংঘের উন্নয়ন কর্মসূচী অনুযায়ী প্রতি বছর (১৯৯০ সাল থেকে) একটি মানবিক উন্নয়ন প্রতিবেদন বেরোয় এবং বিভিন্ন দেশের উন্নয়নের স্তর বিবেচনার জন্য একটি মানবিক উন্নয়ন সূচী তৈরি করা হয়। জনসাধারণের প্রত্যাশিত আয়ু, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, পণ্য অর্জন ও ভোগের সক্ষমতা, উৎপাদিত পণ্যের ওপর

স্বত্বাধিকার এবং সবরকম সামাজিক সুরক্ষার ভিত্তিতে এই সূচক তৈরি করা হয়। ১৯৯০ সালের মানবিক উন্নয়ন প্রতিবেদন অনুযায়ী জনসাধারণ হল একটি জাতির প্রকৃত সম্পদ। জনসাধারণের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আশ্রয়, পুষ্টি, সক্ষমতা প্রভৃতি সামাজিক সুরক্ষা সুনিশ্চিত করার জন্য মানবিক সম্পদ বিনিয়োগ অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথ সুগম করে। আয়ের বৈষম্য ও দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং সামাজিক সুযোগের সমবণ্টনও অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাপকাঠি। অংশগ্রহণমূলক উন্নয়নে স্থানীয় লোকজনকে উন্নয়নের কাজে ব্যবহার করা হয়। অংশগ্রহণমূলক উন্নয়ন ১৯৭০ সালের পর থেকে বিভিন্ন রকমভেদে স্থানীয় লোকজনদের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পে যোগদান করানো হয়। এই প্রকল্পগুলি মূলতঃ মানুষের দৈনন্দিন প্রয়োজন মেটানোর জন্য উপযুক্ত। অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের উদ্ভব হয় প্রধানত দারিদ্রের অভিশাপ থেকে অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলিকে উদ্ধার করতে। এই উন্নয়নের ফলে কোনো দল বা কোনো গোষ্ঠী যেন মনে না করে যে তারা ঐ উন্নয়নের পরিধির বাইরে অবস্থান করছে। দীর্ঘস্থায়ী ও স্ববহনক্ষম উন্নয়নের সংজ্ঞা দীর্ঘস্থায়ী ও স্ববহনক্ষম উন্নয়ন আমরা তাকেই বলব যে উন্নয়ন ভবিষ্যত প্রজন্মের প্রয়োজন মেটানোর ক্ষমতাটি হ্রাস না করেই বর্তমান প্রজন্মের প্রয়োজন মেটাবে।

অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটি বিশেষ দিক হল মানব সম্পদের উন্নয়ন। জীবনধারণের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যের বন্টন আরও ব্যাপক করা-যেমন খাদ্য, আশ্রয়, স্বাস্থ্য এবং সব ধরনের সামাজিক সুরক্ষার ব্যবস্থা করা উন্নয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক।

১.৭ অনুশীলনী

1. নীচের প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন। (প্রতিটির মান ২.৫)

a. অংশগ্রহণকারী উন্নয়ন কাকে বলে?

b. অন্তর্ভুক্তিমুলক উন্নয়ন কাকে বলে?

c. মানব সম্পদ বলতে কি বোঝ?

d. অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষণগুলি কী কী?

e. অর্থনৈতিক উন্নয়নের উপাদান গুলি কী কী?

f. মানব উন্নয়নের সূচক কি?

g. মানব উন্নয়নের উপাদান গুলি কী কী?

2. প্রশ্নমালা মাঝারি দৈর্ঘ্যের (প্রতিটির মান ৫):

1. অর্থনৈতিক উন্নয়নের বিভিন্ন ধারনা গুলির মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করুন।
2. অর্থনৈতিক উন্নয়নের বিভিন্ন লক্ষণ ও উপাদান সম্পর্কে আলোচনা করুন।
3. মাথাপিছু আয় কি অর্থনৈতিক উন্নয়নের নির্দেশক?

3. প্রশ্নমালা পূর্ণ দৈর্ঘ্যের (প্রতিটির মান ১০):

1. অর্থনৈতিক উন্নয়নে মানবসম্পদ উন্নয়নের ভূমিকা আলোচনা করুন।
2. অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলতে কী বোঝায়?
3. অর্থনৈতিক উন্নয়নের উপাদানগুলি কী কী?
4. সঠিক উত্তর নির্বাচনের প্রশ্নাবলী (এম সি কিউ)

● অর্থনৈতিক উন্নয়ন মানে—

ক) মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি। খ) মাথাপিছু আর্থিক সম্পদের বৃদ্ধি। গ) মানব সম্পদের উন্নতি

ঘ) নির্দিষ্ট করে বলা যায়না।

● স্ববহনক্ষম দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়নকে বিশ্লেষণ করা হয় ,

ক) দীর্ঘকালে মাথাপিছু উপযোগিতা এবং মাথাপিছু ভোগ-কোনোটিই ক্রমহ্রাসমান অবস্থায় পৌঁছায় না।

খ) ভোগের স্তর যদি সর্বাপেক্ষা আকাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে পৌঁছায়

গ) শুধুমাত্র মোট মূলধনের পরিমাণটি অপরিবর্তিত থাকলেই চলবে।

ঘ) মানব মূলধনের ক্রম উন্নয়ন।

● উন্নয়ন অর্থনীতিতে মূলধন কে কয় ভাবে দেখা হয় ,

ক) এক (১) ভাবে

খ) দুই (২) ভাবে

গ) তিন (৩) ভাবে

ঘ) চার (৪) ভাবে

১.৮ গ্রন্থপঞ্জী

1. Todaro M. PéôéEconomics for a Developing Economy SLongman– London and New York 1982V
2. Thirlwall A. P. Growth and Development with Special Reference to Developing Economics SELBS/MacMillan 1983V
3. Sen AmartyaéôéDevelopment- Which Way NowÚ Economic Journal– Vol. 93– 1983

4. Gouvlet D.éôéThe Cruel Choice- A New Concept on the Theory of Development SNew York- Atheneum 1971V
5. Gupta Subrata and Sujit Ghosh A Tract on Economic Development- Process and Perspectives SCharu Publishing Company– Kolkata– 1992V

একক ২ ❑ অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন

২.১ উদ্দেশ্য

২.২ প্রস্তাবনা

২.৩ অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি

২.৪ অর্থনৈতিক উন্নয়ন **(Economic Development)**

২.৪.১ মাথাপিছু আয় **(Per capita Income)**

২.৫ মানব উন্নয়ন সূচক **(Human Development Index)**

২.৬ লিঙ্গভিত্তিক উন্নয়ন সূচক **(Gender-related Development Index)**

২.৭ ক্ষমতায়নের লিঙ্গভিত্তিক পরিমাপ **(Gender Empowerment Measure or GEM)**

২.৮ মানব দারিদ্র্য সূচক **(Human Poverty Index)**

২.৯ সারাংশ

২.১০ অনুশীলনী

২.১১ গ্রন্থপঞ্জী

২.১ উদ্দেশ্য

এই এককে আমরা অর্থনৈতিক উন্নয়নের সংজ্ঞা নির্ধারণ করার চেষ্টা করব। বিভিন্ন ধরনের উন্নয়ন সম্পর্কে একটি সম্যক ধারণা দেওয়া হবে। এছাড়া অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির (growth) এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন (ত্মব্রডত্রদ্ধম্নদ্বত্র– ঠ্)-এর মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করা হবে। পাশাপাশি অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিমাপ করার সূচক নির্ধারণ করা হবে। মানব সম্পদের উন্নয়ন বলতে ঠিক কী বোঝায় সেটাও ব্যাখ্যা করা হবে।

২.২ প্রস্তাবনা

উন্নয়ন অর্থনীতি নিয়ে আলোচনা শুরু করার আগে আমাদের জানতে হবে উন্নয়ন বলতে কী বোঝায়। এছাড়া অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির সঙ্গে অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূল পার্থক্য কোথায় এটাও আমাদের বিচার্য হবে। জন প্রতি আয়ের ক্রমাগত বৃদ্ধি কি অর্থনৈতিক উন্নয়ন নির্দেশ করে? আমরা দেখব যে মাথাপিছু আয় উন্নয়নের ব্যাখ্যা করার জন্য যথেষ্ট নয়। মানব সম্পদের উন্নতি উন্নয়নের ব্যাখ্যার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয়।

২.৩ অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি

অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির প্রধান লক্ষণ হল জাতীয় আয় এবং সেইসঙ্গে মাথাপিছু প্রকৃত আয়ের (Per capita real income) বৃদ্ধি। অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদন ক্ষমতার সম্ভাবনার (Potentialities of production) সদ্ব্যবহার করা সম্ভব হয়। দেশের জাতীয় আয় বাড়লে যাতে জাতীয় আয় বৃদ্ধির হার অক্ষুণ্ণ থাকে সেজন্য উৎপাদনের কলা-কৌশলের উন্নয়ন করা, দেশের শ্রমিকদের কারিগরি দক্ষতা বাড়ানো, জাতীয় সঞ্চয় ও বিনিয়োগ বাড়ানো, দেশের রপ্তানি বাণিজ্য সম্প্রসারণ করা এবং দেশের মূলধন সৃষ্টির হার (rate of domestic capital formation) বাড়ানো ও সেই সঙ্গে সামাজিক মূলধন সৃষ্টি করা (social capital formation) এবং অর্থনৈতিক পরিকাঠামো উন্নত করা অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির অঙ্গ। হ্যারডের (Harrod) মতে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির হারকে সর্বাধিক করার উপায় হল, মূলধন-উৎপাদন অনুপাত (capitaléôéoutput ratio) নিম্নপর্যায়ে স্থির রেখে সঞ্চয়-আয় অনুপাত (saving-income ratio) যতটা সম্ভব বাড়ানো। যদি জাতীয় আয়ের একটি বড় অংশ সঞ্চয় ও বিনিয়োগ করা সম্ভব হয় এবং একটি নির্দিষ্ট মূলধনের অনুপাতে উৎপাদনী শক্তি বাড়ানো যায় (অথবা বিকল্পভাবে, নির্দিষ পরিমাণ মূলধনের সাহায্যেই বাড়তি উৎপাদন অর্জন করা যায়) তবে সমৃদ্ধির হার (Growth rate) বাড়ে।

দেশে সঞ্চয় ও বিনিয়োগ কম হলে, মূলধনের নের উৎপাদনী শক্তি কম হলে এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার খুব বেশি হলে দেশের সমৃদ্ধির হার কম হয়। অনেক সময় প্রাকৃতিক এবং খনিজ সম্পদের প্রাচুর্য যেমন কুয়েত, আরব আমিরশাহী প্রভৃতি দেশের তেলসম্পদ) সমৃদ্ধির হার বাড়িয়ে দিতে পারে। অধ্যাপক হ্যারড (Harrod) সঞ্চয়-আয় অনুপাত এবং মূলধন-উৎপাদন অনুপাতের ভিত্তিতে সমৃদ্ধির হারকে (Rate of Growth) এভাবে ব্যাখ্যা করেছেন: এখানে ঝ হল সমৃদ্ধির হার (rate of growth) ঊঝ-কে এভাবেও প্রকাশ করা যায়,; এখানে হল জাতীয় আয়; (হল সঞ্চয়-আয় অনুপাত (saving-income ratio) অথবা s/y এখানে একটি নির্দিষ্ট সময়ে সঞ্চয়-আয় অনুপাত বিবেচনা করা হয়েছে, অর্থাৎ S= St/Yt

এই সঞ্চয়-আয় অনুপাত বিনিয়োগ-আয় অনুপাতেরও (It/Yt) সমান। কারণ, ভারসাম্য পর্যায়ের জাতীয় আয়ে সঞ্চয় বিনিয়োগ। অপরদিকে 'ঋ' হল প্রান্তিক মূলধন উৎপাদন অনুপাত (Marginal Capital-Output Ratio), অর্থাৎ,

হ্যারডের মডেল অনুযায়ী যদি সঞ্চয়-আয় অনুপাত বা বিনিয়োগ-আয় অনুপাত বেশি হয় এবং প্রান্তিক মূলধন-উৎপাদন অনুপাত কম হয়, অথবা নিচু পর্যায়ে স্থির থাকে তবে সমৃদ্ধির হারও বেশি হয়।

২.৪ অর্থনৈতিক উন্নয়ন (Economic Development)

অর্থনৈতিক উন্নয়ন (Economic DevelopmentV হল অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির অতিরিক্ত আরও কিছু অর্জনযোগ্য উপাদন।

অর্থনৈতিক উন্নয়ন অর্জন করতে হলে সমৃদ্ধি ছাড়া আরও কয়েকটি জিনিস অর্জন করা দরকার; যেমন, অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা (Stability), আয়ের ন্যায়সঙ্গত বণ্টন (Equitable Distribution of Income),

অর্থনৈতিক পরিকাঠামোর উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠানগত উন্নয়ন, সামাজিক ন্যায় (Social Justice), জনসাধারণের ব্যাপক কল্যাণ (Mass Welfare), অর্থনৈতিক স্বয়ম্ভরতা (Self-reliance), সমৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধের উন্নয়ন (Ethical and Human orientation of growth), এবং জনসাধারণের নাগরিক জীবনের প্রয়োজনীয় স্বাচ্ছন্দ্যের নিরাপত্তা, পুষ্টি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি। সুতরাং অর্থনৈতিক উন্নয়ন হল অর্থনৈসমৃদ্ধির অতিরিক্ত আরও কিছু পরিবর্তন (growth plus change)। অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জিত হবার সঙ্গে সঙ্গে অর্থনৈতিক জীবনে স্থিতিশীলতা এসেছে কিনা, আয়ের সুষম ও ন্যায়সঙ্গত বণ্টনের মাধ্যমে দারিদ্র্য দূর হচ্ছে কিনা, সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে কিনা, অর্থাৎ সমাজের সব শ্রেণির লোকের কাছে সমৃদ্ধির সুফল পৌঁছে যাচ্ছে কিনা, খাদ্য সরবরাহে ও জীবনযাত্রার প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির উৎপাদন ও সরবরাহে দেশ স্বয়ম্ভরতা অর্জন করতে পারল কিনা এবং দেশের জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নত হল কিনা-সবই অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষণ হিসাবে বিবেচ্য।

অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির মূল কথা হল অধিকতর উৎপাদন। অপরদিকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূল কথা হল শুধু অধিকতর উৎপাদনই নয়, কিরূপ কারিগরি ও প্রতিষ্ঠানগত পরিবর্তনের (technical and institutional changes) দ্বারা অধিক উৎপাদন করা সম্ভব হয় তাও দেখতে হবে। বর্তমানে অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটি বিশেষ দিক হল মানব উন্নয়ন (Human Development)। রাষ্ট্রসংঘের উন্নয়ন কর্মসূচী (United Nations Development Programme) অনুযায়ী ১৯৯০ সাল থেকে প্রতি বছর একটি মানবিক উন্নয়ন প্রতিবেদন (Human Development Report) বেরোচ্ছে এবং বিভিন্ন দেশের উন্নয়নের মাত্রা বিচার করার জন্য একটি মানব উন্নয়ন সূচক (Human Development Index) তৈরি হয়েছে। জনসাধারণের প্রত্যাশিত আয়ু, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, শিক্ষা, সক্ষমতা (capability), উৎপাদিত পণ্যের ওপর অর্জিত স্বত্বাধিকার এবং সবরকমের সামাজিক সুরক্ষার (Social safety net) ভিত্তিতে এই সূচক তৈরি হয়েছে। মাহবুব-উল হক (Mahbubéôéul Haq) এবং অমর্ত্য সেন অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাপকাঠি হিসাবে মানবিক উন্নয়ন সূচকের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষণগুলি হল- (১) মাথাপিছু প্রকৃত জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি, (২) জমি ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদের সদ্ব্যবহার, (৩) উন্নত ধরনের জীবনযাত্রার মান ও উন্নত অর্থনৈতিক পরিকাঠামো (Infrastructure), (৪) দারিদ্র্যের বিলুপ্তি-অর্থাৎ জীবনযাত্রার ন্যূনতম প্রয়োজনগুলি (minimum needs), যেমন-স্বাস্থ্য, পুষ্টি, বাসস্থান ও শিক্ষা মেটানো, (৫) দেশের সঞ্চয়, বিনিয়োগ ও মূলধন-সৃষ্টির হার বৃদ্ধি, (৬) খাদ্যের ক্ষেত্রে স্বয়ম্ভরতা অর্জন, (৭) কর্মসংস্থানের সম্প্রসারণ, (৪) বৈদেশিক বাণিজ্যের বিশেষ করে রপ্তানি বাণিজ্যের উন্নতি, (৯) উন্নত ধরনের কলা-কৌশল, (১০) শ্রমিকদের কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধি, (১১) দেশের ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা, পরিবহন ব্যবস্থা ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং (১২) আয়ের সুষম বণ্টন প্রভৃতি।

● অর্থনৈতিক উন্নয়নের উপাদান

অর্থনৈতিক উন্নয়নের উপাদানগুলি হল-প্রাকৃতিক সম্পদ, শ্রম বা জনসংখ্যা, মূলধন, প্রযুক্তি বা কলাকৌশল, অর্থনৈতিক পরিকাঠামোর উন্নয়ন এবং প্রতিষ্ঠানগত উন্নয়ন প্রভৃতি। প্রাকৃতিক সম্পদের সদ্ব্যবহার

অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটি অন্যতম উপাদান। কেননা এর মাধ্যমে উন্নয়ন প্রক্রিয়া কার্যকর হয়। কৃষির উন্নয়ন, জমির সদ্ব্যবহার, নতুন জমিতে কর্ষণ এবং জমিতে একাধিক চাষ-ব্যবস্থার প্রয়োগ ও একর-প্রতি উৎপাদন বৃদ্ধির ওপর নির্ভরশীল। ভূমি সংস্কারও এক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শুধু জমি নয়, অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদও উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। প্রাকৃতিক গ্যাস ও নিউজপ্রিন্টের উৎপাদন প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর নির্ভরশীল। অর্থনৈতিক উন্নয়নের আরেকটি উপাদান হল শ্রম সরবরাহ। সেই সঙ্গে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারও বিবেচ্য। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার খুব বেশি হলে উন্নয়ন প্রচেষ্টা ব্যাহত হয়, দেশে বেকার সমস্যার সৃষ্টি হয় এবং খাদ্যসামগ্রীর জন্য চাহিদা বেড়ে যায়। স্বল্পোন্নত দেশের পক্ষে বেকার সমস্যার সমাধান করা এবং খাদ্যশস্য উৎপাদনে স্বয়ম্ভরতা অর্জন করা খুবই কঠিন। অপরদিকে দেশে যদি উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় শ্রম-সরবরাহ না থাকে এবং শ্রমিকদের কর্মকুশলতা ও প্রয়োজনীয় কারিগরি দক্ষতা না থাকে তবে উন্নয়ন প্রচেষ্টা ব্যাহত হয়। সেজন্য কাম্য জনসংখ্যা হল অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম প্রধান উপাদান হল মূলধন। মূলধন বৃদ্ধি বা মূলধন সৃষ্টি হল উন্নয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। মূলধন সৃষ্টি নির্ভর করে সঞ্চয়ের ওপর। সঞ্চয়ের সৃষ্টি, সঞ্চয়ের সংহতিকরণ এবং সঞ্চয়ের বিনিয়োগের ওপর। সঞ্চয় তিনপ্রকার হতে পারে-ব্যক্তিগত সঞ্চয়, যৌথ মূলধনী সঞ্চয় এবং সরকারি সঞ্চয়। সঞ্চয় নির্ভর করে জনসাধারণের ও ব্যবসায়ী সংস্থাগুলির সঞ্চয়ের ইচ্ছা ও ক্ষমতার ওপর। এক্ষেত্রে দেশের অর্থনৈতিক পরিকাঠামো ও ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

উন্নত ধরনের কলাকৌশল বা উন্নত প্রযুক্তি হল অর্থনৈতিক উন্নয়নের আরেকটি উপাদান। স্বল্পোন্নত দেশে উন্নত প্রযুক্তির অভাব থাকায় বিদেশ থেকে উন্নত প্রযুক্তি আমদানি করতে হয়।

অর্থনৈতিক উন্নয়ন দেশের অর্থনৈতিক পরিকাঠামোর (infrastructure) ওপরও নির্ভরশীল। এক্ষেত্রে পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সেই সঙ্গে দেশের ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থারও উন্নয়ন প্রয়োজন। অর্থনৈতিক পরিবেশও বিনিয়োগের পক্ষে অনুকূল থাকা প্রয়োজন। মানবিক মূলধনে উপযুক্ত বিনিয়োগ, শিক্ষার সম্প্রসারণ, জনসাধারণের স্বাস্থ্য ও পুষ্টি প্রভৃতিও উন্নয়নের উপাদান হিসাবে বিবেচিত হয়।

অর্থনৈতিক উন্নয়নে পরিবেশ (environment) সংরক্ষণ খুবই জরুরি। পরিবেশ দূষণের (tim) বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নিলে উন্নয়নের প্রচেষ্টা ব্যাহত হয়।

আমরা জানি অর্থনৈতিক উন্নয়ন হল এমন এক প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে কোনো দেশের মাথাপিছু প্রকৃত জাতীয় আয় দীর্ঘকালব্যাপী বৃদ্ধি পায় এবং দেশের কাঠামোগত পরিবর্তন ঘটে।

অর্থাৎ অর্থনৈতিক উন্নয়নের বৈশিষ্ট্যগুলি হল: প্রথমতঃ অর্থনৈতিক উন্নয়ন হল একটি প্রক্রিয়া অর্থাৎ বিভিন্ন শক্তির ঘাত-প্রতিঘাতের ফল। দ্বিতীয়তঃ মাথাপিছু প্রকৃত আয় বাড়লে তবেই অর্থনৈতিক উন্নয়ন হওয়া সম্ভব। অর্থাৎ প্রকৃত জাতীয় আয় বৃদ্ধির হার জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার থেকে বেশি হতে হবে। তৃতীয়তঃ 'প্রকৃত' আয় বৃদ্ধি ঘটতে হবে, 'আর্থিক' আয় নয়। চতুর্থতঃ মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি দীর্ঘকালীন ভিত্তিতে হতে হবে। পঞ্চমতঃ মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির পাশাপাশি দেশের কাঠামোগত পরিবর্তন ঘটতে হবে।

যেহেতু অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটেছে কিনা তা দেখার জন্য মাথাপিছু প্রকৃত আয় বেড়েছে কিনা তা দেখা হয়, তাই মাথাপিছু আয়কে অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটা সূচক হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। কিন্তু এই সূচকের নানা সীমাবদ্ধতা থাকার ফলে আমরা আরও কতকগুলি অর্থনৈতিক উন্নয়নের সূচক নিয়ে এখানে আলোচনা করব।

২.৪.১ মাথাপিছু আয় (Per capita Income)

মোট জাতীয় উৎপাদনকে দেশের জনসমষ্টি দিয়ে ভাগ করলে মাথাপিছু আয় বের করা যায়। মাথাপিছু আয়ের মাধ্যমে ধনী দেশ ও গরিব দেশের মধ্যে উন্নয়নের পার্থক্য (development gap) বিচার করা হয়। উন্নয়নের অভাব বলতে যদি কোনো দেশের দারিদ্র্য বোঝায় তবে মাথাপিছু আয় উন্নয়নের সূচক হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে। তবে মাথাপিছু আয়ের বৃদ্ধি অর্থনৈতিক উন্নয়নের একমাত্র নির্দেশক নয়। জনসংখ্যা কমে গেলে অথচ মোট জাতীয় আয় স্থির থাকলে এবং জাতীয় আয় না বাড়লেও মাথাপিছু আয় বাড়তে পারে। জাতীয় আয় বৃদ্ধির অনুপাত জনসংখ্যা কম থাকলে (যেমন, কুয়েত এবং সংযুক্ত আরব আমিরশাহী প্রভৃতি দেশে) মাথাপিছু আয় বাড়তে পারে। আবার মাথাপিছু আয় বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে যদি জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যায়, অথচ আয়ের সমবণ্টন না হওয়ায় দরিদ্রদের আর্থিক অবস্থার অবনতি হয়, তবে তাদের মাথাপিছু প্রকৃত আয় (Per capita real income) কমে যায়। সেক্ষেত্রে অর্থনৈতিক উন্নয়ন হয়েছে বলা যায় না। মাথাপিছু প্রকৃত আয় অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম নির্দেশক, কিন্তু একমাত্র নির্দেশক নয়। জাতীয় আয় বৃদ্ধি ও মাথাপিছু প্রকৃত আয় বৃদ্ধি, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির প্রধান বৈশিষ্ট্য সন্দেহ নেই। কিন্তু অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য জাতীয় আয় ও মাথাপিছু প্রকৃত আয় বৃদ্ধির সঙ্গে তার সুষম বণ্টনের দিকটিও গুরুত্বপূর্ণ। এজন্য বলা যায় যে মাথাপিছু আয়ের বৃদ্ধি অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটি প্রয়োজনীয় শর্ত হলেও এটা যথেষ্ট নয়।

যাঁরা মাথাপিছু আয়কে অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাপকাঠি হিসাবে বিবেচনা করতে চান, তাঁদের যুক্তি হল, মাথাপিছু প্রকৃত আয় বাড়লে জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নত হয় এবং তাদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আবাসন প্রভৃতি ক্ষেত্রেও উন্নতি হয়। সামাজিক সুরক্ষাও সেক্ষেত্রে সুনিশ্চিত হয়। এই যুক্তিটি তখনই গ্রহণযোগ্য যখন মাথাপিছু প্রকৃত আয় বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বর্ধিত আয়ের সমবণ্টন হয়। আবার এমনও হতে পারে, বর্ধিত জনসংখ্যার জন্য কোনো দেশে মাথাপিছু আয় কম, অথচ সেই দেশটি উন্নয়নের পথে অনেকটাই এগিয়ে গেছে। সুতরাং মাথাপিছু আয় সব সময়ে উন্নয়নের পরিমাপক হতে পারে না। একই সঙ্গে জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও জাতীয় আয় বৃদ্ধি পেলে মাথাপিছু আয় স্থির থাকতে পারে। তবে দুটি দেশের মধ্যে উন্নয়নের মাত্রা তুলনা করার ক্ষেত্রে মাথাপিছু আয় একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে।

২.৫ মানব উন্নয়ন সূচক (Human Development Index)

মানব উন্নয়ন সূচক (HDI) তৈরি করার জন্য তিন ধরনের তথ্যের প্রয়োজন-প্রথম, জন্মকালে প্রত্যাশিত গড়পড়তা আয়ু; দ্বিতীয়, শিক্ষার মান যা মাপা হয় সাক্ষরতার হার ও স্কুলে ভর্তির হারের সাহায্যে, এবং তৃতীয়, মাথাপিছু জাতীয় আয় এবং আভ্যন্তরীণ জাতীয় উৎপাদন (GDP)। এই তিন ধরনের তথ্যের সমন্বয়

ঘটিয়ে মানব উন্নয়ন সূচক পাওয়া যায়। এই সূচকের সর্বোচ্চ মান । এবং সর্বনিম্ন মান 0 (zero) সূচকের মান ০.৮-এর ঊর্ধ্বে উঠলে কোনো দেশের মানব উন্নয়ন সূচক উত্তম অথবা প্রথম শ্রেণীভুক্ত হিসাবে বিবেচিত হয়। যদি এই সূচক ০.৫ থেকে ০.৮-এর ভিতরে থাকে, তবে মানব উন্নয়ন সূচক মধ্যম অথবা দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত হিসাবে বিবেচিত হয়। আবার যদি এই সূচক ০.৫-এর নীচে থাকে তবে সংশ্লিষ্ট দেশের মানব উন্নয়ন অধম অথবা তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত। ২০০০ সালে মানব উন্নয়ন সূচক ভারতের ক্ষেত্রে হল ০.৫৬৯, অর্থাৎ ভারতের মানব উন্নয়ন মধ্যমস্থানীয়। ১৯৯৯ সালের সূচকেও ভারত তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত ছিল। উন্নয়নের মাত্রার ভিত্তিতে ভারতের ক্রম-অবস্থান হল ১২৮; বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মধ্যে মানব উন্নয়ন সূচকে এখন শীর্ষস্থানে আছে কানাডা।

মানবসম্পদ উন্নয়ন স্ত্রীলোক ও শিশুদের জীবনধারণের উন্নয়নের ওপর ভিত্তিশীল। এ বিষয়ে অমর্ত্য সেনের চিন্তাধারা অর্থনৈতিক উন্নয়নের নতুন ধারার সৃষ্টি করেছে। অমর্ত্য সেন তাঁর একটি নিবন্ধে ণ্ডার বিষয় হল, ‘‘Development Which way now?’’ (১৯৮৩)ণ্ণ অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গী আমূল পাল্টে দিয়েছেন। ১৯৯০ সালে মানব উন্নয়ন প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল, ‘‘জনসাধারণই হল একটি জাতির প্রকৃত সম্পদক্ষ্ম (‘‘People are the real wealth of a nation.’’)

এবং উন্নয়নের মূল উদ্দেশ্য হল জনসাধারণের জন্য এমন একটি পরিবেশ সৃষ্টি করা যাতে তারা দীর্ঘ, স্বাস্থ্যসমৃদ্ধ, সৃজনশীল জীবনযাপন করতে সমর্থ হয়। মানব উন্নয়নই হচ্ছে লক্ষ্য-অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি সেই লক্ষ্যে পৌঁছবার একটি উপায় (‘Human development is the end economic growth a means’.)। এই প্রতিবেদনে যে কথাগুলি বলা হয়েছে সেগুলি অমর্ত্য সেনের বক্তব্যের পুনরুক্তি ছাড়া কিছুই নয়। অমর্ত্য সেন সমাজের অবহেলিত অংশের জন্য সামাজিক সুরক্ষা, গরিব জনসাধারণের সক্ষমতা অর্জন, উৎপাদিত দ্রব্যের ওপর জনসাধারণের স্বত্বাধিকার অর্জন, শিক্ষার সম্প্রসারণ, আয়ের বৈষম্য দূরীকরণ এবং সামাজিক সুযোগের সমবণ্টন প্রভৃতিকেই মানবসম্পদ উন্নয়নের মাপকাঠি হিসাবে বিবেচনা করেছেন। উন্নয়ন হল এক ধরনের স্বাধীনতা-এই স্বাধীনতা হল দ্রব্য নির্বাচনের, দ্রব্যভোগের এবং সামাজিক সুযোগ ভোগ করার স্বাধীনতা। অমর্ত্য সেন তাঁর সর্বশেষ বই ‘‘Development As Freedom’’ (১৯৯৯) বইয়ে এই স্বাধীনতার ওপর জোর দিয়েছেন। এই স্বাধীনতার স্বার্থে দুর্নীতি প্রতিরোধ করা খুবই জরুরি। কেননা উন্নয়নের সুফল সমানভাবে ও ন্যায়সঙ্গতভাবে বণ্টন করার পথে দুর্নীতিই একটি বড় বাধা। স্বচ্ছ প্রশাসনের ক্ষেত্রেও দুর্নীতি অন্যতম বাধা এবং তাতে মানবাধিকার ক্ষুণ্ণ হয়। ক্ষুধা ও অপুষ্টি থেকে মুক্তি পাবার স্বাধীনতার মধ্যে নিহিত রয়েছে মানবসম্পদ উন্নয়নের সার্থকতা।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, জনসংখ্যা বৃদ্ধি কি মানবসম্পদ উন্নয়নের পরিপন্থী নয়? যে দেশ খাদ্যাভাবে এবং বেকার সমস্যায় জর্জরিত সেদেশের পক্ষে অতিরিক্ত জনসংখ্যা বৃদ্ধি উন্নয়নের পরিপন্থী হতে পারে। কিন্তু যদি বর্ধিত জনসমষ্টির জন্য খাদ্যের জোগান দেওয়া সম্ভব হয় এবং দারিদ্র্য দূরীকরণ ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় তাহলে জনসংখ্যা বৃদ্ধি মানবসম্পদ উন্নয়নের ক্ষেত্রে সমস্যার সৃষ্টি নাও করতে পারে। সমস্যা হল, মানুষ যাতে খাদ্যের অভাব, অপুষ্টি এবং বেকারত্বের সমস্যায় জর্জরিত না থাকে তার ব্যবস্থা করা। জনসংখ্যা বৃদ্ধি প্রতিরোধ করা নিশ্চয়ই দরকার। কিন্তু সেটা সম্ভব হয় শিক্ষার সম্প্রসারণের মাধ্যমে।

শিক্ষার সম্প্রসারণ অর্থনৈতিক উন্নয়নেরই একটি অঙ্গ।

২.৬ লিঙ্গভিত্তিক উন্নয়ন সূচক (Genderéôérelated Development Index)

লিঙ্গভিত্তিক উন্নয়ন সূচক মানব উন্নয়ন সূচকেরই একটি প্রকারভেদ মাত্র। জীবনের তিনটি প্রধান দিক, আয়ু, শিক্ষা ও সম্পদের উপর অধিকার, এই তিনটি দিক দেশের মানুষ গড়ে কতটা অর্জন করেছে সেটিই পরিমাপ করা হয় মানব উন্নয়ন সূচকে। লিঙ্গ-ভিত্তিক উন্নয়ন সূচকের ক্ষেত্রে এই পরিমাপটিই করা হয় নারী ও পুরুষের ক্ষেত্রে পৃথকভাবে। তারপর এই দুই সূচকের সংমিশ্রণে তৈরি করা হয় লিঙ্গভিত্তিক উন্নয়ন সূচক। এমনভাবে এই সংমিশ্রণ করা হয় যা থেকে ধরা যেতে পারে এগুলি অর্জনের ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের পার্থক্য কতটা।

মানব উন্নয়ন সূচক তৈরির জন্য আয়ুকে পরিমাপ করা হয় জন্মের সময় কোনো মানুষের প্রত্যাশিত আয়ুষ্কাল দিয়ে, জ্ঞান (বা শিক্ষাকে) পরিমাপ করার জন্য মাপকাঠি হিসাবে ব্যবহার করা হয় সাক্ষরতার হারের এবং সংশ্লিষ্ট বাচ্চাটি গড়ে কতদিন স্কুলে যাচ্ছে তার পরিসংখ্যান এবং সম্পদের অধিকার (যা আসলে জীবনযাত্রার মানকেই সূচিত করে) পরিমাপ করা হয় ক্রয়ক্ষমতার সমতা (purchasing power parity)-র ভিত্তিতে পরিমিত মাথাপিছু আয়ের সাহায্যে। মানব উন্নয়ন সূচক শুধুমাত্র এই সব পরিসংখ্যান দিয়ে তৈরি করার ফলে তা কখনোই উন্নয়নের সঠিক ছবিটি দিতে পারে না, কিছুটা অতিরঞ্জন তার মধ্যে থেকেই যায়। থেকে যাবার কারণ লিঙ্গ বৈষম্যের হিসাবটিকে এর মধ্যে ধরা হয় না। আর লিঙ্গ বৈষম্যের অস্তিত্ব যে কিছুটা হলেও মানব উন্নয়নের মাত্রাটিকে কমিয়ে দিত তা তো বলাবাহুল্য। সুতরাং লিঙ্গভিত্তিক সূচক তৈরি করার জন্য মানব উন্নয়ন সূচক থেকে এই অতিরঞ্জনটুকু বাদ দেওয়া দরকার। লিঙ্গ বৈষম্য সূচক অতএব মানব উন্নয়ন সূচকেরই একটি বাট্টাকৃত রূপ মাত্র। যে দেশে লিঙ্গ বৈষম্যের মাত্রা যত বেশি বাট্টার হারও তত বেশি। আর বাট্টার হার যত বেশি, তত বেশি মানব উন্নয়ন সূচক ও লিঙ্গভিত্তিক উন্নয়ন সূচকের পার্থক্য।

লিঙ্গভিত্তিক উন্নয়ন সূচক পরিমাপের পদ্ধতি: লিঙ্গভিত্তিক উন্নয়ন সূচক পরিমাপের পদ্ধতিটি বেশ জটিল। তিনটি ধাপে এই সূচক নির্ণয় করা হয়। ধাপগুলি নিম্নরূপ:

প্রথম ধাপ: প্রথমে জীবনের যে তিনটি দিকের কথা বলা হয়েছে, দীর্ঘায়ু, শিক্ষা, সম্পদের উপর অধিকার, এই তিনটি দিকের জন্য তিনটি পৃথক সূচক তৈরি করা হয়। এই সূচকগুলির আবার প্রতিটিই পুরুষ ও নারীর জন্য আলাদা আলাদাভাবে তৈরি করা হয়। এই সূচকগুলিকে বলা হয় বিস্তার সূচক (dimension index), অর্থাৎ এই সূচকগুলি আমাদের জানায় জীবনের ঐ বিশেষ দিকে দেশের মানুষের প্রাপ্তি কতদূর বিস্তারিত হয়েছে। শিক্ষা ও আয়ুর বিস্তার সূচক দুটি হিসেব করা হয় যে সূত্রের সাহায্যে সেটি হল-

বিস্তার সূচক = (প্রকৃত মান - ন্যূনতম মান) / (সর্বোচ্চ মান - সর্বনিম্ন মান)

জীবনের যে তৃতীয় দিক, সম্পদের উপর অধিকার, তার বিস্তার সূচকটিকে বলা হয় আয় সূচক। এই সূচকটি নির্ণয়ের সূত্রটি নিম্নরূপ:

আয় সূচক গু (প্রকৃত মানের লগারিদম - ন্যূনতম মানের লগারিদম) /(সর্বোচ্চ মানের লগারিদম - সর্বনিম্ন মানের লগারিদম)

দ্বিতীয় ধাপ: দ্বিতীয় ধাপে প্রতিটি দিকের জন্য যে দুটি করে (একটি নারী ও একটি পুরুষের জন্য) বিস্তার সূচক পাওয়া গেল সে দুটিকে একত্রিত করে একটি নতুন সূচক তৈরি করা হয়। এই সূচকটিকে বলা হয় সমবণ্টিত সূচক (equally distributed index)। এই সূচকটি আসলে নারী ও পুরুষের বিস্তার সূচকদুটির একটি গুরুত্বসূচক গড়। গুরুত্বটিকে এখানে চিহ্নিত করা হয় ৪ (এপ্সাইলন)-এর সাহায্যে। ৪ এর সাহায্যে একটি দেশ লিঙ্গ বৈষম্য কতটা দূর করতে পেরেছে তা পরিমাপ করা হয়। সমবণ্টিত সূচক নির্ণয়ের সূত্রটি নিম্নরূপ:

সমবণ্টিত সূচকটি হিসেব করার সময় সাধারণত ধরে নেওয়া হয় ত্রগু২। সেক্ষেত্রে সমবণ্টিত সূচকটি দুটি অবণ্টিত বিস্তার সূচকের বিপ্রতীপ যৌগিক গড়ের (harmonic mean) সমান হয়ে দাঁড়ায়, অর্থাৎ,

তৃতীয় ধাপ: তৃতীয় ও শেষ ধাপে তিনটি সমবণ্টিত সূচকের গুরুত্ববিহীন গড় থেকেই পাওয়া যায় লিঙ্গভিত্তিক উন্নয়ন সূচকটি।

উপরোক্ত পদ্ধতিতে লিঙ্গভিত্তিক উন্নয়ন সূচকটি নির্ধারণ করার জন্য একটি তথ্য আবশ্যক। তা হল, যে সমস্ত মাপকাঠির ভিত্তিতে এই সূচকটি নির্ধারণ করা হচ্ছে তার সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন মান। রাষ্ট্রসংঘ তার লিঙ্গভিত্তিক উন্নয়ন সূচকটি তৈরি করার জন্য যে মানগুলি ব্যবহার করে তা নীচের সারণিতে দেখানো হল।

এই সারণিতে প্রত্যাশিত আয়ুষ্কালটির সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন মান মেয়েদের ক্ষেত্রে পাঁচ বছর করে বেশি। এর কারণ, বাস্তব পরিস্থিতি এমনটি বলেই রাষ্ট্রসংঘের তথ্য বলছে।

লিঙ্গভিত্তিক উন্নয়ন সূচকের সমালোচনা: লিঙ্গভিত্তিক উন্নয়ন সূচকটির প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে কোনো দ্বিমত না থাকলেও যে পদ্ধতিতে ইউ. এন. ডি. পি. এটি নির্ণয় করে তা নিয়ে ঐকমত্যের অভাব আছে। এই সূচকটি পরিমাপের প্রথম মাপকাঠিটি আয়ুর দৈর্ঘ্য। এই দৈর্ঘ্য মাপার জন্য UNDP যেটির দিকে তাকাতে বলেছে তা হল জন্মের সময় প্রত্যাশিত আয়ুষ্কাল। কিন্তু এখন চিকিৎসা শাস্ত্রের এত উন্নতি হয়েছে যে প্রত্যাশিত আয়ুষ্কালকে আর আয়ুর দৈর্ঘ্য মাপার ভালো মাপকাঠি বলে ভাবা যায় না। একথা এই মুহূর্তে আরও বেশি প্রাসঙ্গিক এই কারণেই যে নিতান্ত জৈবিক কারণেই একটি পুরুষ শিশুর চেয়ে একটি নারী শিশুর টিকে থাকার সম্ভাবনা বেশি, ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের বেশিদিন বেঁচে থাকার সম্ভাবনা। সুতরাং প্রত্যাশিত আয়ুষ্কাল দিয়ে লিঙ্গ বৈষম্যের আন্দাজ পাওয়া সম্ভব নয়। বরং কোনো একটি নির্দিষ্ট বয়সে ছেলে এবং মেয়ের মৃত্যুর হার কত, বাঁচার হার কত সেটি লিঙ্গ বৈষম্যের চেহারাটিকে আরও ভালো ভাবে ধরতে পারত।

দ্বিতীয়ত, শিক্ষার বিস্তার কতদূর হয়েছে তা পরিমাপের জন্য মাপকাঠি ধরা হয়েছে সাক্ষরতা হারকে। কিন্তু এটিও দুর্বল মাপকাঠি এই অর্থে যে সাক্ষরতার ধারণাটিও দেশ থেকে দেশে পাল্টে যায়। তাছাড়া শুধু দেশে দেশেই বা কেন, সময়ের সঙ্গে সঙ্গেও পাল্টে যায়। সাক্ষর শব্দের অর্থ অক্ষরের জ্ঞান বিশিষ্ট। কিন্তু বর্তমানে শুধুমাত্র অক্ষরের জ্ঞান থাকলেই কি একজনকে সাক্ষর বলা যাবে, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে কিছুটা কম্পিউটার জানছে? কোনো কোনো অর্থশাস্ত্রবিদ তো এক ধাপ এগিয়ে বলেছেন যে অক্ষরের জ্ঞান থাকার পাশাপাশি কিছুটা বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও কিছুটা দক্ষতা অর্জন করতে না পারলে তাকে সাক্ষর বলা যাবে না।

সবশেষে, লিঙ্গভিত্তিক উন্নয়ন সূচক নির্ণয়ে আয়কে একটি অন্যতম প্রধান বিচার্য বিষয় ধরা হয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় একই কাজের জন্য মেয়েরা যে মজুরি পায়, ছেলেরা পায় তার চেয়ে বেশি। কোনো কোনো ক্ষেত্রে মেয়েরা কাজ করে, অথচ আদৌ কোনো পারিশ্রমিক পায় না। যেমন, গেরস্থালির কাজকর্ম। এই যেখানে অবস্থা সেখানে আয়ের জন্য যে সমবণ্টিত সূচকটি তৈরি করা হচ্ছে তা লিঙ্গ বৈষম্যের প্রকৃত ছবিটি কীভাবে তুলে ধরবে? সব মিলিয়ে তাই, লিঙ্গভিত্তিক উন্নয়ন সূচকটিকে নির্দ্বিধায় মেনে নিতে অনেকেরই আপত্তি আছে।

২.৭ ক্ষমতায়নের লিঙ্গভিত্তিক পরিমাপ (Gender Empowerment Measure or GEM)

লিঙ্গভিত্তিক উন্নয়ন সূচকের মতো ক্ষমতায়নের লিঙ্গভিত্তিক পরিমাপও একটি মিশ্র সূচক। ক্ষমতায়নের তিনটি দিকের উপর ভিত্তি করে প্রস্তুত তিনটি পৃথক সূচক থেকে তৈরি করা হয় চূড়ান্ত সূচকটি। এই তিনটি দিক হল রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ ও সিদ্ধান্তগ্রহণ, অর্থনৈতিক কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ ও সিদ্ধান্তগ্রহণ এবং অর্থনৈতিক সম্পদসমূহের উপর অধিকার। রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের এবং সেই সূত্রে রাজনৈতিক সিদ্ধান্তগ্রহণের ক্ষমতা মেয়েদের কতটা আছে তা পরিমাপের জন্য দেখা হয় সংসদীয় আসনের শতকরা কতগুলি তাদের হাতে আছে। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ ও সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতা মেয়েদের কতটা আছে তা পরিমাপের জন্য দুটি বিষয় দেখা হয়। এক, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ম্যানেজার বা সিনিয়র অফিসার হিসেবে, আইন প্রণয়নকারী হিসেবে ছেলে ও মেয়েদের শতকরা অংশ কতটা। দুই, পেশাদার কর্মী ও প্রযুক্তি কর্মী হিসেবে ছেলে ও মেয়েদের শতকরা অংশ কতটা। সবশেষে, অর্থনৈতিক সম্পদসমূহের উপর ছেলে ও মেয়েদের দখল শতকরা হিসেবে কতটা তা পরিমাপের জন্য তাদের আয়ের হিসাব নেওয়া হয়। আয় বলতে ক্রয়ক্ষমতা সমতার ভিত্তিতে পরিমিত ও ডলারের অঙ্কে প্রকাশিত আয়। ক্ষমতায়নের লিঙ্গভিত্তিক পরিমাপের এইসব মাপকাঠি থেকেই পরিষ্কার যে, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং পেশাগত ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষ সিদ্ধান্তগ্রহণের প্রশ্নে কী ভূমিকা পালন করছে তা দিয়েই ক্ষমতায়নের লিঙ্গভিত্তিক পরিমাপটি (GEM) করা হয়। যদি কোন দেশের মানব উন্নয়ন সূচক (HDI) খুব বেশি হয় কিন্তু যদি লিঙ্গভিত্তিক উন্নয়ন সূচক (GDI) এবং লিঙ্গভিত্তিক সক্ষমতার পরিমাপ (GEM) অপেক্ষাকৃত কম হয়, তাহলে বুঝতে হবে সেই দেশে উন্নয়নের ফলে লিঙ্গভিত্তিক অসাম্য বেড়েছে। তখন সেই দেশের অবস্থান সামগ্রিক উন্নয়নের মাপকাঠিতে আর ততটা উচ্চে ধরা হবে না। অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম নির্দেশক হিসাবে ঝঞ্চতাই গুরুত্বপূর্ণ। ক্ষমতায়নের লিঙ্গভিত্তিক পরিমাপটি নির্ণয়ের পদ্ধতি: ক্ষমতায়নের লিঙ্গভিত্তিক পরিমাপটিও তিনটি ধাপে করা হয়। ধাপগুলির বর্ণনা নীচে দেওয়া হল:

প্রথম ধাপ: এই ধাপে যে তিনটি দিকের উপর ভিত্তি করে এই পরিমাপটি নির্ধারণ করার কথা বলা হয়েছে সেই তিনটি দিকের জন্য তিনটি 'সমবণ্টিত সমতুল্য শতাংশ (equally distributed equivalent percentage îy EDEP)-এর হিসেব নির্ণয় করা হয়। এই হিসেব নির্ণয়ের জন্য যে সূত্রটি ব্যবহার করা হয় তা নিম্নরূপ:

এই সূত্রে ত্র-এর সাহায্যে কোনো দেশে অসমতা দূরীকরণের মাত্রাটি এমনভাবে পরিমাপ করা হয় যাতে অসমতা যত বেশি দূরীভূত হয় ত্র-এর মান তত কম হয়। এর অর্থ ৪ প্রকৃতপক্ষে অসমতার মাত্রার মাপকাঠি এবং (1-e) অসমতা দূরীকরণের সূচক। সুতরাং অসমতা বজায় থাকার জন্য দেশটিকে যে পরিমাণ শাস্তি ভোগ করতে হয় ত্র-এর মানটি তারই সমান। তবে UNDP যখন ক্ষমতায়নের লিঙ্গভিত্তিক পরিমাপটি করে তখন ধরে নেয় ত্রগু২, অর্থাৎ ধরে নেয় অসমতা থাকার জন্য দেশটিকে যে জরিমানা দিতে হয় তা মাঝারি মাত্রার। এই অনুমানের ফলে সমবণ্টিত সমতুল্য শতাংশটি প্রকৃতপক্ষে নারী ও পুরুষের বিস্তার সূচকের বিপ্রতীপ যৌগিক গড়-এর সমান হয়ে দাঁড়ায়।

দ্বিতীয় ধাপ: প্রথম ধাপে ক্ষমতার তিনটি বিস্তার, যথাক্রমে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ ও সিদ্ধান্তগ্রহণের ক্ষমতা এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ ও সিদ্ধান্তগ্রহণের ক্ষমতা এবং অর্থনৈতিক সম্পদসমূহের উপর অধিকার এই তিনটি বিস্তারের জন্য যে তিনটি সমবণ্টিত সমতুল্য শতাংশ পাওয়া গেল দ্বিতীয় ধাপে সে তিনটিকে ৫০ দিয়ে ভাগ করা হয়। ভাগ করার যুক্তি এই যে ক্ষমতার উপরোক্ত বিষয়গুলিতে যদি নারী ও পুরুষ সমান অধিকার ভোগ করে তাহলে সমবণ্টিত সমতুল্য শতাংশে দুজনের শতকরা ভাগ সমান হবে।

তৃতীয় ধাপ: দ্বিতীয় ধাপের পর সমবণ্টিত সমতুল্য শতাংশ তিনটির যে চূড়ান্ত মান পাওয়া গেল তাদের যৌগিক বা সরল গড়টিই হবে ক্ষমতায়নের লিঙ্গভিত্তিক পরিমাপ।

- **ক্ষমতায়নের লিঙ্গভিত্তিক পরিমাপটির সমালোচনা (Critique of GEM): লিঙ্গ বৈষম্যের**

এই পরিমাপটির নির্ণয় পদ্ধতি নিয়েও বেশ কিছু সমালোচনা রয়েছে। প্রথমত, যে বাড়িতে এবং যে সামাজিক গোষ্ঠীতে একটি মেয়ে বাস করে সেই বাড়ির মধ্যে বা সেই গোষ্ঠীতে মেয়েটি কতটা ক্ষমতা ভোগ করে সেই হিসাব এই পরিমাপের মধ্যে নেই। দ্বিতীয়ত, এই পরিমাপে ব্যক্তিগতভাবে একটি মেয়ে কতটা ক্ষমতা অর্জন করেছে তার হিসেব নেওয়া হয়েছে। সমষ্টিগতভাবে মেয়েরা কতদূর এগোল তার হিসেব এর মধ্যে নেই। যেমন, মেয়েদের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা একটি সমাজে মেয়েদের ক্ষমতা কতটা বাড়ল তার ইঙ্গিত দেয়। কিন্তু তেমন কোনো তথ্য এই পরিমাপে সন্নিবিষ্ট হয়নি। তৃতীয়ত, মেয়েদের ক্ষমতায়নের প্রশ্নে নিরাপত্তা ও সুরক্ষা দুটি জরুরি বিষয়। উদাহরণস্বরূপ, ধরা যাক একটি মেয়ে তার যোগ্যতা দিয়ে একটি বড় কোনো প্রশাসনিক পদে চাকরি পেয়েছে। কিন্তু প্রশাসক হিসেবে সে কোনো কড়া এবং সাহসী সিদ্ধান্ত নিতে পারবে না যতক্ষণ না কাজের জায়গাটিতে তার নিরাপত্তা যথেষ্ট সুরক্ষিত হয়। অর্থাৎ ক্ষমতায়নের সঠিক পরিমাপ পেতে গেলে শুধু কতটা ক্ষমতা মেয়েরা পেল তা দেখলেই চলবে না, পাশাপাশি দেখা দরকার সেই ক্ষমতা তারা কতটা কার্যকর করতে পারছে। বলা বাহুল্য, এই সংক্রান্ত কোনো তথ্যকে বিবেচনার মধ্যে আনেনি UNDP-র ক্ষমতায়নের লিঙ্গভিত্তিক পরিমাপটি।

২.৮ মানব দারিদ্র্য সূচক (Human Poverty Index):

দীর্ঘদিন বেঁচে থাকা, সুস্থ ও সুন্দরভাবে বেঁচে থাকা এবং ঠিকমত শিক্ষালাভ, এই তিনটি সুযোগ থেকে

কোনো দেশের নাগরিকরা কতটা বঞ্চিত তা দিয়েই সেই দেশের দারিদ্র্যের সঠিক পরিমাপ সম্ভব। দারিদ্র্যের এমনতরো পরিমাপকে বলা হয় মানব দারিদ্র্য সূচক।

বিকাশশীল দেশগুলিতে সাধারণত এটা দেখা যায় যে যারা গরিব তারা খুব অল্প বয়সেই মারা যাচ্ছে। যথাযথ খাদ্য ও চিকিৎসার অভাবেই এটা হয়ে থাকে। দীর্ঘদিন বেঁচে থাকার সুযোগ থেকে মানুষ কতটা বঞ্চিত তা পরিমাপের জন্য তাই মাপকাঠি হিসেবে ধরা হয় চল্লিশ বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকার সম্ভাবনাকে, জন্মের পর কোনো মানুষের চল্লিশ বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকার সম্ভাবনা কতটা, সেটিকে। অন্যদিকে জ্ঞানলাভের সুযোগ থেকে বঞ্চনার অর্থ লেখাপড়ার মধ্য দিয়ে বৃহত্তর জগতের সঙ্গে যোগাযোগের সুযোগ থেকে বঞ্চিত থাকা। প্রাপ্তবয়স্কদের নিরক্ষরতার হার থেকেই এই বঞ্চনার হিসেবটা নেওয়া হয়।

১৯৯৭ সালে যখন ইউ. এন. ডি. পি. মানব দারিদ্র্য পরিমাপ শুরু করে তখন সুন্দর জীবনযাত্রার মান থেকে বঞ্চনার হিসেব করার জন্য তিনটি মাপকাঠিকে বেছে নেওয়া হয়েছিল। এক, মোট জনসংখ্যার শতকরা কতজন পরিদ্রুত জল পাওয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত। দুই, শতকরা কতজন শিশুর ওজন তাদের বয়সের তুলনায় কম। এবং তিন, জনসংখ্যার শতকরা কতজন স্বাস্থ্য পরিষেবা পাওয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত। কিন্তু প্রয়োজনীয় পরিসংখ্যানের অভাবে ২০০৩ সাল থেকে তৃতীয় মাপকাঠিটিকে বাদ দেওয়া হয়েছে। প্রথম দুটি মাপকাঠির গড় হিসেব দিয়েই এখন হিসেব করা হচ্ছে কোনো দেশের মানুষ সুন্দর জীবনযাত্রার সুযোগ থেকে কতটা বঞ্চিত।

মানব দারিদ্র্য সূচক অতএব তৈরি করা হয় বঞ্চনার উপরোক্ত তিনটি ধারণার উপর ভিত্তি করে। এই সূচক প্রকৃতপক্ষে

তিনটি চলরাশি P1– P2 ও P3-এর গুরুত্বশীল গড় যেখানে

P1 = জন্মের পর ৪০ বছরের বেশি না বাঁচার সম্ভাবনা (এটিকে ১০০ দিয়ে গুণ করা হয়)

P2 = বয়স্ক নিরক্ষরতার হার

P3 = জনসংখ্যার কতজন পরিদ্রুত জলের সুযোগ থেকে বঞ্চিত এবং কতজন শিশুর ওজন বয়সের তুলনায় কম, এই দুইয়ের সাধারণ গড়। কোনো দেশে এই তিনটি চলরাশির মান নির্ধারণ করার পর নীচের সমীকরণটির সাহায্যে মানব দারিদ্র্য সূচক (হুঞ্জ্জ)-টির পরিমাপ করা হয়:

এখানে থ একটি ধ্রুবক। এই ধ্রুবকটির মান বাড়ার অর্থ বঞ্চনার মাত্রা বৃদ্ধি। যদি থ গু ১ হয় তাহলে মানব দারিদ্র্য সূচকটি বিভিন্ন ধরনের সাধারণ গড়ের সমান হবে। বঞ্চনার মাত্রাগুলি যত বাড়বে, সূচকের মানও তত বড় হবে।

UNDP কোনো দেশের মানব দারিদ্র্য সূচক নির্ণয় করার সময় থগু ৩ এই মান ব্যবহার করে। থগু ৩ ব্যবহার করার কারণ হল, যে ক্ষেত্রগুলিতে বঞ্চনা পরিলক্ষিত হয় সেগুলিকে অতিরিক্ত গুরুত্ব প্রদান করা। ২০০৪ সালের মানব উন্নয়ন প্রতিবেদনে মানব দারিদ্র্য সূচকের ক্ষেত্রে ২০০৩ সালে ভারতের ক্রম-অবস্থান ছিল ৯৬টি দেশের মধ্যে ৪৮। ২০০২ সালে এই অবস্থান ছিল ৯৬টি দেশের মধ্যে ৫৩।

অর্থনৈতিক সহযোগিতা ও উন্নয়ন সংগঠনের (Organization for Economic Coéôéoperation and Development বা OECD) কয়েকটি নির্বাচিত ক্ষেত্রে মানব দারিদ্র্য সূচকে তিনটির স্থানে চারটি উপাদান বিবেচিত হয়। উপরোক্ত তিনটি বঞ্চনা ছাড়াও সামাজিক পরিত্যাগের (social exclusion) বঞ্চনাও বিবেচনা করা হয়। এখানে UNDP-র মানব দারিদ্র্য সূচককে HPI-1 দ্বারা সূচিত করা হয় এবং OECD-র মানব দারিদ্র্য সূচককে HPI-2 দ্বারা চিহ্নিত করা হয়। HPI-2 হিসাব করার সূত্র হল নিম্নরূপ:

২.৯ সারাংশ

● **অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের মধ্যে পার্থক্য**

অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন এক জিনিস নয়। তবে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটি প্রয়োজনীয় শর্ত। অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির সূচক হল কোনো দেশের জাতীয় উৎপাদন অথবা জাতীয় আয় বৃদ্ধির হার। বিশেষ করে প্রকৃত জাতীয় আয় এবং সেই সঙ্গে মাথাপিছু প্রকৃত জাতীয় আয় বৃদ্ধির হারও এক্ষেত্রে বিবেচ্য। অপরদিকে অর্থনৈতিক উন্নয়ন অর্জন করতে হলে জাতীয় আয় বৃদ্ধি অথবা মাথাপিছু আয়ের বৃদ্ধি ছাড়া আরও কয়েকটি জিনিস অর্জন করা দরকার। যেমন, অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা, আয়ের ন্যায়সঙ্গত বণ্টন, সামাজিক ন্যায়, জনসাধারণের ব্যাপক কল্যাণ, দারিদ্র্য দূরীকরণ, পুষ্টি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, অর্থনৈতিক স্বয়ম্ভরতা, জনসাধারণকে নাগরিক জীবনের স্বাচ্ছন্দ্যের নিরাপত্তা এবং সমৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানবিক ও নৈতিক মূল্যবোধের উন্নয়ন। সুতরাং অর্থনৈতিক উন্নয়ন হল অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির অতিরিক্ত আরও কিছু পরিবর্তন (growth plus changes)।

হ্যারডের মতে যদি সঞ্চয়-আয় অনুপাত বা বিনিয়োগ-আয় অনুপাত বেশি হয় এবং প্রান্তিক মূলধন-উৎপাদন অনুপাত কম ও স্থিতিশীল থাকে, তবে সমৃদ্ধির হারও বেশি হয়।

অর্থনৈতিক উন্নয়নের উপাদানগুলি হল, প্রাকৃতিক সম্পদের সদ্ব্যবহার, বিশেষ করে জমির সদ্ব্যবহার ও ভূমিসংস্কার, দেশের জনসমষ্টির যথাযথ ব্যবহার ও কাম্য জনসংখ্যা, মূলধন সৃষ্টি, উন্নত ধরনের কলাকৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে উৎপাদন, অর্থনৈতিক পরিকাঠামোর উন্নয়ন এবং উন্নত পরিবেশ বজায় রাখা ও দূষণ প্রতিরোধ। মানবিক মূলধনের উপযুক্ত বিনিয়োগ, শিক্ষার সম্প্রসারণ, জনসাধারণের স্বাস্থ্য ও পুষ্টি প্রভৃতিও উন্নয়নের উপাদান হিসাবে বিবেচিত হয়।

● **অর্থনৈতিক উন্নয়নের সূচক হিসাবে মাথাপিছু আয়**

মাথাপিছু আয়ের বৃদ্ধি অর্থনৈতিক উন্নয়নের সূচক হিসাবে সবসময় বিবেচিত হতে পারে না। তবে মাথাপিছু প্রকৃত আয়ের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যদি বর্ধিত আয়ের সমবণ্টন হয় তবে সেটা অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম সূচক হিসাবে বিবেচিত হয়। অনেক সময় জনসংখ্যা বেড়ে গেলে অথচ জাতীয় আয় স্থির থাকলে মাথাপিছু আয় কমে যায়। আবার এমনও হতে পারে, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার এবং জাতীয় উৎপাদন আয় স্থির আছে। মাথাপিছু আয়কে ভিত্তি করে বিভিন্ন দেশের উন্নয়নের মাত্রার পরিমাপ করা হলেও অর্থনৈতিক উন্নয়নের সবকিছু মাথাপিছু আয় দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না।

● **মানব সম্পদের উন্নয়ন**

রাষ্ট্রসংঘের উন্নয়ন কর্মসূচী অনুযায়ী প্রতি বছর (১৯৯০ সাল থেকে) একটি মানবিক উন্নয়ন প্রতিবেদন বেরোয় এবং বিভিন্ন দেশের উন্নয়নের স্তর বিবেচনার জন্য একটি মানবিক উন্নয়ন সূচী তৈরি করা হয়। জনসাধারণের প্রত্যাশিত আয়ু, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, পণ্য অর্জন ও ভোগের সক্ষমতা, উৎপাদিত পণ্যের ওপর স্বত্বাধিকার এবং সবরকম সামাজিক সুরক্ষার ভিত্তিতে এই সূচক তৈরি করা হয়। ১৯৯০ সালের মানবিক উন্নয়ন প্রতিবেদন অনুযায়ী জনসাধারণ হল একটি জাতির প্রকৃত সম্পদ। জনসাধারণের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আশ্রয়, পুষ্টি, সক্ষমতা প্রভৃতি সামাজিক সুরক্ষা সুনিশ্চিত করার জন্য মানবিক সম্পদ বিনিয়োগ অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথ সুগম করে। আয়ের বৈষম্য ও দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং সামাজিক সুযোগের সমবণ্টনও অর্থনৈতিক

● **অর্থনৈতিক উন্নয়নের সূচক (Indicators of Economic Development)**

আমরা জানি অর্থনৈতিক উন্নয়ন হল এমন এক প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে কোনো দেশের মাথাপিছু প্রকৃত জাতীয় আয় দীর্ঘকালব্যাপী বৃদ্ধি পায় এবং দেশের কাঠামোগত পরিবর্তন ঘটে।

অর্থাৎ অর্থনৈতিক উন্নয়নের বৈশিষ্ট্যগুলি হল: প্রথমতঃ অর্থনৈতিক উন্নয়ন হল একটি প্রক্রিয়া অর্থাৎ বিভিন্ন শক্তির ঘাত-প্রতিঘাতের ফল। দ্বিতীয়তঃ মাথাপিছু প্রকৃত আয় বাড়লে তবেই অর্থনৈতিক উন্নয়ন হওয়া সম্ভব। অর্থাৎ প্রকৃত জাতীয় আয় বৃদ্ধির হার জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার থেকে বেশি হতে হবে। তৃতীয়তঃ 'প্রকৃত' আয় বৃদ্ধি ঘটতে হবে, 'আর্থিক' আয় নয়। চতুর্থতঃ মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি দীর্ঘকালীন ভিত্তিতে হতে হবে। পঞ্চমতঃ মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির পাশাপাশি দেশের কাঠামোগত পরিবর্তন ঘটতে হবে।

যেহেতু অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটেছে কিনা তা দেখার জন্য মাথাপিছু প্রকৃত আয় বেড়েছে কিনা তা দেখা হয়, তাই মাথাপিছু আয়কে অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটা সূচক হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। কিন্তু এই সূচকের নানা সীমাবদ্ধতা থাকার ফলে আমরা আরও কতকগুলি অর্থনৈতিক উন্নয়নের সূচক নিয়ে এখানে আলোচনা করব।

● **মাথাপিছু আয় (Per capita Income)**

মোট জাতীয় উৎপাদনকে দেশের জনসমষ্টি দিয়ে ভাগ করলে মাথাপিছু আয় বের করা যায়। মাথাপিছু আয়ের মাধ্যমে ধনী দেশ ও গরিব দেশের মধ্যে উন্নয়নের পার্থক্য (development gap) বিচার করা হয়। উন্নয়নের অভাব বলতে যদি কোনো দেশের দারিদ্র্য বোঝায় তবে মাথাপিছু আয় উন্নয়নের সূচক হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে। তবে মাথাপিছু আয়ের বৃদ্ধি অর্থনৈতিক উন্নয়নের একমাত্র নির্দেশক নয়। জনসংখ্যা কমে গেলে অথচ মোট জাতীয় আয় স্থির থাকলে এবং জাতীয় আয় না বাড়লেও মাথাপিছু আয় বাড়তে পারে। জাতীয় আয় বৃদ্ধির অনুপাত জনসংখ্যা কম থাকলে (যেমন, কুয়েত এবং সংযুক্ত আরব আমিরশাহী প্রভৃতি দেশে) মাথাপিছু আয় বাড়তে পারে। আবার মাথাপিছু আয় বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে যদি জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যায়, অথচ আয়ের সমবণ্টন না হওয়ায় দরিদ্রদের আর্থিক অবস্থার অবনতি হয়, তবে তাদের মাথাপিছু প্রকৃত আয় (Per capita real income) কমে যায়। সেক্ষেত্রে অর্থনৈতিক উন্নয়ন হয়েছে বলা যায় না। মাথাপিছু প্রকৃত আয় অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম নির্দেশক, কিন্তু একমাত্র নির্দেশক নয়। জাতীয় আয় বৃদ্ধি

ও মাথাপিছু প্রকৃত আয় বৃদ্ধি, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির প্রধান বৈশিষ্ট্য সন্দেহ নেই। কিন্তু অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য জাতীয় আয় ও মাথাপিছু প্রকৃত আয় বৃদ্ধির সঙ্গে তার সুষম বণ্টনের দিকটিও গুরুত্বপূর্ণ। এজন্য বলা যায় যে মাথাপিছু আয়ের বৃদ্ধি অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটি প্রয়োজনীয় শর্ত হলেও এটা যথেষ্ট নয়।

যাঁরা মাথাপিছু আয়কে অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাপকাঠি হিসাবে বিবেচনা করতে চান, তাঁদের যুক্তি হল, মাথাপিছু প্রকৃত আয় বাড়লে জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নত হয় এবং তাদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আবাসন প্রভৃতি ক্ষেত্রেও উন্নতি হয়। সামাজিক সুরক্ষাও সেক্ষেত্রে সুনিশ্চিত হয়। এই যুক্তিটি তখনই গ্রহণযোগ্য যখন মাথাপিছু প্রকৃত আয় বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বর্ধিত আয়ের সমবণ্টন হয়। আবার এমনও হতে পারে, বর্ধিত জনসংখ্যার জন্য কোনো দেশে মাথাপিছু আয় কম, অথচ সেই দেশটি উন্নয়নের পথে অনেকটাই এগিয়ে গেছে। সুতরাং মাথাপিছু আয় সব সময়ে উন্নয়নের পরিমাপক হতে পারে না। একই সঙ্গে জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও জাতীয় আয় বৃদ্ধি পেলে মাথাপিছু আয় স্থির থাকতে পারে। তবে দুটি দেশের মধ্যে উন্নয়নের মাত্রা তুলনা করার ক্ষেত্রে মাথাপিছু আয় একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে।

২.১০ অনুশীলনী

১. নীচের প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন। (প্রতিটির মান ২.৫)

১) অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি বলতে কী বোঝায়?

i) মাথাপিছু আয় বলতে কী বোঝায়?

ii) সঞ্চয়-আয় অনুপাত বাড়লেই কি সমৃদ্ধির হার বাড়ে?

iii) অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন কি সমার্থক?

iv) মাথাপিছু আয় কি অর্থনৈতিক উন্নয়নের একমাত্র সূচক?

v) মানবিক উন্নয়ন সূচক কী?

vi) অর্থনৈতিক উন্নয়নের কী কী লক্ষণ?

vii) অর্থনৈতিক উন্নয়নের উপাদানগুলি কী কী?

প্রশ্নমালা মাঝারি দৈর্ঘ্যের (প্রতিটির মান ৫):

১. অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করুন।

২. অর্থনৈতিক উন্নয়নের বিভিন্ন লক্ষণ ও উপাদান সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৩. মাথাপিছু আয় কি অর্থনৈতিক উন্নয়নের নির্দেশক?

প্রশ্নমালা পূর্ণ দৈর্ঘ্যের (প্রতিটির মান ১০):

৪. অর্থনৈতিক উন্নয়নে মানবসম্পদ উন্নয়নের ভূমিকা আলোচনা করুন।

৫. অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি বলতে কী বোঝায়?

৬. ক্ষ্মঅর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সমার্থক নয়।ক্ষ্ম- উক্তিটির বিশদ ব্যাখ্যা করুন।

৭. অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলতে কী বোঝায়?

৪. অর্থনৈতিক উন্নয়নের উপাদানগুলি কী কী?

সঠিক উত্তর নির্বাচনের প্রশ্নাবলী

● মানব উন্নয়ন সূচক (HDI) তৈরি করার জন্য ------- তথ্যের প্রয়োজন হয়।

ক) একটি খ) দুইটি গ) তিনটি) ঘ) পাঁচটি

● মানব দারিদ্র্য সূচক প্রবর্তন করে ,

ক) UNDP খ) UNE (CO) WHO V FAO

● ক্ষমতায়নের লিঙ্গভিত্তিক পরিমাপ কোন কোন বিষয়ের নির্ভর করে ,

ক) রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ ও সিদ্ধান্তগ্রহণ,

খ) অর্থনৈতিক কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ ও সিদ্ধান্তগ্রহণ

গ) অর্থনৈতিক সম্পদসমূহের উপর অধিকার

ঘ) সব কটিই ঠিক।

২.১১ গ্রন্থপঞ্জী

1. Todaro M. PéôéEconomics for a Developing Economy SLongman– London and New York 1982V
2. Thirlwall A. P. Growth and Development with Special Reference to Developing Economics SELBS/MacMillan 1983V
3. Sen AmartyaéôéDevelopment- Which Way NowÚ Economic Journal– Vol. 93– 1983
4. Gouvlet D.éôéThe Cruel Choice- A New Concept on the Theory of Development SNew York- Atheneum 1971V
5. Gupta Subrata and Sujit Ghosh A Tract on Economic Development- Process and Perspectives SCharu Publishing Company– Kolkata– 1992V

একক ৩ ❑ অর্থনৈতিক উন্নয়নের তত্ত্ব

গঠন

৩.১ উদ্দেশ্য

৩.২ প্রস্তাবনা

৩.৩ পল বরণের নির্ভরশীলতা তত্ত্ব

৩.৪ ফ্র্যাঙ্কের ঔপনিবেশিক শোষণের তত্ত্ব

৩.৫ বাণিজ্য মূলধন ও অনুন্নতি কে-এর তত্ত্ব

৩.৬ পরিবর্তিত উন্নয়ন ভাবনা

৩.৬.১ অসম বিনিময় তত্ত্ব ও উন্নয়ন

৩.৬.২ অনুন্নতির নয়া মার্ক্সীয় ব্যাখ্যা: সংক্ষিপ্তসার

৩.৬.৩ সমৃদ্ধির চালিকা শক্তি বা বিকাশের যন্ত্র হিসাবে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য

৩.৬.৪ ওয়াশিংটন সহমত

৩.৬.৫ স্ববহনক্ষম বা দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়নের অভিলক্ষ্য

৩.৭ সারাংশ

৩.৮ অনুশীলনী

৩.৯ গ্রন্থপঞ্জী

৩.১ উদ্দেশ্য

এই এককে আমরা কোনো দেশের অনুন্নতির প্রকৃতি ও কারণকে ব্যাখ্যা করার জন্য নির্ভরশীলতা তত্ত্ব আলোচনা করব। এই তত্ত্বকে নয়া মার্ক্সবাদী তত্ত্বও বলা হয়ে থাকে। এই সঙ্গে আমরা ঔপনিবেশিক শোষণের তত্ত্বও আলোচনা করব। বাণিজ্য মূলধন কীভাবে উন্নত দেশ থেকে এসে অন্য দেশের অনুন্নতি ঘটায় সেটাও আমরা আলোচনা করব। নির্ভরশীলতা তত্ত্বের কয়েকজন প্রবক্তা অর্থনৈতিক অনুন্নতিকে অসম বিনিময়ের (unequal exchange) মাধ্যমে ব্যাখ্যা করেছেন সে বিষয়েও আমরা আলোকপাত করব। পরবর্তী পর্যায়ে আমরা দেখব যে নয়া-ঔপনিবেশিকতা কীভাবে কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তার প্রভাব বিস্তার করছে এবং উন্নয়নশীল দেশগুলিকে তাদের আওতায় নিয়ে এসে তাদের অনুন্নতির কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এই প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল IMF, World Bank, GATT, WTO, UNCTAD, EU ইত্যাদি।

৩.২ প্রস্তাবনা

অর্থনৈতিক উন্নয়নের চিরাচরিত তত্ত্বে উন্নয়নকে একটি প্রক্রিয়া বলে ধরা হয়, আর অনুন্নতি বা স্বল্পোন্নতিকে একটি অবস্থা বলে বর্ণনা করা হয়। এই তত্ত্বে কোনো দেশের উন্নয়ন অপর দেশের উন্নয়ন বা অর্থনৈতিক অবস্থার উপর নির্ভর করে না। মোটামুটিভাবে বলতে গেলে, এই তত্ত্বে বিভিন্ন দেশের মধ্যে উন্নয়নের মাত্রার তারতম্যের কারণ হল তাদের মধ্যে প্রাকৃতিক সম্পদ, শ্রম ও মূলধনের জোগানে পার্থক্য। উন্নয়ন সম্পর্কে এই চিরাচরিত তত্ত্বের বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়া হিসাবে আর একটি নতুন তত্ত্ব গড়ে উঠেছে। এই নতুন তত্ত্বে কোনো দেশের অনুন্নতির প্রকৃতি ও কারণকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে সেই দেশের উন্নত দেশের উপর নির্ভরশীলতা এবং উন্নত দেশ কর্তৃক শোষণের দ্বারা। মোটের উপর এই নতুন তত্ত্বের বক্তব্য হল যে, বিশ্বের বর্তমান উন্নত দেশ কর্তৃক শোষিত হওয়ার দরুনই বর্তমানে কিছু দেশ অনুন্নত। কেউ কেউ এই তত্ত্বকে নয়া-মার্ক্সবাদী তত্ত্ব বলেছেন, আবার কেউ কেউ একে নির্ভরশীলতা তত্ত্ব (Dependency Theory) বলেছেন। এই তত্ত্বের প্রধান প্রবক্তারা হলেন Paul Baran, Andre Frank, Geoffrey Kay, Arghini Emmanuel, Samir Amin, Dos Santos, Yves Lacoste এবং আরও অনেকে। সংক্ষেপে এই নির্ভরশীলতা তত্ত্বের বক্তব্য হল যে, উন্নত দেশের উপর স্বল্পোন্নত দেশের নির্ভরশীলতাই ঐ সমস্ত দেশের অনুন্নতির মূল কারণ।

Paul Baran মনে করেন যে, উন্নত বা শক্তিশালী দেশ কর্তৃক নির্ভরশীল দেশ থেকে উদ্বৃত্ত হরণ করাই হল নির্ভরশীল দেশের অনুন্নতির কারণ। অপরদিকে, Frank মনে করেন যে, অনুন্নত দেশে উপনিবেশ স্থাপনই তাদের অনুন্নতির প্রধান কারণ। আবার, জ্ঞখা মনে করেন যে, অনুন্নত দেশে বাণিজ্য মূলধনের বিশেষ ধরনের ভূমিকাই এ সমস্ত দেশে অনুন্নতির মূল কারণ। Emmanuel-এর যুক্তি, অনুন্নতির কারণ হল উন্নত ও অনুন্নত দেশের মধ্যে দ্রব্যসামগ্রীর অসম বিনিময় হার। এভাবে দেখা যাচ্ছে যে, নির্ভরশীলতা তত্ত্বের বিভিন্ন ভাষ্য রয়েছে এবং তাদের প্রবক্তাদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। কিন্তু তাঁরা মোটের উপর একটা বিষয়ে একমত। এঁরা সকলেই বলেছেন যে, উন্নত দেশের উপর স্বল্পোন্নত দেশগুলির নির্ভরশীলতাই কোনো না কোনো ভাবে স্বল্পোন্নত দেশে অনুন্নতি ঘটিয়েছে। সুতরাং, নির্ভরশীলতাই অনুন্নতি উদ্ভবের পিছনে প্রধান কারণ।

৩.৩ Paul Baran এর নির্ভরশীলতা তত্ত্ব (Dependency Theory)

১৯৫৮ সালে Paul Baran-এর সুবিখ্যাত পুস্তক The Political Economy of Growth প্রকাশিত

বার পর অনুন্নতির নয়া-মার্ক্সীয় তত্ত্ব জনপ্রিয়তা লাভ করে। এই তত্ত্বকে নির্ভরশীলতা তত্ত্বও (Dependency Theory) বলা হয়। অধ্যাপক Baran-এর (এবং আরও অনেকে, যেমন, Marvin Harris, Marshall Sahlin প্রমুখ) মতে, অর্থনৈতিক উন্নতি এবং অনুন্নতি উভয়েরই পিছনে অর্থনৈতিক উদ্বৃত্ত সংগ্রহ এবং ব্যবহারের বড় ভূমিকা আছে। আমরা জানি যে, মার্ক্সীয় তত্ত্বসহ সমগ্র ধ্রুপদী অর্থনীতিতে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিকাশ এবং উন্নয়নে অর্থনৈতিক উদ্বৃত্তের ধারণা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এসমস্ত তত্ত্বে উদ্বৃত্তের

পরিমাণ এবং তার সংগ্রহ পদ্ধতি অর্থনীতির উন্নয়নের গতিপথ নির্ধারণ করে। Baran যুক্তি দিয়েছেন যে, উপনিবেশগুলি তাদের শাসক (colonisers) দেশগুলির উপর নানাভাবে নির্ভরশীল ছিল। ফলে শাসক দেশগুলি উপনিবেশগুলি উদ্বৃত্ত হরণ করেছে। ফলে উপনিবেশগুলি তাদের বিনিয়োগযোগ্য উদ্বৃত্ত থেকে বঞ্চিত হয়েছে। আর এর ফলেই একদিকে উপনিবেশগুলিতে অনুন্নতি ঘটেছে এবং অন্যদিকে একই সময়ে উপনিবেশকারী দেশগুলিতে উন্নয়ন ঘটেছে। একেই নয়া-মার্ক্সীয় তত্ত্ব বলা হচ্ছে। এই নয়া-মার্ক্সীয় তত্ত্বের মতে, ঔপনিবেশিক শোষণের ফলেই ধনতন্ত্রের বিকাশ সম্ভব হয়েছে। এভাবে এই তত্ত্বে দেখানো হয়েছে যে, বিশ্ব অর্থনীতিতে এক অংশে ধনতন্ত্রের বিকাশ এবং উন্নতির ফলেই অপর অংশে অর্থনৈতিক অনুন্নতি ঘটেছে।

Baran তাঁর আলোচনায় সুপ্ত অর্থনৈতিক উদ্বৃত্তের (potential economic surplus) ধারণার উপর আলাদাভাবে জোর দিয়েছেন। তাঁর মতে, কোনো অর্থনীতিতে একচেটিয়া কাঠামো বজায় থাকলে ঐ অর্থনীতির বিনিয়োগযোগ্য সুপ্ত অর্থনৈতিক উদ্বৃত্ত সমাজের উন্নয়নের জন্য পাওয়া যায় না-সেই উদ্বৃত্তের উৎপাদনশীল ব্যবহার হয় না, তার অপচয় হয়। সুপ্ত অর্থনৈতিক উদ্বৃত্ত চারটি আকারে দেখা দিতে পারে: Si) উদ্বৃত্ত ভোগ, Sii) অনুৎপাদনশীল শ্রমিক, Siii) অনুৎপাদনশীল বিনিয়োগ (যেমন, বিজ্ঞাপন, ফ্যাশন শো, সৌন্দর্য প্রতিযোগিতা প্রভৃতি) এবং Siv) বাণিজ্যচক্রের ওঠানামাজনিত বা ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের নৈরাজ্যের ফলে সৃষ্ট বেকারি। সুতরাং, স্বল্প উদ্বৃত্ত বা উদ্বৃত্তের অভাবের সমস্যা নয়, সমস্যা হল এই উদ্বৃত্তের উপযুক্ত ব্যবহারের। স্বল্পোন্নত দেশে এই উদ্বৃত্ত অনুৎপাদনশীল ভোগে নষ্ট হয়েছে, রাজারাজড়াদের বিলাসব্যসন এবং জাঁকজমকে বিনষ্ট হয়েছে, যুদ্ধে ব্যয়িত হয়েছে অথবা মন্দির, মসজিদ, গির্জা আর সমাধি তৈরিতে ব্যবহৃত হয়েছে। বিশ্ব অর্থনীতিতে যখন বাণিজ্য মূলধন ও শিল্প মূলধনের উদ্ভব ঘটেছিল, তখন সেই মূলধনের দ্বারা স্বল্পোন্নত দেশের এই উদ্বৃত্ত উন্নত প্রভু-দেশগুলি (mother country) নিয়ে যায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে পনিশকারী দেশগুলি এই উদ্বৃত্ত নিঃসরণ করে নিজের দেশে পাঠাতে তাদের রাজনৈতিক ক্ষমতার অপব্যবহার করেছিল। এর ফলে তাদের নিজের দেশে মূলধন গঠন প্রক্রিয়া মসৃণ এবং সহজ হয়েছিল। একই সঙ্গে, উপনিবেশগুলি তাদের নিজস্ব উদ্বৃত্ত থেকে বঞ্চিত হল যা তাদের মূলধন গঠনে কাজে লাগাতে পারত। এভাবে Baran দেখিয়েছেন যে, উদ্বৃত্ত দু-দিকে ধারালো ক্ষুরের (two-edged razor) ন্যায় কাজ করেছে। ইহা একই সঙ্গে উন্নতি এবং অনুন্নতির সৃষ্টি করেছে।

Baran-এর তত্ত্বের বিরুদ্ধে দুটি প্রধান সমালোচনা করা যেতে পারে। প্রথমত, উন্নত দেশ থেকে একচেটিয়া মূলধন অনুন্নত দেশে এসেছিল কারণ এ সমস্ত দেশে মুনাফার হার উন্নত দেশের তুলনায় বেশি ছিল। পুঁজিপতিরা অনুন্নত দেশের সস্তা শ্রম ও কাঁচামাল কাজে লাগিয়ে কম খরচে পণ্য উৎপাদন করতে পারে। তাহলে তারা উদ্বৃত্ত অনুন্নত দেশেই পুনরায় বিনিয়োগ করে না কেন? কেন তারা উদ্বৃত্ত নিজের দেশে নিয়ে যায়? Baran-এর তত্ত্বে এই প্রশ্নের কোনো উত্তর পাওয়া যায় না। দ্বিতীয়ত, Baran (এবং Frankও) কোনো অনুন্নত দেশের শোষণকে ব্যাখ্যা করার জন্য মার্ক্সের শোষণ তত্ত্বের শ্রেণি সংঘাতের ধারণা ব্যবহার করেছেন। কিন্তু মার্ক্সের তত্ত্ব দুটি শ্রেণির মধ্যে শোষণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আমাদের আলোচনায় রয়েছে দুটি দেশ-দুটি শ্রেণি নয়। সুতরাং কোনো শ্রেণির দ্বারা কোনো শ্রেণিকে শোষণ করার মার্ক্সের যে তত্ত্ব, তা দুটি

দেশের ক্ষোত্রেও প্রযোজ্য হবে কিনা, সে সম্পর্কে প্রশ্ন উঠতে পারে।

Baran-এর তত্ত্বের এ সমস্ত সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও বলা যায় যে, বিশ্বের অনেক দেশেরই অনুন্নতির পিছনে ঔপনিবেশিক শোষণের একটা বড় ভূমিকা আছে। ভারতের উদাহরণ হতেও এর প্রমাণ মেলে। অষ্টাদশ এবং উনবিংশ শতাব্দীতে ভারত ব্রিটিশ উপনিবেশ হিসাবে শোষিত হয়েছিল। এই শোষণের দুটি প্রধান রূপ হল: Si) ভারত থেকে ব্রিটেনে একতরফা অর্থনৈতিক সম্পদের নিঃসরণ (drain) এবং Sii) ব্রিটিশ বাণিজ্য নীতির দ্বারা ভারতীয় শিল্পের ধ্বংস সাধন বা শিল্পের অপনয়ন (de-industrialisation)। অর্থনৈতিক নিঃসরণ ভারতকে তার উদ্বৃত্ত থেকে বঞ্চিত করেছিল। এই উদ্বৃত্ত ভারতে মূলধন গঠনের ও শিল্পায়নের কাজে ব্যবহৃত হতে পারতো। কিন্তু তা হয়নি। পাশাপাশি এই উদ্বৃত্ত ব্রিটেনের শিল্পবিপ্লবে সাহায্য করেছিল। এভাবে এক অংশে ঘটেছিল উন্নতি ও অপর অংশে অনুন্নতি। তবুও মানতেই হয় যে, এই নিঃসরণ ভারতের অনুন্নতির একমাত্র কারণ নয়। ব্রিটেনের সঙ্গে বহির্বাণিজ্যে লিপ্ত হবার আগে বা ভারতের অর্থনীতি উন্মুক্ত (open) হবার আগে ছিল মুঘল যুগ। এই যুগেও ইউরোপীয় দেশগুলির তুলনায় ভারত ছিল অনুন্নত। এই সময়ের অনুন্নতির পিছনে সম্ভাব্য কারণগুলো হল উদ্বৃত্ত সম্পদের অপবণ্টন এবং অপচয় (misallocation and wastage), বিশেষ ধরনের সামন্ততান্ত্রিক মনোভাবের জন্য শাসকশ্রেণির অহেতুক জাঁকজমকপ্রিয়তা (extravagance), অনুপ্রেরণার অভাব প্রভৃতি। সুতরাং, কোনো দেশের অনুন্নতির জন্য ঔপনিবেশিক শোষণ অন্যতম প্রধান কারণ হলেও একমাত্র কারণ নয়। সেদিক থেকে দেখতে গেলে, অনুন্নতির ব্যাখ্যা হিসাবে এই নয়া-মার্ক্সীয় তত্ত্ব বা নির্ভরশীলতা তত্ত্ব কিছুটা একপেশে (one-sided)।

৩.৪ ফ্র্যাঙ্ক-এর ঔপনিবেশিক শোষণের তত্ত্ব (Frank's Theory of Colonial Exploitation)

অনুন্নতি সম্পর্কে নির্ভরশীলতা তত্ত্ব বা নয়া-মার্ক্সীয় তত্ত্বের অন্যতম প্রবক্তা হলেন A. G. Frank। তিনি মনে করেন যে, অর্থনৈতিক অনুন্নতির উৎপত্তি ও বিস্তারের পিছনে উপনিবেশবাদ একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসাবে কাজ করেছে। Frank-এর যুক্তি এভাবে বর্ণনা করা যেতে পারে। তাঁর মতে, অর্থনৈতিক অনুন্নতি এবং উন্নতি আসলে বিশ্ব অর্থনীতিতে ধনতান্ত্রিক উন্নয়ন প্রক্রিয়ারই দুটি দিক। উপনিবেশগুলি থেকে সম্পদ নিঃসরণ করার ফলে ঐ উপনিবেশগুলি তাদের বিনিয়োগযোগ্য উদ্বৃত্ত থেকে বঞ্চিত হয়েছে। ফলে উপনিবেশগুলি অনুন্নতই রয়ে গেছে। একই সঙ্গে উপনিবেশ স্থাপনকারী দেশগুলিতে উদ্বৃত্ত বেড়েছে এবং তা ঐ সমস্ত দেশের মূলধন গঠনে সাহায্য করেছে।

এর আগে Yves Lacoste বলেছিলেন যে, বৈদেশিক প্রভাবের কথা বাদ দিলে অনুন্নত দেশের সমস্যা ঠিকভাবে অনুধাবন করা যাবে না। তাঁর মতে, অনুন্নত দেশে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার অনুপ্রবেশের ফলেই অনুন্নতির উদ্ভব হয়েছে। অবশ্য Lacoste উপনিবেশবাদকে অনুন্নতির একমাত্র কারণ বলে মনে করেন না, যদিও এটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণ। অনুন্নতির কারণ হিসাবে উপনিবেশবাদের উপর সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছেন Frank On Capitalist Underdevelopment নামক বইয়ে।

Frank-এর মতে, অনুন্নতির অর্থ নিছক উন্নতির অভাব নয়। বিশ্ব অর্থনীতিতে যখন কোনো উন্নয়ন ঘটেনি, তখন অনুন্নতি বলেও কিছু ছিল না। তিনি বলেছেন, উন্নতি এবং অনুন্নতির মধ্যে সম্পর্ক নিছক তুলনার সম্পর্ক নয়, অর্থাৎ কিছু অঞ্চল অন্য অঞ্চলের তুলনায় বেশি উন্নত বা অনুন্নত এরূপ অর্থে উন্নতি এবং অনুন্নতি শব্দ দুটি সম্পর্কযুক্ত নয়। উন্নতি এবং অনুন্নতি আসলে ধনতান্ত্রিক উন্নয়নের সাধারণ ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। ধনতান্ত্রিক উন্নয়ন মৌলিকভাবে সংঘাতপূর্ণ উন্নয়ন। শোষণই হল এর ভিত্তি। আর এর ফলেই সৃষ্টি হয়েছে উন্নতি এবং অনুন্নতি।

Frank যুক্তি দিয়েছেন যে, উন্নতি এবং অনুন্নতি উভয়েই রীতিবদ্ধভাবে এবং সর্বত্র উপনিবেশবাদের সহিত জড়িত। বাস্তবিকপক্ষে, এরা উপনিবেশবাদেরই ফল। ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা বলতে কতকগুলি সম্পর্ককে বোঝায় যার মধ্যে আধিপত্য (domination), অধীনতা বা বশ্যতা (subordination) এবং শোষণের মুখ্য ভূমিকা থাকে। এশিয়া, আফ্রিকা এবং লাতিন আমেরিকার প্রায় সমস্ত দেশই, যারা বর্তমানে অনুন্নত দেশের অন্তর্ভুক্ত, একসময় বর্তমানের কোনো না কোনো উন্নত দেশের উপনিবেশ ছিল। এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে জাপানই প্রথম উন্নত হয়, আর জাপান কখনোই সেই অর্থে উপনিবেশ ছিল না। জাপানের ব্যাপারটি একটি ব্যতিক্রমী ঘটনা, যা থেকে শিক্ষালাভ করা যেতে পারে। এখানে শাসকশ্রেণি দেশটির উন্নয়নের জন্য নানা ব্যবস্থা গ্রহণ করে। বিশ্ব অর্থনীতিতে উপনিবেশবাদী, সাম্রাজ্যবাদী এবং ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার যে পারস্পরিক সম্পর্ক ও নির্ভরশীলতা, সেই সম্পর্কের মধ্যে জাপান কখনোই আসেনি বা এই জটিল আবর্তের মধ্যে পড়েনি। জাপানের বিদেশি সরকার কোনো বৈদেশিক বিনিয়োগ বা সাহায্য ছাড়াই জাপানের শিল্পোন্নয়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। জাপানকে তাই উপনিবেশবাদের কুফল ভোগ করতে হয়নি। সেজন্যই এশিয়ার অন্য দেশগুলোর তুলনায় জাপান অনেক বেশি উন্নত হতে পেরেছে।

Frank তাঁর তত্ত্বে অ-উন্নত (undeveloped) এবং স্বল্পোন্নত (underdeveloped) এই দুই শ্রেণির দেশের মধ্যে পার্থক্য করেছেন। তাঁর মতে, পশ্চিম ইউরোপের নতুন দেশগুলি কখনোই স্বল্পোন্নত ছিল না, সেগুলি ছিল অনুন্নত। কিন্তু এশিয়া, আফ্রিকা এবং লাতিন আমেরিকার দেশগুলিতে স্বল্পোন্নতির কারণ হল বিশ্ব অর্থনীতির সঙ্গে এই দেশগুলির যোগাযোগ এবং লেনদেন। তাদের ঔপনিবেশিক পরিচিত এবং অবস্থানই (status) তাদের অর্থনৈতিক ইতিহাসের গতিপথ নির্ধারণ করে দিয়েছে। Frank যুক্তি দিয়েছেন যে, এর ফলেই ঐ দেশগুলি প্রাথমিক দ্রব্যের রপ্তানিকারী এবং শিল্পজাত দ্রব্যের আমদানিকারী দেশে পরিণত হয়েছে। এর ফলেই তাদের উৎপাদন ও ভোগ কাঠামো বিচ্ছিন্ন (dislocated) হয়ে গেছে। এই ঔপনিবেশিক ধরনের বাণিজ্য অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে কারণ এর ফলেই ঐ সমস্ত দেশে বাণিজ্য মূলধন (merchant capital) শিল্প মূলধনে Sindustrial capitalV রূপান্তরিত হতে পারেনি। Pombal-এর ১৭৫৫ সালে লেখা প্রবন্ধ হতে উদ্ধৃতি দিয়ে Frank স্মরণ করিয়ে দেবার চেষ্টা করেছেন যে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলে পোর্তুগাল অর্থনৈতিক ভাবে দুর্বল হয়েছে এবং ইংলণ্ডের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। Frank অনুশোচনা করেছেন যে, অনেক বছর পর Ricardo তাঁর তুলনামূলক সুবিধার তত্ত্বের ভিত্তিতে ইংলণ্ডকে কাপড় তৈরিতে এবং পোর্তুগালকে মদ তৈরিতে বিশেষায়ণের সুপারিশ করেছেন। কিন্তু Frank মনে করেন যে, এতে পোর্তুগালের ক্ষতি হয়েছে। কাপড় তৈরিতে বিশেষায়ণ ঘটালে শিল্পদ্রব্য

উৎপাদনের ক্ষমতা বাড়ে, আর মদ তৈরিতে বিশেষায়ণ ঘটালে কৃষি দ্রব্যের উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ে। আর তাই ইংলণ্ড শিল্পায়িত দেশে পরিণত হয়েছে, পোর্তুগাল হয়নি।

এভাবে Frank দাবি করেন যে, বিভিন্ন তথ্য প্রমাণ এই মতকেই প্রতিষ্ঠিত করে যে, অনুন্নতি এবং উপনিবেশবাদ একে অপরের সঙ্গে উভয় দিক হতেই ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত। অর্থাৎ উপনিবেশ দেশ মানেই সেই দেশটি অনুন্নত, আর উপনিবেশ না হলে অথবা উপনিবেশকারী দেশ হলে সেই দেশটি উন্নত। প্রশ্ন হল, উপনিবেশবাদের বিশেষ কোন জিনিসটি অনুন্নতির জন্য বিশেষভাবে দায়ী? Frank দাবি করেন, তথ্য প্রমাণ থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ধনতান্ত্রিক কোনো দেশের অধীনে 'অর্থনৈতিক' উপনিবেশ হয়ে থাকলে ঐ উপনিবেশ দেশটির অনুন্নতি ঘটে। তাই Frank-এর মতে, অনুন্নতি এবং অর্থনৈতিক উন্নতি উভয়েই বিশ্বব্যাপী এক পরস্পর সংযুক্ত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ফল। সেই অর্থনৈতিক ব্যবস্থাটি হল ধনতন্ত্র। ধনতন্ত্রের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই বিশ্বে উন্নতি ও অনুন্নতি একই সঙ্গে দেখা দিতে থাকে। Frank বলেছেন যে, ষোড়শ শতাব্দীতে ইউরোপীয় বাণিজ্যবাদের (marcantilism) প্রসারের ফলে বিশ্বব্যাপী এক পরস্পর সংযুক্ত ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার (a single integrated capitalist system of worldwide scale) উদ্ভব ঘটে। এর ফলে কেন্দ্র বা Metropole-এর উন্নয়ন সাধিত হয়। কেন্দ্র বা Metropole তার প্রান্তীয় (periphery) বা Satellite দেশগুলিকে শোষণ করে। এই শোষণের পদ্ধতি এবং মাত্রা এমন যে কেন্দ্রস্থিত দেশটির উন্নতি ঘটে, আর প্রান্তীয় দেশগুলি অনুন্নত বা স্বল্পোন্নত দেশে পরিণত হয়। এভাবে কেন্দ্র বা Metropole-এর উন্নতি এবং প্রান্তের দেশের অনুন্নতি একই সঙ্গে ঘটে থাকে। আরও সঠিকভাবে বলতে গেলে, তারা উভয়েই একই প্রক্রিয়ার অংশ। ধনতান্ত্রিক বিশ্বে উন্নতির বিস্তার এবং অনুন্নতির ব্যাপ্তি (development of the development and development of the underdevelopment) উভয় প্রক্রিয়াই আন্তর্জাতিক স্তরে এবং বিভিন্ন জাতীয় স্তরে চলতে থাকে। চ্প্থ—দ্ধ দাবি করেছেন যে, এই অনুন্নতি থেকে মুক্তির উপায় হল সমাজতন্ত্র। যে সমস্ত দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, কেবলমাত্র সেই সমস্ত দেশই কেন্দ্র কর্তৃক প্রান্তীয় দেশের শোষণ থেকে মুক্তি পেয়েছে। তিনি মনে করেন যে, সমাজতন্ত্রই হল ধনতান্ত্রিক শোষণ তথা অনুন্নতি থেকে মুক্তির পথ। অনুন্নতির অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার একমাত্র পথ হল ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা থেকে বেরিয়ে আসা (The only way out of underdevelopment is the way out of the capitalist system)।

বিভিন্ন অর্থনীতিবিদ Frank-এর তত্ত্বের নানা সমালোচনা করেছেন। কয়েকটি প্রধান সমালোচনা নিম্নলিখিতভাবে বর্ণনা করা যেতে পারে। প্রথমত, অনুন্নতির ব্যাখ্যা দিতে Frank দ্রব্যের বিনিময় সম্পর্ক বা বাণিজ্য মূলধনের ভূমিকার উপর জোর দিয়েছেন। দ্রব্যের উৎপাদন সম্পর্ক বা শিল্প মূলধনের ভূমিকা তিনি অবহেলা করেছেন। কিন্তু অনুন্নতির পিছনে শিল্প মূলধনেরও ভূমিকা আছে। দ্বিতীয়ত, Frank-এর তত্ত্বে বলা হয়েছে যে, ধনতান্ত্রিক উন্নয়নের পূর্বে অনুন্নতি বলে কিছু ছিল না। ইহা ঐতিহাসিকভাবে সত্য নয়। তৃতীয়ত, Frank দাবি করেছেন যে, অনুন্নতি এবং উপনিবেশবাদ পরস্পরের সঙ্গে উভয়দিক থেকেই সম্পর্কযুক্ত অর্থাৎ উপনিবেশ হওয়ার ফলে কোনো দেশ অনুন্নত আবার কোনো দেশ উপনিবেশকারী বলে উন্নত। কিন্তু সুইডেন ও নরওয়ের কোনো উপনিবেশ ছিল না। কিন্তু তারা উন্নত দেশ। Frank-এর তত্ত্ব এই

জাতীয় দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ব্যাখ্যা করতে পারে না। চতুর্থত, Franঙ্ক দাবি করেছেন যে, অনুন্নতি থেকে মুক্তি পাওয়ার একমাত্র উপায় হল ধনতন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে বা ধনতন্ত্রের পথ থেকে সরে গিয়ে সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু বিগত শতাব্দীর শেষের দশকের ইতিহাস থেকে দেখা যাচ্ছে যে, সমাজতন্ত্রও একটি উন্নত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা হিসাবে টেকেনি। সমাজতন্ত্র আজ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা হিসাবে নানা সংকটের সম্মুখীন। বিশ্ব অর্থনীতিতে সমাজতন্ত্র আজ প্রায় অবলুপ্তির পথে। পঞ্চমত, Frank- On Capitalist Underdevelopment বইয়ে অনুন্নতি সম্পর্কে আলোচনা আদৌ বিশ্লেষণধর্মী (analytical) নয়। অর্থনৈতিক তত্ত্ব কখনোই কিছু ব্যক্তিগত বিশ্বাস বা পছন্দ-অপছন্দের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠতে পারে না। নিজের কোনো বিশ্বাস বা প্রতীতিকে সেখানে যুক্তি ও বিশ্লেষণের উপর দাঁড় করাতে হয়। Frank-এর তত্ত্বে তাঁর নিজস্ব বিশ্বাসের (conviction) কথা যতটা আছে, ব্যক্তিগত বিবৃতি (statement) যতটা আছে, ততটা বিশ্লেষণ বা যুক্তিনির্ভর আলোচনা নেই।

৩.৫ বাণিজ্য মূলধন ও অনুন্নতি: জ্ঞথা-এর তত্ত্ব (Merchant Capital and Underdevelopment- Kay's Theorা):

ধনতান্ত্রিক উন্নয়নের প্রাথমিক স্তরে মূলধনের বিভিন্ন রূপ ও বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে Geoffrey Kay কোনো দেশের অনুন্নতির অবস্থাকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। অনুন্নতির মার্ক্সীয় ব্যাখ্যার তিনিও একজন প্রবক্তা। তাঁর মতে বাণিজ্য মূলধনের সঙ্গে অনুন্নতি এবং উন্নতির প্রক্রিয়া গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত। জ্ঞথা বলেছেন, ঔপনিবেশিক যুগে স্বল্পোন্নত দেশে উন্নত দেশ থেকে আসা বাণিজ্য মূলধন উন্নত দেশের শিল্প মূলধনের প্রতিনিধি (agent) হিসাবে কাজ করেছে এবং বাণিজ্য মূলধনের এই ভূমিকাই স্বল্পোন্নত দেশের অনুন্নতির জন্য দায়ী।

জ্ঞথা-এর যুক্তি হল, ব্যবসায়ীরা উৎপাদন কৌশলের কোনো বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটিয়ে মুনাফা অর্জন করে না, তারা মুনাফা অর্জন করে বাজার নিয়ন্ত্রণ করে। অন্যভাবে বলতে গেলে বাণিজ্য মূলধন কোনো মূল্য সৃষ্টি করে না বা পণ্য উৎপাদন করে না। তা শুধু পণ্য বিনিময়ের মাধ্যমে মুনাফা অর্জন করে। ব্যবসায়ীরা যত বেশি বাজার নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, মুনাফার হারও তত বেশি হয়। বিশ্ব অর্থনীতিতে যখন শিল্প মূলধনের আধিপত্য কায়েম হয়নি, তখন বাণিজ্য মূলধনেরই আধিপত্য ছিল। কিন্তু সেই আধিপত্যের যুগেও বাণিজ্য মূলধন প্রতিযোগিতার সুবিধা নেয়নি। বরং বাণিজ্য মূলধন প্রতিযোগিতা এড়িয়ে গেছে। ইহা প্রতিযোগিতার নীতি ছেড়ে দিয়ে বরং সরকারি সাহায্য চেয়েছে ব্যবসার বিভিন্ন ক্ষেত্রে একচেটিয়া অবস্থার সুযোগ পাওয়ার জন্য। ফলে উৎপাদনী শক্তির বিকাশে বাণিজ্য মূলধনের ভূমিকা তেমন কিছু উল্লেখযোগ্য নয়। দ্রব্য বিনিময়ের জগৎ হতে বেরিয়ে বাণিজ্য মূলধন কখনোই দ্রব্য উৎপাদনের জগতে প্রবেশ করতে পারেনি। আমরা জ্ঞথা-এর তত্ত্ব অনুসরণ করে দেখাব কীভাবে বাণিজ্য মূলধন শিল্প মূলধনের প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করেছে এবং এই ভূমিকায় ইহা কীভাবে স্বল্পোন্নত দেশে অনুন্নতির প্রসারে সাহায্য করেছে।

উন্নত দেশ থেকে আসা বাণিজ্য মূলধন অনুন্নত দেশের অ-ধনতান্ত্রিক (non-capitalist) উৎপাদকদের

কাছ থেকে কাঁচামাল কেনে। এই কাঁচামাল বিক্রি করা হয় উন্নত দেশের উৎপাদকদের কাছে। শিল্পজাত দ্রব্যসামগ্রী তৈরি করতে এই কাঁচামাল ব্যবহৃত হয়। এই কাজটি করে শিল্প মূলধন। এখন, এই উৎপন্ন শিল্পজাত দ্রব্যের একটা অংশ বাণিজ্য মূলধন কেনে। এই শিল্পজাত দ্রব্য স্বল্পোন্নত দেশে বিক্রি করা হয়। সুতরাং, দেখা যাচ্ছে যে, বাণিজ্য মূলধন চার রকমের বিনিময়ের কাজ করে: দুটি ক্রয়ের আর দুটি বিক্রয়ের। আমরা সমগ্র বিনিময় পদ্ধতিটি বা বিনিময় চক্রটি (circuit) এভাবে প্রকাশ করতে পারি:

M-C-M-C-M-

সমগ্র বিনিময় প্রক্রিয়ার প্রথম অংশের মুনাফা হল (M’-M)। এই মুনাফা দুটি সূত্র থেকে আসতে পারে:

i) ব্যবসায়ীরা কাঁচামাল কেনার সময় স্বল্পোন্নত দেশের উৎপাদকদের কাঁচামালের জন্য কম মূল্য (value) দিতে পারে।

ii) এই কাঁচামাল উন্নত দেশে শিল্প মূলধনের কাছে বিক্রির সময় বেশি মূল্য নিতে পারে।

প্রথম বিনিময়ের ক্ষেত্রে যে মুনাফা পাওয়া যাচ্ছে তা কাঁচামালের উৎপাদকদের উদ্বৃত্ত থেকে সরাসরি আসছে। কিন্তু দ্বিতীয় বিনিময়ের ক্ষেত্রে মুনাফা উৎপাদনশীল মূলধনের উদ্বৃত্ত মূল্য থেকে পরোক্ষভাবে আসছে। তেমনি, বিনিময় চক্রের দ্বিতীয় অংশেও (M’-C’- M”) একই রকমের পরিস্থিতির উদ্ভব হচ্ছে। এক্ষেত্রে মুনাফার পরিমাণ হল (M” -M)। এই মুনাফা আসতে পারে দু’ভাবে:

iii) বাণিজ্য মূলধন শিল্পজাত দ্রব্য কেনার সময় শিল্প মূলধনকে কম মূল্য দিতে পারে।

iv) বাণিজ্য মূলধন স্বল্পোন্নত দেশে শিল্পজাত দ্রব্য বিক্রির সময় বেশি মূল্য নিতে পারে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, বাণিজ্য মূলধনের মুনাফার মোট উৎস হল দুটি (১) উন্নত দেশের উৎপাদনশীল মূলধনের উদ্বৃত্ত মূল্য এবং (ii) স্বল্পোন্নত দেশের অ-ধনতান্ত্রিক উৎপাদকদের উদ্বৃত্ত মূল্য।

Kay বলেছেন যে, ব্রিটেনে যখন শিল্প মূলধনের বিকাশ ঘটল, তখন বাণিজ্য মূলধনেরও রূপান্তর ঘটল। স্বদেশে আর বাণিজ্য মূলধনের আধিপত্য রইল না। দেশের উৎপাদকদের নিকট কাঁচামাল বিক্রির সময় বেশি দাম নিয়ে অথবা তাদের কাছ থেকে শিল্পজাত দ্রব্য কেনার সময় কম দাম দিয়ে তারা যে উদ্বৃত্ত মূল্য আত্মসাৎ করত, তা করার ক্ষমতা কমে গেল। ফলে এই দেশীয় সূত্র থেকে বাণিজ্যের মুনাফার হার হ্রাস পেল। তখন বাণিজ্য মূলধন বিদেশের সূত্র থেকে অর্থাৎ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে বেশি উদ্বৃত্ত আহরণের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ল। কিন্তু এখন শিল্প মূলধনের আধিপত্য বেশি। ফলে বাণিজ্য মূলধনের ঐ মুনাফায় শিল্প মূলধনও ভাগ বসাতে লাগল। তখন বাণিজ্য মূলধন আরও বেশি অসম বিনিময় হারের দ্বারা মুনাফার হার বাড়াতে সচেষ্ট হল। কিন্তু বাণিজ্য মূলধনের এভাবে শোষণের হার বাড়িয়ে মুনাফা বাড়ানোর ক্ষমতা বা সম্ভাবনা কিছুটা সীমিত। শিল্প মূলধন উৎপাদন কৌশলের পরিবর্তন বা উন্নতি ঘটিয়ে এরূপ শোষণের হার বাড়াতে পারে। কিন্তু বাণিজ্য মূলধনের সে ক্ষমতা নেই। এই মূলধন শুধু পণ্য বিনিময়ের কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত; পণ্য উৎপাদন বা মূল্য-সৃষ্টির সঙ্গে যুক্ত নয়। জ্ঞ্যা-এর মতে, এভাবে বিংশ শতাব্দীর শুরু পর্যন্ত বাণিজ্য মূলধন বিশ্বের বিভিন্ন অংশে সংকটের সম্মুখীন হল।

জঙ্খা বলেছেন যে, উন্নত দেশগুলিতে যখন শিল্প মূলধনের ক্ষমতা বাড়ল এবং শিল্প মূলধন যখন বাণিজ্য মূলধনের উপর আধিপত্য বিস্তার করল, তখন বাণিজ্য মূলধন কিন্তু অবলুপ্ত হল না। বাণিজ্য মূলধন বিশ্ব অর্থনীতিতে তার পুরোনো দু'রকম আকারেই রয়ে গেল (i) বাণিজ্য মূলধন আগের মতোই তার নিজের ব্যবসা চালিয়ে যেতে লাগল এবং (ii) শিল্প মূলধনের প্রতিনিধি হিসাবেও কাজ করত। একদিকে ইহা নিজের জন্য মুনাফা অর্জনের চেষ্টা করত এবং অপরপক্ষে ইহা শিল্প মূলধনের জন্যও মুনাফা অর্জন করত। যতদিন পর্যন্ত অনুন্নত দেশে শোষণের হার বাড়িয়ে বাণিজ্য মূলধনের মুনাফা বাড়ানো গিয়েছিল, ততদিন পর্যন্ত বাণিজ্য মূলধনের এই দুরকম কাজের মধ্যে বিরোধ বড় হয়ে দেখা দেয়নি। কিন্তু যখন শোষণের মাত্রা বা হার নানা কারণে কমে গেল, বাণিজ্য মূলধন তখনই একটা সংকটের সম্মুখীন হল। মুনাফা কমে যাওয়ায় বাণিজ্য মূলধন তার বাণিজ্যের ক্ষেত্রে যে স্বাধীনতা এবং একাধিপত্য ভোগ করত তা হারালো। বাণিজ্য মূলধন তখন শিল্প মূলধনের শুধুমাত্র প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করতে বাধ্য হল।

জঙ্খা উল্লেখ করেছেন যে, অষ্টাদশ এবং ঊনবিংশ শতাব্দীতে পশ্চিমী দেশগুলোতে বাণিজ্য মূলধন শিল্প মূলধনের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। কিন্তু স্বল্পোন্নত দেশে সেই পরিবর্তন ঘটেনি। জঙ্খা এর পিছনে দুটি কারণ উল্লেখ করেছেন। প্রথমত, স্বল্পোন্নত দেশের যে প্রচলিত অর্থনৈতিক কাঠামো তাকে বাণিজ্য মূলধন ধ্বংস করেছিল। এসমস্ত দেশে বাণিজ্য মূলধনের স্থানীয় ভিত্তি বা শিকড় ছিল না। বাণিজ্য মূলধন এসেছিল উন্নত দেশ থেকে। স্বল্পোন্নত দেশগুলি ছিল উপনিবেশ, তারা উপনিবেশকারী (colonisers) নয়। জঙ্খা মনে করেন যে, এর ফলে বাণিজ্য মূলধনের কার্যাবলির প্রসারের বিবিধ সুফলের প্রায় কিছুই স্বল্পোন্নত দেশগুলি পায়নি। দ্বিতীয়ত, উনবিংশ শতাব্দীর আগে বাণিজ্য মূলধন স্বাধীনভাবে কাজ করত। কিন্তু উন্নত দেশগুলিতে শিল্প বিপ্লবের পর বাণিজ্য মূলধন শিল্প মূলধনের প্রতিনিধিতে পরিণত হয়। স্বল্পোন্নত দেশগুলিতে বাণিজ্য মূলধনের দুটি রূপই বজায় ছিল স্বাধীন রূপ ও নির্ভরশীল রূপ। তবে দুটি রূপই বজায় থাকলেও বাণিজ্য মূলধন আর তেমন স্বাধীনভাবে নিজের তত্ত্বাবধানে স্বল্পোন্নত দেশে বাণিজ্য করতে পারল না। সেখানেও তাকে শিল্প মূলধনের প্রতিনিধি হিসাবেই মূলত কাজ করতে হত। জঙ্খা মনে করেন যে, ঊনবিংশ শতাব্দীতে এরূপ পরিস্থিতির উদ্ভব থেকেই উপনিবেশগুলিতে অনুন্নতির শুরু।

Kay-এর মতে, শিল্প মূলধনের প্রতিনিধি হিসাবে বাণিজ্য মূলধন শিল্প মূলধনের তিন ধরনের স্বার্থরক্ষার কাজ করত। প্রথমত, স্বল্পোন্নত দেশগুলির শিল্প মূলধনের প্রয়োজনীয় কাঁচামালের সুলভ উৎস হয়ে দাঁড়াল। দ্বিতীয়ত, এই দেশগুলি সস্তায় খাদ্যদ্রব্যও সরবরাহ করত। তৃতীয়ত, অনুন্নত দেশগুলি শিল্প মূলধনের দ্বারা উৎপন্ন দ্রব্যের বিস্তীর্ণ বাজারও দিতে পেরেছিল।

এধরনের কাজকর্মের ক্ষেত্রে বাণিজ্য মূলধনের অভিজ্ঞতা দীর্ঘদিনের। শিল্প মূলধনের প্রতিনিধি হিসাবে এসকল কাজকর্মের ক্ষেত্রে বাণিজ্য মূলধনের কিছু বাড়তি সুবিধা ছিল। প্রথমত, শিল্প মূলধনের প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করার ক্ষেত্রে তার কিছু সুবিধা ছিল। দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা সে কাজে লাগাতে পেরেছিল। দ্বিতীয়ত, শিল্প মূলধনের প্রয়োজনমত স্বল্পোন্নত দেশের উৎপাদন ব্যবস্থাকে বাণিজ্য মূলধন পুনর্গঠিত করে নিয়েছিল। তৃতীয়ত, উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে বাণিজ্য মূলধন স্বল্পোন্নত দেশে নানা সামাজিক বিশৃঙ্খলা ঘটিয়েছিল। অনেক ক্ষেত্রেই এই বিশৃঙ্খলা নিজের স্বার্থে এবং শিল্প মূলধনের স্বার্থে ঘটানো

হয়েছিল। এ সমস্ত কারণে শিল্প মূলধন আর উন্নত দেশ থেকে স্বল্পোন্নত দেশে আসার তাগিদ অনুভব করেনি। সরাসরি এসে বিনিয়োগ করার যাবতীয় সুবিধা সে তার প্রতিনিধি বাণিজ্য মূলধন মারফত পেয়ে গেছে। এ সবের ফলে বাণিজ্য মূলধনের আধিপত্য স্বল্পোন্নত দেশে দীর্ঘদিন বজায় ছিল। কিন্তু উন্নত দেশে শিল্প মূলধন বাণিজ্য মূলধনের উপর জয়লাভ করেছিল। Kay-এর মতে, স্বল্পোন্নত দেশের পক্ষে এটা ছিল দু'দিক থেকে ক্ষতিকর। একদিকে বাণিজ্য মূলধন স্বল্পোন্নত দেশে তার নিজের ক্ষমতা অনুযায়ী অর্থনৈতিক উন্নয়নে বাধা দিয়েছিল। অপরপক্ষে, ইহা স্বল্পোন্নত দেশের উৎপাদন কাঠামোকে ভেঙে এমনভাবে পুনর্গঠন করেছিল যাতে শিল্প মূলধনের স্বার্থ রক্ষিত হয়। এর ফলেই স্বল্পোন্নত দেশে শিল্পায়ন ঘটেনি-দেশগুলি অনুন্নত রয়ে গেছে।

Kay-এর তত্ত্বের বিরুদ্ধে কয়েকটি সমালোচনা করা যায়।

প্রথমত, যানবাহন ও যোগাযোগের ভূমিকাকে জ্ঞথা অবহেলা করেছেন। এগুলো ছাড়া বাণিজ্য মূলধন স্বল্পোন্নত দেশে প্রবেশ করতে পারত না।

দ্বিতীয়ত, অনেক স্বল্পোন্নত দেশে বাণিজ্য মূলধন কিছু কৃষিজাত রপ্তানি দ্রব্যের উৎপাদন শুরু করেছিল, যেমন, চা, রবার, কফি প্রভৃতি। এক্ষেত্রে বাণিজ্য মূলধন নিজেই শিল্প মূলধন হিসাবে কাজ করেছে। অবশ্য অধ্যাপিকা Myint দেখিয়েছেন যে, কৃষিজাত রপ্তানি দ্রব্যের প্রসার স্বল্পোন্নত দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সাহায্য করতে পারেনি।

তৃতীয়ত, অর্থনৈতিক উন্নয়নে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের ভূমিকাকেও Kay-এর তত্ত্বে অবহেলা করা হয়েছে। কিন্তু ইতিহাসে আদি উপনিবেশ স্থাপনকারী দেশ হল পোর্তুগাল এবং স্পেন। কিন্তু বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের অভাবে এই দেশগুলো তাদের উপনিবেশ থেকে সংগৃহীত বিপুল সম্পদ তখন ঠিকমতো ব্যবহার করতে পারেনি। তাই ব্রিটেনের আগে তাদের শিল্প বিপ্লব ঘটেনি। অন্যদিকে, ব্রিটেন তার উপনিবেশ থেকে পাওয়া সম্পদকে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের মাধ্যমে উপযুক্তভাবে ব্যবহার করতে পেরেছিল। তাই বিশ্বের প্রথম শিল্প বিপ্লব ব্রিটেনেই সংঘটিত হয়।

চতুর্থত, Kay তার আলোচনা এমন সময় থেকে শুরু করেছেন যখন উন্নত দেশে বাণিজ্য মূলধনের উদ্ভব ঘটেছে এবং তা ইতিমধ্যেই স্বল্পোন্নত দেশে প্রবেশ করেছে। সুতরাং উন্নত ও স্বল্পোন্নত দেশের মধ্যে তখনই একটা ব্যবধান ছিল। Kay-এর তত্ত্বে এই প্রাথমিক ব্যবধানের উৎসকে ব্যাখ্যা করা হয়নি। পরবর্তীকালের উন্নত ও অনুন্নত দেশের উন্নতির স্তরের যে ব্যবধান বা পার্থক্য ক্রমাগত বেড়েছে, Kay-এর তত্ত্ব সেই বর্ধমান ব্যবধানকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছে মাত্র।

এসব সমালোচনা সত্ত্বেও একথা অনস্বীকার্য যে, বাস্তবের পরিসংখ্যান থেকে জ্ঞথা-এর তত্ত্বের সমর্থন মেলে। উদাহরণস্বরূপ, ঔপনিবেশিক যুগে ভারত থেকে ব্রিটেনে একতরফাভাবে সম্পদের নিঃসরণ ঘটেছিল। ব্রিটেন তার রাজনৈতিক ক্ষমতা কাজে লাগিয়ে ভারতের শিল্পকাঠামোকে ধ্বংস করেছিল। ভারতে দীর্ঘদিন ধরে শিল্প অপনয়ন (de-industrialisation) প্রক্রিয়া চলেছিল। তাই ভারতের সম্পদ তার নিজের শিল্পোন্নয়নে ব্যবহার করা যায়নি। ঔপনিবেশিক যুগ আর নেই। কিন্তু বর্তমানে উন্নত দেশের বহুজাতিক কর্পোরেশনগুলি

রয়াল্টি, মুনাফা, কৃৎকৌশল হস্তান্তর ইত্যাদির নামে স্বল্পোন্নত দেশগুলিকে নানাভাবে শোষণ করছে এবং নিজেদের দেশে প্রচুর সম্পদ নিয়ে যাচ্ছে। এভাবে বহুজাতিক কর্পোরেশনের মাধ্যমে এক নয়া-উপনিবেশবাদ (neo-colonialism) বা নয়া-সাম্রাজ্যবাদ (neo-imperialism) চালু হয়েছে বলে অনেকে মনে করেন। অর্থনৈতিক শোষণের দিক থেকে দেখতে গেলে পূর্বের রাজনৈতিক উপনিবেশবাদের সঙ্গে আজকের নয়া-উপনিবেশবাদ বা নয়া-সাম্রাজ্যবাদের কোনো পার্থক্য নেই বলে তাঁরা মনে করেন। এই সমস্ত ঔপনিবেশিক শোষণের জন্যই স্বল্পোন্নত দেশগুলি তাদের উন্নয়ন প্রচেষ্টায় তেমন সাফল্য লাভ করছে না। তবুও বলতেই হয় যে, বাণিজ্য মূলধনের মাধ্যমে ঔপনিবেশিক শোষণের দ্বারা অনুন্নতির ব্যাখ্যা আংশিক মাত্র এবং অবশ্যই একপেশে। ইহা অনুন্নতির একমাত্র কারণ নয়। অনুন্নতির পিছনে আরও অনেক কারণ আছে।

৩.৬ অসম বিনিময় তত্ত্ব (Theory of Unequal Exchange)

৩.৬.১ নির্ভরশীলতা তত্ত্বের কয়েকজন প্রবক্তা অর্থনৈতিক অনুন্নতিকে অসম বিনিয়োগের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। এই শ্রেণির লেখকদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলেন Arghini Emmanuel তাঁর মতে, উন্নত ও অনুন্নত দেশের মধ্যে বাণিজ্যের সময় অসম বিনিময় ঘটে। তিনি এই অসম বিনিময়কেই উন্নয়নের পার্থক্যের (unevenness of development) জন্য প্রাথমিকভাবে দায়ী বলে মনে করেন। তিনি অবশ্য স্বীকার করেছেন যে, অসম বিনিময় অনুন্নতির 'সম্পূর্ণ' ব্যাখ্যা নয়, তবে তাঁর দাবি যে, এটাই 'প্রাথমিক স্থানান্তর প্রক্রিয়া' (elementary transfer mechanism) যার দ্বারা অনুন্নত দেশ থেকে উন্নত দেশে সম্পদের স্থানান্তর ঘটেছে।

নির্ভরশীলতা তত্ত্বের প্রবক্তারা অসম বিনিময়ের বিভিন্ন সংজ্ঞা দিয়েছেন। কোনো কোনো অর্থনীতিবিদ অসম বিনিময় বলতে স্বল্পোন্নত দেশের প্রতিকূল বাণিজ্য হার বা বাণিজ্য হারের অবনতিকে বুঝিয়েছেন। Emmanuel অবশ্য অসম বিনিময়কে Prebisch-Singer ধরনের বাণিজ্য হারের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করেননি অথবা Kay-এর বাণিজ্য মূলধনের ধারণার দ্বারাও ব্যাখ্যা করেননি। একচেটিয়া কর্তৃত্ব কিংবা লুণ্ঠন ও প্রতারণার উপরও তাঁর তত্ত্বকে তিনি প্রতিষ্ঠিত করেননি। বরং তিনি অসম বিনিময়কে ব্যাখ্যা করার জন্য মার্ক্সের মূল্যের শ্রম তত্ত্বকে (Labour Theory of Value) ব্যবহার করেছেন। পূর্ণাঙ্গ প্রতিযোগিতামূলক কাঠামোয় মার্ক্সের শ্রম তত্ত্বের পরিবর্ধন ঘটিয়ে তার উপর Emmanuel তাঁর অসম বিনিময়ের তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। Auto Bauer এবং পরে Henric Grossman বহু আগেই এরূপ ধারণা দিয়ে গেছেন। তাকেই উন্নততর ও মার্জিত রূপ দান করেন Emmanuel

Emmanuel-এর মতে, উন্নত এবং অনুন্নত দেশের মধ্যে উৎপাদন কৌশল ও মজুরিতে পার্থক্য দরুন তাদের মধ্যে বাণিজ্যে অসম বিনিময় ঘটে থাকে। স্বল্পোন্নত দেশে মজুরি কম। ফলে দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন ব্যয় তথা দাম সেখানে কম। অন্যদিকে, উন্নত দেশে মজুরির হার বেশি। ফলে দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন ব্যয় এবং তাদের দাম বেশি। এভাবে, উন্নত দেশের দ্রব্যসামগ্রীর তুলনায় স্বল্পোন্নত দেশের দ্রব্যসামগ্রী সস্তা হওয়ায় এই দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য হলে সেই বাণিজ্যে অসম বিনিময় ঘটে। উন্নত দেশ থেকে নির্দিষ্ট

পরিমাণ আমদানি দ্রব্য পেতে স্বল্পোন্নত দেশকে বেশি পরিমাণ দ্রব্য রপ্তানি করতে হয়।

Emmanuel-এর তত্ত্বের মূল বক্তব্য হল যে, এই অসম বিনিময়ের দ্বারা স্বল্পোন্ন দেশগুলি উন্নত দেশ দ্বারা শোষিত হয়। স্বল্পোন্নত দেশগুলি তাদের দ্রব্যসামগ্রী মূল্যের (value) কম দামে বিক্রি করে এবং উন্নত দেশ থেকে দ্রব্যসামগ্রী মূল্যের বেশি দামে ক্রয় করে। এই তত্ত্বের আর একটি সিদ্ধান্ত হল যে, স্বল্পোন্নত দেশের জনগণকে শোষণের দ্বারা উন্নত দেশের শ্রমিকেরা লাভবান হয়। এই শোষণের ফলেই অনুন্নত দেশটি অনুন্নত থেকে যায়, আর উন্নত দেশটি আরও উন্নত হতে থাকে। Emmanuel এভাবেই বিভিন্ন দেশের মধ্যে উন্নয়নের অসমতাকে ব্যাখ্যা করেছেন। অবশ্য অনেক অর্থনীতিবিদ এই তত্ত্বের প্রযোজ্যতা (applicability) সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। মার্ক্স তাঁর শোষণের তত্ত্ব আলোচনা করেছেন একটি দেশের সীমার মধ্যে। সেখানে বিভিন্ন শিল্পে মূল্য ও মুনাফার হার সম্পর্কে আলোচনা করে মার্ক্স দেখিয়েছেন কীভাবে শোষণের উদ্ভব হয় এবং কীভাবে এক শ্রেণি আর এক শ্রেণিকে শোষণ করে। মার্ক্সের এই তত্ত্ব যা একটি দেশের বিভিন্ন শিল্প এবং বিভিন্ন শ্রেণির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, তা আন্তঃদেশীয় মডেলে প্রযোজ্য হবে কিনা সে সম্পর্কে অনেক অর্থনীতিবিদ সন্দেহ প্রকাশ করেছেন।

অধ্যাপক Amin ও অসম বিনিময়ের একটি ধারণা দিয়েছেন। তাঁর দেওয়া ধারণাটি Emmanuel-এর ধারণার খুবই কাছাকাছি (akin)। Amin-এর মতে, কেন্দ্র ও প্রান্তের (centre and periphery) দেশগুলির মধ্যে অসম বিনিময়ের কারণ হল তাদের মজুরিতে পার্থক্য। কেন্দ্রের দেশগুলিতে শ্রমিকের উৎপাদনশীলতা বেশি বলে মজুরি বেশি। তেমনি, প্রান্তের দেশগুলিতে শ্রমিকের কম উৎপাদনশীলতার দরুন মজুরি কম। এখন, প্রান্তের দেশগুলিতে অর্থাৎ স্বল্পোন্নত দেশগুলিতে মজুরি কম হওয়ার দরুন উদ্বৃত্ত মূল্যের হার বেশি। কেন্দ্রস্থিত দেশগুলির পুঁজিপতিদের প্রান্তের দেশগুলির রপ্তানির ক্ষেত্রে আধিপত্য বেশি। এই রপ্তানি ক্ষেত্রে উদ্বৃত্ত মূল্যের হার বেশি হওয়ায় তারা এখানে উৎপাদন ও রপ্তানি করতে আগ্রহী হয়। এভাবে তারা স্বল্পোন্নত দেশের উদ্বৃত্ত মূল্য আত্মসাৎ করে। ঐ উদ্বৃত্ত মূল্য অনুন্নত দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য পাওয়া যায় না। অনুন্নত দেশটি অনুন্নতই থেকে যায়।

অনেকে যুক্তি দিয়েছেন যে, নির্ভরশীলতার অসম উন্নয়ন তত্ত্ব আসলে প্রেবিশ-সিঙ্গার তত্ত্বেরই একটি রূপ। তাঁরা এই দুই তত্ত্বকে প্রায় একই তত্ত্ব (similar) বলে মনে করেন। মোটামুটিভাবে, অসম উন্নয়ন তত্ত্বে বলা হয় যে, কেন্দ্রের উন্নত দেশগুলি প্রান্তের দেশগুলিকে শোষণ করে। তারা অনুন্নত দেশগুলিকে প্রাথমিক দ্রব্য রপ্তানি করতে বাধ্য করে। আয় এবং দাম উভয়েরই সাপেক্ষে এসমস্ত দ্রব্যের চাহিদা অস্থিতিস্থাপক। ফলে স্বল্পোন্নত দেশগুলির রপ্তানি আয় বাড়ে না। বরং প্রাথমিক দ্রব্যের দামের স্বল্পকালীন ওঠানামায় তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এর ফলে তাদের লেনদেন ব্যালান্সেও সমস্যা দেখা দেয়। এছাড়া, অসম বিনিময় তত্ত্বের আর একটি যুক্তি হল যে, স্বল্পোন্নত দেশের বাণিজ্য হারে অবনতি (deterioration) ঘটে। কেন্দ্রের উন্নত দেশগুলিতে উপাদানের উৎপাদনশীলতা যে হারে বাড়ে, উপাদানের দাম তার চেয়ে বেশি হারে বাড়ে। কিন্তু প্রান্তের স্বল্পোন্নত দেশগুলিতে উপাদান আয় উৎপাদনশীলতা অপেক্ষা কম হারে বাড়ে। এর প্রধান কারণ হল উৎপন্ন এবং উপাদানের বাজারে কেন্দ্রের দেশগুলির একচেটিয়া অবস্থান। এর ফলেই উন্নত দেশগুলি তাদের উপাদানের ক্রমবর্ধমান আয় বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু প্রান্তের দেশগুলিতে তা ঘটে না। সেখানে

উৎপাদনশীলতা বাড়লে দ্রব্যসামগ্রীর দাম কমে যায়। এজন্য বাণিজ্য হার প্রান্তের দেশগুলির প্রতিকূলে চলে যায়। এ সমস্ত ধারণাই Prebisch-Singer-এর প্রতিকূল বাণিজ্য হারের তত্ত্বের খুবই কাছাকাছি। Raol Prebisch তাঁর Centre-Periphery তত্ত্বেও অনুরূপ কথা বলে গেছেন। অবশ্য তিনি তাঁর তত্ত্বে মার্ক্সের শোষণ তত্ত্বের উল্লেখ করেননি। যদিও তাঁর তত্ত্বের মূল বক্তব্য পরবর্তীকালের অনুন্নতির মার্ক্সীয় ব্যাখ্যার খুবই কাছাকাছি। সেজন্য অনুন্নতির ব্যাখ্যা হিসাবে অসম বিনিময় তত্ত্বকে অনেকে আলাদা কোনো তত্ত্ব বা অনুন্নতির নতুনতর কোনো ব্যাখ্যা বলে মানতে রাজি নন।

৩.৭ অনুন্নতির নয়া-মার্ক্সীয় ব্যাখ্যা: সংক্ষিপ্তসার (Neo-Marxian Approach to Underdevelopment, A Summary)

রিকার্ডোর মডেলে কোনো দেশের প্রসার বা অনুন্নতি সেই দেশের শ্রেণি কাঠামো এবং উদ্বৃত্তের সংগ্রহ ও ব্যবহারের পদ্ধতির উপর নির্ভরশীল। সেখানে একটি বদ্ধ অর্থনীতির কথা ভাবা হয়েছে।

মার্ক্সীয় তত্ত্ব অনুন্নতির কারণ অনুসন্ধান করতে মুক্ত অর্থনীতির প্রেক্ষাপট বিবেচনা করেছে। এই তত্ত্বের মতে, অনুন্নত দেশে অনুন্নতির কারণ হল উন্নত দেশ কর্তৃক বৈদেশিক বাণিজ্যের মাধ্যমে অনুন্নত দেশের শোষণ। আরও নির্দিষ্ট করে বলতে গেলে, উন্নত দেশ কর্তৃক ঔপনিবেশিক শোষণ। এই মতবাদ ক্ল্যাসিকাল উন্নয়ন তত্ত্বের বিরোধী। ক্ল্যাসিকাল তত্ত্বে বৈদেশিক বাণিজ্যকে উন্নয়নের ইঞ্জিন বলে ঘোষণা করা হয়েছে। Adam Smith অবাধ বাণিজ্যকে সমর্থন করেছেন কারণ এতে বাজার প্রসারিত হবে এবং আন্তর্জাতিক শ্রমবিভাগ সম্ভবপর হবে। এর পূর্বে বাণিজ্যবাদীরা (Mercantilists) সংরক্ষণমূলক বাণিজ্যের (protective trade) পক্ষে প্রচার করেছিলেন। পরবর্তীকালে Keynes এই ধারণাকে সমর্থন করেছেন এই যুক্তিতে যে, এর ফলে ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিতে বিনিয়োগ প্রবণতা বাড়বে। ফলে কার্যকরী চাহিদা বাড়বে এবং অনিচ্ছাকৃত বেকারি কমবে। কিন্তু মার্ক্সীয় তত্ত্ব এ সকল ধারণার বিরোধী। অনুন্নতির নয়া-মার্ক্সীয় তত্ত্বের উল্লেখযোগ্য প্রবক্তারা হলেন Geoffrey Kay, Paul Baran, Gunder Frank, Arghini Emmanuel প্রমুখ।

মার্ক্সের মতে, ধনতন্ত্রের উদ্ভবের সাথে সাথে উপনিবেশবাদের জন্ম হয়। এর দুটি স্তর বাণিজ্যিক

ধনতন্ত্র (merchant or commercial capitalism) এবং শিল্প ধনতন্ত্র (industrial capitalism)। ব্যবসায়ীদের মুখ্য উদ্দেশ্য হল ক্রমাগত বেশি সম্পদ আহরণ করা। এই উদ্দেশ্য পূরণে তারা বৈদেশিক বাণিজ্য হারকে (terms of trade) নিজেদের অনুকূলে রাখে অর্থাৎ সস্তায় জিনিস কেনে ও বেশি দামে বিক্রি করে। যখন একটি কৃষি-অর্থনীতি উপনিবেশে পরিণত হয়, তখন সেই দেশটি তার প্রভু-দেশকে দুভাবে সেবা করে সস্তায় কাঁচামাল ও খাদ্যদ্রব্য জোগান দিয়ে এবং শিল্পজাত দ্রব্যের জন্য বিস্তীর্ণ বাজারের জোগান দিয়ে। এভাবে বৈদেশিক বাণিজ্য উপনিবেশের উদ্বৃত্ত নিঃসরণে drain-এর কাজ করে-Robertson কথিত Engine of Growth এর ভূমিকা নয়। ঔপনিবেশিক শোষণ এভাবে উপনিবেশে অনুন্নতির সৃষ্টি করে।

Marx-কে অনুসরণ করে Kay বলেছেন, বাণিজ্যিক পুঁজি কোনো মূল্য সৃষ্টি করে না। ফলত, কোনো

উদ্বৃত্ত মূল্যও (surplus value) সৃষ্টি করে না। এই মূলধন কৃৎকৌশলে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটিয়ে মুনাফা অর্জন করে না, মুনাফা অর্জন করে শুধুমাত্র বাজারকে নিয়ন্ত্রিত করে। নানারকমের একচেটিয়া প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে ও একচেটিয়া সুবিধা ভোগের জন্য নানা সরকারি সাহায্য নিয়ে এরা বাজারকে নিয়ন্ত্রিত করে মুনাফা অর্জন করে।

Kay-এর মতে, উন্নত দেশের বাণিজ্য মূলধন অনুন্নত দেশে অ-পুঁজিবাদী উৎপাদকের কাছ হতে কাঁচামাল কেনে এবং তা উন্নত দেশে বিক্রি করে। উন্নত দেশে এগুলোর দ্বারা শিল্পজাত পণ্য তৈরি হয়। এই শিল্পজাত পণ্যের একটি অংশ আবার বাণিজ্য মূলধন কেনে এবং অনুন্নত দেশে বিক্রি করে। সুতরাং বাণিজ্য মূলধন মোট চারটি বিনিময়ের কাজ করে দুটি কেনার এবং দুটি বেচার। এক্ষেত্রে বাণিজ্য মূলধনের আবর্তনের রূপটি হল M-C-M’-C’-M”. প্রথম ভাগের মুনাফা (M’ -M) আসতে পারে দুটি উৎস হতে (১) ব্যবসায়ীরা অনুন্নত দেশ থেকে কাঁচামাল তাদের ‘মূল্য’ (value) অপেক্ষা কম দামে কিনতে পারে। (২) ব্যবসায়ীরা ঐ কাঁচামাল উন্নত দেশের শিল্পপুঁজির কাছে মূল্যের বেশি দামে বিক্রি করতে পারে। প্রথম ক্ষেত্রে মুনাফাটি হল কাঁচামালের উৎপাদকের কাছ হতে সরাসরি বা প্রত্যক্ষভাবে উদ্বৃত্ত মূল্য অপহরণ করা। দ্বিতীয়টি হল, উৎপাদনী মূলধনের কাছ হতে উদ্বৃত্ত মূল্য পরোক্ষ ভাবে আত্মসাৎ করা। ঠিক একইভাবে, দ্বিতীয় পর্যায়ের বিনিময়ের (M’ – C’ – M”) মধ্যে মুনাফার (M” - M’) দুটি রূপ থাকবে। এভাবে বাণিজ্য মূলধন অনুন্নত দেশ হতে সম্পদ আহরণ করে। জ্ঞ্থা বলেছেন, ঔপনিবেশিক যুগে উন্নত দেশ থেকে আগত বাণিজ্য মূলধনের এই ভূমিকাই উপনিবেশগুলোর অনুন্নতির জন্য দায়ী।

Kay-এর মতে, ব্রিটেনে যখন শিল্প মূলধনের আধিপত্য বাণিজ্যিক মূলধন অপেক্ষা বেড়ে গেল, তখন এই বাণিজ্যিক মূলধন উপনিবেশগুলিতে শিল্প বা উৎপাদনী মূলধনের প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করতে লাগল। এরা সস্তায় কাঁচামাল ও খাদ্যদ্রব্য উপনিবেশ থেকে কিনতে লাগল এবং সেখানে শিল্পজাত দ্রব্য চড়া দামে বেচতে লাগল। শুধু তাই নয়, শিল্পজাত দ্রব্যের বাজার সুনিশ্চিত করতে এরা দেশীয় শিল্পগুলোকে নষ্ট করল। এভাবে লুণ্ঠন ও দস্যুতার দ্বারা উন্নত দেশে ধনতন্ত্রের বিকাশ ঘটল, আর উপনিবেশগুলো অনুন্নতই রয়ে গেল।

Paul Baran-ও অনুরূপ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন। তাঁর মতে, উন্নতি ও অনুন্নতি হল ধনতান্ত্রিক দেশের মূলধন গঠনের ফল। চ্শ্ব দ্ধ বলেছেন, অনুন্নতির কারণ হল উপনিবেশবাদ। এর ফলেই বিশ্বের এক অংশ উন্নত এবং অপর অংশ অনুন্নত। এছাড়া, Frank, Sahlin, Farinni, Emmanuel, Amin মনে করেন যে, অনুন্নতির কারণ হল বৈদেশিক বিনিয়োগ, বৈদেশিক সাহায্য এবং অসম বিনিময় হার। এগুলোই অনুন্নত দেশ হতে উদ্বৃত্ত নিষ্কাশনে সাহায্য করেছে এবং Metropolis Satellite সম্পর্ক বা Centre-Periphery (কেন্দ্র-প্রান্ত) সম্পর্ক তৈরি করেছে। এই সম্পর্ক (atellite বা Periphery থেকে সম্পদ আহরণ করেছে এবং একে অনুন্নত করে রেখেছে, এবং অন্যদিকে Centre বা Metropolis-কে সেই নিষ্কাশিত সম্পদের দ্বারা উন্নততর করেছে।

Emmanuel অনুন্নতিকে অসম বিনিময়ের হারের দ্বারা ব্যাখ্যা করেছেন। মার্ক্সের মূল্যের শ্রমতত্ত্বকে আরও প্রসারিত করে তিনি দেখিয়েছেন যে, অনুন্নত দেশগুলি তাদের দ্রব্যগুলো মূল্যের কমে বিক্রি করে,

আর উন্নত দেশ হতে দ্রব্য কেনার সময় তাদের মূল্যের বেশি দিতে হয়, অর্থাৎ অসম বিনিময় হারের দ্বারা তারা শোষিত হয়। তিনি আরও দেখিয়েছেন যে উন্নত দেশের শ্রমিকেরা অনুন্নত দেশের জনগণকে শোষণের দ্বারা লাভবান হয়।

এখন, অনুন্নতির এই নয়া-মার্ক্সীয় তত্ত্বের একটি সংক্ষিপ্ত মূল্যায়নের চেষ্টা করা যেতে পারে। নয়া-মার্ক্সীয় তত্ত্বে অনুন্নতিকে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে বিচার করা হয়েছে। Marx আশা করেছিলেন যে উপনিবেশগুলিতেও একদিন ধনতান্ত্রিক দেশের সংস্পর্শে আসার ফলে সেখানে ধনতন্ত্রের উন্মেষ ঘটবে, ধনতান্ত্রিক দেশটি উপনিবেশের প্রাক-ধনতান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতিকে ধ্বংস করবে এবং ধনতান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতি ও সংগঠন গড়ে তুলবে। কিন্তু ভারতের অভিজ্ঞতা তা বলে না। এখানে ঔপনিবেশিক শোষণ তার ধ্বংসাত্মক ভূমিকা ভালোভাবেই পালন করেছিল। উদাহরণস্বরূপ, সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শক্তি তার বাণিজ্য নীতির দ্বারা ভারতীয় শিল্পকে ধ্বংস করেছিল কিন্তু পাশাপাশি পুনর্নির্মাণের ভূমিকা (Regenerating role) পালন করেনি। সুতরাং এখানে মার্ক্সের ভবিষ্যদ্বাণী ফলেনি।

তাছাড়া Frank বলেছেন যে, অনুন্নতি ও উপনিবেশবাদ সর্বদাই একত্র বিরাজমান। কিন্তু ইতিহাসে বিপরীত চিত্রও পাওয়া যায়। মুঘল আমলে ভারত উপনিবেশ ছিল না, কিন্তু অনুন্নত ছিল। বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে চিনে ঔপনিবেশিক শোষণ তেমন ছিল না, কিন্তু চিন তখন ছিল অনুন্নত। তাছাড়া, Frank এবং Baran-এর তত্ত্বে কেন অনুন্নত দেশ হতে সম্পদ নিষ্কাশন করে নিয়ে যাওয়া হবে, কেন তা এখানেই পুনঃবিনিয়োজিত হবে না তার কোনো সদুত্তর পাওয়া যায় না। তাছাড়া মার্ক্সের শোষণতত্ত্ব দুটি শ্রেণির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, এটি দুটি দেশের মধ্যেও প্রযোজ্য হবে কিনা, সে সম্পর্কেও বিতর্কের অবকাশ আছে। সবশেষে, মার্ক্সীয় তত্ত্বে অনুন্নত দেশের কৃষিতে আধা সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন সম্পর্ক ও জনসংখ্যাবৃদ্ধির সমস্যা কীভাবে অনুন্নতি ঘটায়, সে সম্পর্কে কোনো আলোকপাত করা হয়নি।

উপসংহারে বলতে পারি যে, অনুন্নতির নয়া-মার্ক্সীয় তত্ত্ব নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে ব্যর্থ। নীতি নির্ধারণ (Policy making) করতে গেলে সেই দেশের বর্তমান কাঠামো ও উৎপাদন সম্পর্ক বিবেচনা করা প্রয়োজন-সেই দেশের ঐতিহাসিক বিবর্তন নয়। অনুন্নত দেশের কৃষিতে আধাসামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন সংগঠন ও জনসংখ্যাবৃদ্ধির সমস্যা এখানে উদ্বৃত্ত আহরণে বাধা দেয় এবং উদ্বৃত্তের অনুৎপাদনশীল ব্যবহার ঘটায়। অনুন্নতির নয়া-মার্ক্সীয় তত্ত্ব এই প্রধান বিষয়কে অবহেলা করার ফলে ভবিষ্যত নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে এই তত্ত্বের মূল্য খুবই কম। Ricardo-Lewis-জাতীয় মডেল এই কেন্দ্রীয় সমস্যার প্রতি আলোকপাত করে বলেই ভবিষ্যত নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে সেটির গুরুত্ব অপেক্ষাকৃত বেশি। তথাকথিত বুর্জোয়া তত্ত্ব এই পরিপ্রেক্ষিতে নয়া-মার্ক্সীয় তত্ত্ব অপেক্ষা উন্নততর বলে মনে হয়।

৩.৮ ওয়াশিংটন ঐক্যমত (Washington Consensus)

ওয়াশিংটন ঐক্যমত হল ১৯৮০ এবং ১৯৯০ এর দশকে বিবেচনা করা দশটি অর্থনৈতিক নীতির প্রেসক্রিপশনের একটি সেট যা ওয়াশিংটন, ডিসি-ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ),

বিশ্বব্যাংক দ্বারা সঙ্কট-বিপর্যস্ত উন্নয়নশীল দেশগুলির জন্য প্রচারিত ক্ষ্মমানকক্ষ্ম সংস্কার প্যাকেজ গঠন করে। এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ট্রেজারি বিভাগ। শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেছিলেন ১৯৮৯ সালে ইংরেজ অর্থনীতিবিদ জন উইলিয়ামসন। প্রেসক্রিপশনগুলি বাণিজ্য উদারীকরণ, বেসরকারীকরণ এবং আর্থিক উদারীকরণের মতো মুক্ত-বাজার প্রচার নীতিগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে। তারা রাজকোষ ঘাটতি কমিয়ে আনা এবং মুদ্রাস্ফীতি কমিয়ে আনার উদ্দেশ্যে রাজস্ব ও আর্থিক নীতি প্রণয়ন করে। উইলিয়ামসনের পরিভাষা ব্যবহারের পরবর্তীকালে, এবং তার জোরালো বিরোধিতা সত্ত্বেও, ওয়াশিংটন কনসেনসাস শব্দগুচ্ছটি একটি সেকেন্ড, বিস্তৃত অর্থে মোটামুটি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে, একটি দৃঢ়ভাবে বাজার-ভিত্তিক পদ্ধতির দিকে আরও সাধারণ অভিযোজন বোঝাতে (কখনও কখনও বর্ণনা করা হয় বাজার মৌলবাদ বা নব্য উদারনীতিবাদ)। দুটি বিকল্প সংজ্ঞার মধ্যে পার্থক্যের মাত্রার উপর জোর দিতে গিয়ে, উইলিয়ামসন যুক্তি দিয়েছেন যে তার দশটি মূল, সংকীর্ণভাবে সংজ্ঞায়িত প্রেসক্রিপশনগুলি মূলত ক্ষ্মমাতৃত্ব এবং আপেল পাইক্ষ্ম এর মর্যাদা অর্জন করেছে (অর্থাৎ, ব্যাপকভাবে মঞ্জুরি হিসাবে নেওয়া হয়), যেখানে পরবর্তী বৃহত্তর সংজ্ঞা, নব্য উদারনৈতিক ইশতেহারের একটি রূপকে প্রতিনিধিত্ব করে, ক্ষ্মকখনও ঐকমত্য উপভোগ করেনি গু ওয়াশিংটনগ্ন বা অন্য কোথাওক্ষ্ম এবং যুক্তিসঙ্গতভাবে মৃত বলা যেতে পারে।

ওয়াশিংটন ঐকমত্যের আলোচনা দীর্ঘদিন ধরে বিতর্কিত। আংশিকভাবে এটি শব্দটি দ্বারা কী বোঝানো হয় তার উপর চুক্তির অভাবকে প্রতিফলিত করে, তবে এর সাথে জড়িত পলিসি প্রেসক্রিপশনের যোগ্যতা এবং পরিণতির উপরও উল্লেখযোগ্য পার্থক্য রয়েছে। কিছু সমালোচক বৈশ্বিক বাজারে উন্নয়নশীল দেশগুলিকে উন্মুক্ত করার এবং একটি উদীয়মান বাজারে স্থানান্তরের উপর মূল ঐক্যমতের জোরের সাথে সমস্যাটি গ্রহণ করেন যা তারা অভ্যন্তরীণ বাজার শক্তির প্রভাবকে শক্তিশালী করার উপর অত্যধিক ফোকাস হিসাবে দেখেন, যুক্তিযুক্তভাবে শাসনের ব্যয়ে রাষ্ট্রের মূল কাজগুলিকে প্রভাবিত করে। অন্যান্য ভাষ্যকারদের জন্য, সমস্যাটি আরও বেশি অনুপস্থিত , যার মধ্যে রয়েছে প্রতিষ্ঠান-নির্মাণের মতো ক্ষেত্র এবং সমান সুযোগ, সামাজিক ন্যায়বিচার এবং দারিদ্র্য হ্রাসের*মাধ্যমে সমাজের দুর্বলতমদের জন্য সুযোগগুলি উন্নত করার লক্ষ্যযুক্ত প্রচেষ্টা।

৩.৮.১ ইতিহাস

ওয়াশিংটন ঐক্যমতের ধারণা এবং নামটি প্রথম উপস্থাপন করেছিলেন ১৯৮৯ সালে জন উইলিয়ামসন, ইন্সটিটিউট ফর ইন্টারন্যাশনাল ইকোনমিক্সের একজন অর্থনীতিবিদ, ওয়াশিংটন, ডিসি ভিত্তিক একটি আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক থিঙ্ক ট্যাঙ্ক উইলিয়ামসনের দ্বারা মূলত বলা ঐকমত্যের মধ্যে তুলনামূলকভাবে নির্দিষ্ট নীতি সুপারিশের দশটি বিস্তৃত সেট অন্তর্ভুক্ত ছিল:

১. জিডিপির তুলনায় বড় রাজস্ব ঘাটতি পরিহার সহ রাজস্ব নীতি শৃঙ্খলা;

২. প্রাথমিক শিক্ষা, প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা এবং অবকাঠামো বিনিয়োগের মতো মূল প্রো-গ্রোথ, দরিদ্র-সমর্থক পরিষেবাগুলির বিস্তৃত ভিত্তিক বিধানের দিকে ভর্তুকি ("বিশেষত নির্বিচার ভর্তুকি") থেকে জনসাধারণের ব্যয়ের পুনর্নির্দেশ;

৩. কর সংস্কার, করের ভিত্তি প্রসারিত করা এবং মাঝারি প্রান্তিক করের হার গ্রহণ করা;

৪. সুদের হার যা বাজার দ্বারা নির্ধারিত এবং ইতিবাচক (কিন্তু মাঝারি) বাস্তব শর্তে;

৫. প্রতিযোগিতামূলক বিনিময় হার;

৬. বাণিজ্য উদারীকরণ : পরিমাণগত সীমাবদ্ধতা (লাইসেন্সিং, ইত্যাদি) দূর করার উপর বিশেষ জোর দিয়ে আমদানির উদারীকরণ; কম এবং তুলনামূলকভাবে অভিন্ন শুল্ক দ্বারা সরবরাহ করা যেকোনো বাণিজ্য সুরক্ষা;

৭. অভ্যন্তরীণ প্রত্যক্ষ বিদেশী বিনিয়োগের উদারীকরণ;

৮. রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের বেসরকারীকরণ;

৯. নিয়ন্ত্রণমুক্তকরণ : নিরাপত্তা, পরিবেশগত এবং ভোক্তা সুরক্ষার ভিত্তিতে এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির বিচক্ষণ তদারকির জন্য ন্যায়সঙ্গত ব্যতীত বাজারে প্রবেশে বাধা দেয় বা প্রতিযোগিতা সীমাবদ্ধ করে এমন প্রবিধানগুলির বিলুপ্তি;

১০. সম্পত্তির অধিকারের জন্য আইনি নিরাপত্তা।

৩.৮.২ নীতি এজেন্ডার উত্স

যদিও ওয়াশিংটন ঐক্যমতের উইলিয়ামসনের লেবেলটি উপরোক্ত কর্মসূচি প্রচারে ওয়াশিংটন-ভিত্তিক সংস্থাগুলির ভূমিকার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, তবে অনেক লেখক জোর দিয়েছেন যে ল্যাটিন আমেরিকান নীতি-নির্ধারকরা তাদের নিজস্ব বিশ্লেষণের ভিত্তিতে নীতি সংস্কারের নিজস্ব প্যাকেজে পৌঁছেছেন। তাদের দেশের পরিস্থিতি। এইভাবে, দ্য কমান্ডিং হাইটস -এর লেখক*জোসেফ স্ট্যানিসলা এবং ড্যানিয়েল ইয়ারগিনের মতে, ওয়াশিংটন কনসেনসাসে বর্ণিত নীতির প্রেসক্রিপশনগুলি ''ল্যাটিন আমেরিকায়, ল্যাটিন আমেরিকানদের দ্বারা, অঞ্চলের ভিতরে এবং বাইরে যা ঘটছে তার প্রতিক্রিয়া হিসাবে তৈরি করা হয়েছিল।ক্ষ্ম জোসেফ স্টিগলিটজ লিখেছেন যে " ওয়াশিংটন কনসেনসাস নীতিগুলি ল্যাটিন আমেরিকার বাস্তব সমস্যাগুলির প্রতিক্রিয়া জানাতে ডিজাইন করা হয়েছিল এবং যথেষ্ট অর্থবহ ছিলক্ষ্ম (যদিও স্টিগলিটজ কখনও কখনও উন্নয়নশীল দেশগুলিতে প্রয়োগ করা আইএমএফ নীতিগুলির স্পষ্ট সমালোচক ছিলেন)। ওয়াশিংটন কনসেনসাস শব্দটি দ্বারা বোঝানো অর্থের পরিপ্রেক্ষিতে যে নীতিগুলি মূলত বাহ্যিক ছিল, স্ট্যানিসলা এবং ইয়ারগিন রিপোর্ট করেছেন যে এই শব্দটির স্রষ্টা, জন উইলিয়ামসন ''এর পর থেকে এই শব্দটি নিয়ে অনুশোচনা করেছেন", বলেছেন ''এটি করা কঠিন একটি কম কূটনৈতিক লেবেল চিন্তা করুন।"

উইলিয়ামসন ওয়াশিংটন কনসেনসাসে ক্ষ্মওয়াশিংটনক্ষ্ম ব্যবহার করার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন, কারণ এটি ভুলভাবে পরামর্শ দিয়েছিল যে উন্নয়ন নীতিগুলি ওয়াশিংটন থেকে উদ্ভূত হয়েছিল এবং বাহ্যিকভাবে অন্যদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। উইলিয়ামসন ২০০২ সালে বলেছিলেন, ''ওয়াশিংটন কনসেনসাস" শব্দবন্ধটি একটি ক্ষতিগ্রস্থ ব্র্যান্ডের নাম... সারা বিশ্বের শ্রোতারা বিশ্বাস করেন যে এটি ওয়াশিংটন-ভিত্তিক অসহায় দেশগুলির উপর চাপিয়ে দেওয়া নিওলিবারেল নীতিগুলির একটি সেটকে নির্দেশ করে। আন্তর্জাতিক

আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে এবং তাদের মুখে ফেনা ছাড়া এমন লোক আছে যারা এই শব্দটি উচ্চারণ করতে পারে না আমি ওয়াশিংটন কনসেনসাসে যে মৌলিক ধারণাগুলো তুলে ধরার চেষ্টা করেছি সেগুলো গত এক দশকে ব্যাপকভাবে গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করে চলেছে, যেখানে বেশিরভাগ অংশে নির্বাচনযোগ্য হওয়ার জন্য লুলাকে সমর্থন করতে হয়েছে তারা মাতৃত্ব এবং আপেল পাই, এই কারণেই তারা ঐক্যমতের আদেশ দিয়েছে।"

ন্যান্সি বার্ডসাল, অগাস্টো দে লা টোরে এবং ফেলিপ ভ্যালেন্সিয়া ক্যাসেডোর ২০১১ সালের একটি সমীক্ষা অনুসারে, মূল ঐকমত্যের নীতিগুলি মূলত লাতিন আমেরিকান রাজনীতিবিদ এবং টেকনোক্র্যাটদের একটি সৃষ্টি, যেখানে উইলিয়ামসনের ভূমিকা ছিল দশটি পয়েন্ট এক জায়গায় একত্রিত করা। প্রথমবার, নীতির প্যাকেজ ক্ষ্মতৈরিক্ষ্ম করার পরিবর্তে। হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটির ডেভিস সেন্টার ফর রাশিয়ান অ্যান্ড ইউরেশিয়ান স্টাডিজেরকেট জিওহেগান পেরুর নিওলিবারেল অর্থনীতিবিদ হার্নান্দো ডি সোটোকে ওয়াশিংটন ঐক্যমতকে অনুপ্রাণিত করার জন্য কৃতিত্ব দিয়েছেন। উইলিয়ামসন আংশিকভাবে প্রেসক্রিপশনের জন্য ডি সোটোকে নিজেই কৃতিত্ব দেন, বলেছিলেন যে তার কাজ ক্ষ্মল্যাটিন আমেরিকা প্রদানকারী বিশ্বব্যাপী বুদ্ধিবৃত্তিক প্রবণতার ফলাফলক্ষ্ম এবং বলে যে ডি সোটো সম্পত্তির অধিকারের আইনি সুরক্ষার সুপারিশের জন্য সরাসরি দায়ী।

ওয়াশিংটন কনসেনসাস ক্ষ্মনব্য উদারনীতিবাদক্ষ্ম শব্দটির সাথে বিনিময়যোগ্য নয়। উইলিয়ামসন স্বীকার করেছেন যে শব্দটি সাধারণত তার মূল প্রেসক্রিপশন থেকে ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে; তিনি একটি বিস্তৃত বাজার মৌলবাদ বা ক্ষ্মনব্য উদারনৈতিকক্ষ্ম কর্মসূচি (এজেন্ডা) কে প্রকাশ করার জন্য এই শব্দটির বিকল্প ব্যবহারের বিরোধিতা করেন, যা তার প্রাথমিক প্রণয়নের পরে সাধারণ হয়ে ওঠে।

৩.৯ স্ববহনক্ষম বা দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা সমূহ

স্ববহন উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (Sustainable Development Goals SDGs), এসডিজি বা বৈশ্বিক লক্ষ্যসমূহ হলো ১৭টি আন্তঃসংযুক্ত বৈশ্বিক লক্ষ্যের একটি সমষ্টি যা "সকলের জন্য একটি ভালো এবং আরও স্ববহন ও টেকসই ভবিষ্যৎ" অর্জনের পরিকল্পনা হিসাবে তৈরি করা হয়েছে। জাতিসংঘ (United Nation) এ লক্ষ্যগুলো প্রণয়ন করেছে তস্ববহন এবং টেকসই উন্নয়নের জন্য বৈশ্বিক লক্ষ্যমাত্রাদ হিসেবে লক্ষ্যগুলোকে আখ্যায়িত করেছে। এসব লক্ষ্য সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা -কে প্রতিস্থাপন করেছে, যা ২০১৫ সালের ৩১ শে ডিসেম্বর মেয়াদোত্তীর্ণ হয়েছিল। এসডিজি-এর মেয়াদ ২০১৬ থেকে ২০৩০ সাল। এতে মোট ১৭টি অভীষ্ট, ১৬৯টি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা এবং ১৩৩ টি নির্ধারক অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

সংক্ষেপে ১৭টি এসডিজি হলো: দারিদ্র্য বিলোপ (এসডিজি ১); ক্ষুধা মুক্তি (এসডিজি ২); সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ (এসডিজি ৩); মানসম্মত শিক্ষা (এসডিজি ৪); লিঙ্গ সমতা (এসডিজি ৫); নিরাপদ পানীয় জল, পয়ঃনিষ্কাশন (এসডিজি ৬); সাশ্রয়ী ও দূষণমুক্ত জ্বালানি (এসডিজি ৭); শোভন কাজ ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি (এসডিজি ৮); শিল্প, উদ্ভাবন ও অবকাঠামো (এসডিজি ৯); অসমতার হ্রাস (এসডিজি ১০); স্ববহন নগর

ও জনপদ (এসডিজি ১১); পরিমিত ভোগ ও উৎপাদন (এসডিজি ১২); জলবায়ু কার্যক্রম (এসডিজি ১৩); জলজ জীবন (এসডিজি ১৪); স্থলজ জীবন (এসডিজি ১৫); শান্তি, ন্যায়বিচার ও কার্যকর প্রতিষ্ঠান (এসডিজি ১৬); অভীষ্ট অর্জনে অংশীদারিত্ব (এসডিজি ১৭)

যদিও লক্ষমাত্রাগুলো বিস্তৃত এবং পরস্পর নির্ভরশীল, দুই বছর পরে (৬ জুলাই ২০১৭) সাধারণ পরিষদ কর্তৃক গৃহীত জাতিসংঘের একটি রেজোলিউশনের মাধ্যমে এসডিজিগুলিকে আরও ক্ষ্মকার্যকরীদ করা হয়। রেজোলিউশনে প্রতিটি লক্ষ্যমাত্রার অগ্রগতি পরিমাপ করতে বেশ কয়েকটি সূচকের সাথে প্রতিটি লক্ষ্যের জন্য নির্দিষ্ট অভিষ্ট চিহ্নিত করা হয়েছে। ২০২০ থেকে ২০৩০ সালের মধ্যে লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হবে। কয়েকটি লক্ষ্যমাত্রার জন্য কোনো নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করা হয়নি।

পর্যবেক্ষণের সুবিধার্থে, লক্ষ্যমাত্রাগুলোর অগ্রগতি অনুসরণ এবং দৃশ্যমান করার জন্য বিভিন্ন সরঞ্জাম রয়েছে। এই সকল সরঞ্জাম সকল তথ্য আরও উপলব্ধি করা এবং সহজে বোঝার অভিপ্রায়ে ব্যবহৃত হয়। উদাহরণস্বরূপ, ২০১৮ সালের জুনে চালু হওয়া অনলাইন প্রকাশনা এসডিজি ট্র্যাকার, সকল সূচকের উপলব্ধ তথ্য উপস্থাপন করে। এসডিজি লিঙ্গ সমতা, শিক্ষা এবং সংস্কৃতির মতো একাধিক ক্রস-কাটিং বিষয়গুলিতে গুরুত্ব আরোপ করে।। ২০২০ সালের ১৭টি এসডিজিতে কোভিড-১৯ মহামারীর গুরুতর প্রভাব ছিল। ২৫-২৭সেপ্টেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন শীর্ষ সম্মেলন এ বিভিন্ন দেশের সরকার প্রধানদের আলোচনার মধ্যমে এ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। সম্মেলনের বিষয়বস্তু ট্রান্সফর্মিং আওয়ার

৩.৯.১ স্ববহনক্ষম উন্নয়নের জন্য ২০৩০ এজেন্ডা

২০১৫-পরবর্তী উন্নয়ন এজেন্ডা নিয়ে আলোচনা জানুয়ারি ২০১৫-এ শুরু হয় এবং আগস্ট ২০১৫-এ শেষ হয়। আলোচনাটি উন্নয়নের জন্য অর্থায়নের বিষয়ে জাতিসংঘের আলোচনার সমান্তরালে চলে, যা ২০১৫-পরবর্তী উন্নয়ন এজেন্ডা বাস্তবায়নের আর্থিক উপায় নির্ধারণ করে; এই আলোচনার ফলে জুলাই ২০১৫-এ আদ্দিস আবাবা অ্যাকশন এজেন্ডা গৃহীত হয়। নিউইয়র্কে ২০১৫ সালের সেপ্টেম্বরে জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন শীর্ষ সম্মেলনে একটি চূড়ান্ত নথি গৃহীত হয়েছিল।

৩.৯.২ লক্ষ্য এবং সূচক

লক্ষ্যমাত্রা এবং সূচকযুক্তদীর্ঘস্থায়ী বিকাশের ২০৩০ এজেন্ডা সম্পর্কিত পরিসংখ্যান কমিশনের কাজ, জুলাই ২০১৭ (জাতিসংঘের রেজোলিউশন এ / আরইএস /৭১/৩১৩)

প্রতিটি লক্ষ্যে সাধারণত ৮-১২ লক্ষ্য থাকে এবং প্রতিটি লক্ষ্য লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছানোর দিকে অগ্রগতি পরিমাপ করতে ব্যবহৃত হয় ১ থেকে ৪ টি সূচক। লক্ষ্য গুলো হলো:ক্ষ্মফলাফলক্ষ্ম লক্ষ্য (পরিস্থিতি অর্জনের লক্ষ্য) বা ''বাস্তবায়নের মাধ্যম'' লক্ষ্যগুলি। এসডিজি কীভাবে অর্জন করা যায় সে সম্পর্কে কয়েকটি সদস্য রাষ্ট্রের উদ্বেগের সমাধানের জন্য এসডিজিদের সাথে আলোচনার প্রক্রিয়াতে শেষের লক্ষ্যগুলি প্রবর্তন করা হয়েছিল। লক্ষ্য ১৭ এসডিজি কীভাবে অর্জন করা হবে সে সম্পর্কে পুরোপুরি লক্ষ্যগুলির

সংখ্যা নির্ধারণের পদ্ধতিটি নিম্নরূপ: ''ফলাফলের লক্ষ্যমাত্রা'' ব্যবহার সংখ্যা, যেখানে ''প্রয়োগের লক্ষ্যমাত্রার উপায়'' ছোট হাতের অক্ষর ব্যবহার করে। উদাহরণস্বরূপ, এসডিজি ৬ এর মোট ৮ টি লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। প্রথম ছয়টি ফলাফলের লক্ষ্যমাত্রা এবং ৬.১ থেকে ৬.৬ পর্যন্ত লেবেলযুক্ত। চূড়ান্ত দুটি লক্ষ্যগুলি হ'ল ক্ষ্মবাস্তবায়ন লক্ষ্যমাত্রার মাধ্যমক্ষ্ম এবং লক্ষ্যগুলি ৬.এ এবং ৬.বি হিসাবে লেবেলযুক্ত। Global fossil fuel subsidies in 2018 were $400 billion. এটি পুনর্নবীকরণযোগ্যদের জন্য অনুমান ভর্তুকি দ্বিগুণ ছিল এবং বৈশ্বিক কার্বন ডাই অক্সাইড নিঃসরণ হ্রাস করার কাজে ক্ষতিকর।''

● **সূচক পর্যালোচনা**

পরিকল্পনা অনুযায়ী, ২০২০ সালে জাতিসংঘের পরিসংখ্যান কমিশনের ৫১তম অধিবেশনে সূচক কাঠামোটি ব্যাপকভাবে পর্যালোচনা করা হয়েছিল। ২০২৫ সালে এটি নিয়ে আবার পর্যালোচনা করা হবে। পরিসংখ্যান কমিশনের ৫১তম অধিবেশনে (৩-৬ মার্চ ২০২০ থেকে নিউইয়র্ক সিটিতে অনুষ্ঠিত) কমিশনের বিবেচনার জন্য বিশ্বব্যাপী সূচক কাঠামোতে মোট ৩৬টি পরিবর্তনের প্রস্তাব করা হয়েছিল। কিছু সূচক প্রতিস্থাপিত, সংশোধিত বা বাতিল করা হয়। ১৫ অক্টোবর ২০১৮ এবং ১৭ এপ্রিল ২০২০-এর মধ্যে, সূচকগুলিতে অন্যান্য পরিবর্তন করা হয়েছিল।

জাতিসংঘের পরিসংখ্যান বিভাগ (ইউএনএসডি) ওয়েবসাইটটি একটি চলমান সরকারী নির্দেশক তালিকা প্রদান করে যেখানে ২০২০ সালের মার্চ মাসে পরিসংখ্যান কমিশনের ৫১তম অধিবেশন সমস্ত আপডেট অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

সূচকগুলিকে তাদের পদ্ধতিগত উন্নয়ন এবং বৈশ্বিক পর্যায়ে তথ্যের প্রাপ্যতার ভিত্তিতে তিনটি স্তরে শ্রেণিবদ্ধ করা হয়। টায়ার ১ এবং টায়ার ৩ হল সে সূচকগুলো যেগুলো ধারণাগতভাবে বোধগম্য ও একটি আন্তর্জাতিকভাবে প্রতিষ্ঠিত পদ্ধতি রয়েছে এবং অন্তত কিছু দেশ নিয়মিতভাবে তথ্য তৈরি করে।

লক্ষ্য এবং সূচকসহ ১৭টি লক্ষ্য

লক্ষ্য ১: দারিদ্র্য বিলোপ

এসডিজি ১ হলো ক্ষ্মসর্বত্র সব ধরনের দারিদ্র্যের অবসানক্ষ্ম।

এসডিজি ১ অর্জন করলে ২০৩০ সালের মধ্যে বিশ্বব্যাপী চরম দারিদ্র্যের অবসান ঘটবে। এ লক্ষ্যের অগ্রগতি পরিমাপ করার জন্য সাতটি লক্ষ্য এবং ১৩ টি সূচক রয়েছে।পাঁচটি ফলাফল লক্ষ্য হল: চরম দারিদ্র্য দূরীকরণ; সমস্ত দারিদ্র্য অর্ধেক হ্রাস; সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা বাস্তবায়ন; মালিকানা, মৌলিক সেবা, প্রযুক্তি এবং অর্থনৈতিক সম্পদের সমান অধিকার নিশ্চিত করা; এবং পরিবেশগত, অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিপর্যয়ের স্থিতিস্থাপকতা তৈরি করা। এসডিজি ১ অর্জনের উপায় এর সাথে সম্পর্কিত দুটি লক্ষ্য হল দারিদ্র্যের অবসানের জন্য সম্পদ সংগ্রহ করা; এবং সকল স্তরে দারিদ্র্য বিমোচন নীতি কাঠামো প্রতিষ্ঠা করা।

চলমান অগ্রগতি সত্ত্বেও, বিশ্বের জনসংখ্যার ১০ শতাংশ দারিদ্র্যের মধ্যে বাস করে এবং স্বাস্থ্য, শিক্ষা, এবং পানি ও স্যানিটেশনের মতো মৌলিক চাহিদা পূরণের জন্য সংগ্রাম করে। নিম্ন-আয়ের দেশগুলিতে

চরম দারিদ্র্য রয়ে গেছে বিশেষ করে যারা দ্বন্দ্ব এবং রাজনৈতিক উত্থান দ্বারা প্রভাবিত। সামাজিক নীতিতে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন না হলে, ২০৩০ সালের মধ্যে চরম দারিদ্র্য নাটকীয়ভাবে বৃদ্ধি পাবে। গ্রামীণ দারিদ্র্যের হার দাঁড়িয়েছে ১৭.২ শতাংশ এবং শহরাঞ্চলে ৫.৩ শতাংশ (২০১৬ সালে)। যার প্রায় অর্ধেক শিশু।

সেপ্টেম্বর ২০২০-এ প্রকাশিত একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে যে কোভিড-১৯ মহামারীর কারণে দারিদ্র্য মাত্র কয়েক মাসে ৭ শতাংশ বেড়েছে, যদিও তা গত ২০ বছর ধরে ক্রমাগত কমছে।

লক্ষ্য ২: ক্ষুধা মুক্তি

এসডিজি দুই হল: ''ক্ষুধার অবসান, খাদ্য নিরাপত্তা ও উন্নত পুষ্টিমান অর্জন এবং টেকসই কৃষির প্রসার''।

এসডিজি ২ এর অগ্রগতি পরিমাপের জন্য আটটি লক্ষ্য এবং ১৪ টি সূচক রয়েছে। পাঁচটি ফলাফল লক্ষ্য হল: ক্ষুধা নিবারণ এবং খাদ্যের প্রাপ্তি ব্যবস্থা উন্নত করা; সব ধরনের অপুষ্টির অবসান ঘটানো; কৃষি উৎপাদনশীলতা; টেকসই খাদ্য উৎপাদন ব্যবস্থা এবং স্থিতিস্থাপক কৃষি পদ্ধতি; বীজের জিনগত বৈচিত্র্য, গাছপালা চাষ করা এবং গৃহপালিত প্রাণী পালন; বিনিয়োগ, গবেষণা এবং প্রযুক্তি। তিনটি ক্ষ্মঅর্জন করার উপায়ক্ষ্ম লক্ষ্যগুলির মধ্যে রয়েছে: বিশ্ব কৃষি বাজার, খাদ্য পণ্যের বাজার এবং তাদের আহরণ -এ বাণিজ্য সীমাবদ্ধতা এবং বিকৃতি মোকাবেলা করা। এটি মোকাবিলা করার একমাত্র সহজ উপায় হচ্ছে উন্নত বিশ্বে শ্রমবাজার জোরদার করা যাতে সল্পতায় উন্নয়নশীল দেশগুলো থেকে দক্ষ, আদা দক্ষ বা অনা দক্ষ শ্রমিক আসতে পরে। এবং উন্নয়নশীল দেশে রাজনৈতিক সহিংসতা। বিশ্বব্যাপী ৯ জনের মধ্যে ১ জন মানুষ অপুষ্টিতে ভুগছে; যাদের অধিকাংশই উন্নয়নশীল দেশে বাস করে। পুষ্টিহীনতার কারণে বিশ্বব্যাপী ৫২ মিলিয়ন শিশুর উচ্চতার তুলনায় কম বা অতি কম ওজন হয়। এটি প্রতি বছর পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুদের প্রায় অর্ধেক (45%) মৃত্যুর জন্য দায়ী - প্রতি বছর ৩.১ মিলিয়ন শিশু।

লক্ষ্য ৩: সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ

এসডিজি ৩ হলো ক্ষ্মসকল বয়সী সকল মানুষের জন্য সুস্বাস্থ্য নিশ্চিতকরণক্ষ্ম

লক্ষ্যমাত্রার দিকে অগ্রগতি পরিমাপ করার জন্য এসডিজি ৩-এ ১৩ টি লক্ষ্য এবং ২৮ টি সূচক রয়েছে। প্রথম নয়টি লক্ষ্যমাত্রা হল ফলাফল লক্ষ্য । সেগুলি হল: মাতৃমৃত্যুর হার হ্রাস করা; পাঁচ বছরের কম বয়সী সকল প্রতিরোধযোগ্য মৃত্যু শেষ করা; সংক্রামক রোগের বিরুদ্ধে লড়াই করা; অসংক্রামক রোগ থেকে মৃত্যুহার হ্রাস নিশ্চিত করা এবং মানসিক স্বাস্থ্যের প্রচার করা; মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার প্রতিরোধ ও চিকিৎসা করা; রাস্তার আঘাত এবং মৃত্যু হ্রাস করুন; যৌন এবং প্রজনন যত্ন, পরিবার পরিকল্পনা এবং শিক্ষার সার্বজনীন অ্যাক্সেস মঞ্জুর করুন; সার্বজনীন স্বাস্থ্য কভারেজ অর্জন; এবং বিপজ্জনক রাসায়নিক এবং দূষণ থেকে অসুস্থতা এবং মৃত্যু হ্রাস করে। এসডিজি ৩ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের চারটি উপায় হল: তামাক নিয়ন্ত্রণে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার কাঠামোগত সম্মেলন বাস্তবায়ন করা; গবেষণা, উন্নয়ন এবং সাশ্রয়ী মূল্যের ভ্যাকসিন ও ওষুধের সার্বজনীন প্রাপ্তি সমর্থন করে; উন্নয়নশীল দেশগুলিতে স্বাস্থ্য অর্থায়ন বৃদ্ধি এবং স্বাস্থ্য কর্মী বাহিনীকে সহায়তা করা; এবং বিশ্বব্যাপী স্বাস্থ্য ঝুঁকির জন্য প্রারম্ভিক সতর্কতা ব্যবস্থা উন্নত করা।

আয়ু বৃদ্ধি এবং শিশু ও মাতৃমৃত্যুর কিছু সাধারণ কারণ কমাতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। ২০০০ এবং ২০১৬-এর মধ্যে, বিশ্বব্যাপী পাঁচ বছরের কম বয়সী মৃত্যুহার ৪৭ শতাংশ কমেছে (প্রতি ১০০০ জীবিত জন্মে ৭৮ টি মৃত্যু থেকে প্রতি ১০০০ জীবিত জন্মে ৪১ টি মৃত্যু হয়েছে)। এখনও, পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুদের মৃত্যুর সংখ্যা খুব বেশি: ২০১৬ সালে ৫.৬ মিলিয়ন।

লক্ষ্য ৪: গুনগত শিক্ষা

এসডিজি ৪ হলো ''সকলের জন্য অন্তর্ভূক্তিমূলক ও সমতাভিত্তিক গুনগত শিক্ষা নিশ্চিতকরণ এবং জীবনব্যাপী শিক্ষা লাভের সুযোগ সৃষ্টি।''

এসডিজি ৪ এর দশটি লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে যা ১১ টি সূচক দ্বারা পরিমাপ করা হয়। সাতটি ক্ষ্মফলাফল-ভিত্তিক লক্ষ্যক্ষ্ম হল: বিনামূল্যে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা; মানসম্পন্ন প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষায় সমান প্রবেশাধিকার; সাশ্রয়ী মূল্যের কারিগরি, বৃত্তিমূলক এবং উচ্চ শিক্ষা; আর্থিক সাফল্যের জন্য প্রাসঙ্গিক দক্ষতা সহ মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি; শিক্ষায় সকল বৈষম্য দূর করা; সর্বজনীন সাক্ষরতা এবং সংখ্যাতা; এবং টেকসই উন্নয়ন এবং বিশ্ব নাগরিকত্বের জন্য শিক্ষা। তিনটি ক্ষ্মলক্ষ্য অর্জনের উপায়ক্ষ্ম হল: অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং নিরাপদ বিদ্যালয় নির্মাণ ও আপগ্রেড করা; উন্নয়নশীল দেশগুলির জন্য উচ্চ শিক্ষা বৃত্তি প্রসারিত করা; এবং উন্নয়নশীল দেশে যোগ্য শিক্ষকের সরবরাহ বাড়াতে হবে।

বিশেষ করে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্তরে ছেলে ও মেয়ে উভয়ের জন্য শিক্ষার প্রবেশাধিকারের ক্ষেত্রে বড় অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। স্কুল বহির্ভূত শিশুদের সংখ্যা ১৯৯৭ সালে ১১২ মিলিয়ন থেকে ২০১৪ সালে ৬০ মিলিয়নে প্রায় অর্ধেক হয়েছে। অগ্রগতির পরিপ্রেক্ষিতে, ২০১৮ সালে তৃতীয় শিক্ষায় বিশ্বব্যাপী অংশগ্রহণ ২২৪ মিলিয়নে পৌঁছেছে, যা 38% এর গ্রস নথিভুক্তি অনুপাতের সমতুল্য।

লক্ষ্য ৫: লিঙ্গ সমতা

এসডিজি ৫ হলো ''লিঙ্গ সমতা অর্জন এবং সকল নারী ও মেয়েদের ক্ষমতায়ন।'' ''কাউকে পিছিয়ে না দেওয়ার'' অঙ্গীকারের মাধ্যমে দেশগুলি প্রথমে সবচেয়ে পিছনে থাকা লোকদের জন্য দ্রুত অগ্রগতির জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছে । এসডিজি ৫-এর লক্ষ্য নারী ও মেয়েদের সমান অধিকার, কর্মক্ষেত্রে বৈষম্য বা কোনো সহিংসতা সহ বৈষম্য ছাড়াই মুক্তভাবে বেঁচে থাকার সুযোগ প্রদান করা। এটি লিঙ্গ সমতা অর্জন এবং সমস্ত নারী ও মেয়েদের ক্ষমতায়নের জন্য।

২০২০ সালে, জাতীয় সংসদের একক বা নিম্নকক্ষে নারীদের প্রতিনিধিত্ব ২৫ শতাংশে পৌঁছেছে, যা ২০১৫ সালের ২২ শতাংশ থেকে কিছুটা বেড়েছে। ১৩৩ টি দেশ ও এলাকার তথ্যের ভিত্তিতে স্থানীয় পর্যায়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণের পদে নারীদের এখন আরও ভালো প্রবেশাধিকার রয়েছে, স্থানীয় ইচ্ছাকৃত সংস্থায় ৩৬ শতাংশ নির্বাচিত আসন রয়েছে। যদিও মহিলাদের যৌনাঙ্গ কেটে ফেলা এবং কাটা (এফজিএম/সি) কম সাধারণ হয়ে উঠছে, অন্তত ২০০ মিলিয়ন মেয়ে এবং মহিলা এই ক্ষতিকারক অনুশীলনের শিকার হয়েছে।

লক্ষ্য ৬: নিরাপদ পানীয় জল ও পয়ঃনিষ্কাশন

এসডিজি ৬ হলো ''সকলের জন্য নিরাপদ পানীয় জল ও স্যানিটেশনের টেকসই ব্যবস্থাপনা ও প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা।''

ছয়টি ''ফলাফল-ভিত্তিক লক্ষ্য'' এর মধ্যে রয়েছে: নিরাপদ এবং সাশ্রয়ী পানীয় জল; উন্মুক্ত মলত্যাগ বন্ধ এবং স্যানিটেশন এবং স্বাস্থ্যবিধি প্রদান, জলের গুণমান উন্নত করা, বর্জ্য পানি পুনশ্চক্রীকরণ এবং নিরাপদ পুনঃব্যবহার, জল-ব্যবহারের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং মিঠা পানির সরবরাহ নিশ্চিত করুন, আইডব্লিউআরএম প্রয়োগ করা, জল-সম্পর্কিত বাস্তুতন্ত্র রক্ষা এবং পুনরুদ্ধার। দুটি ''অর্জনের উপায়'' লক্ষ্য হল উন্নয়নশীল দেশগুলিতে জল এবং স্যানিটেশন সহায়তা সম্প্রসারিত করা এবং জল ও স্যানিটেশন ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় নিযুক্তি সমর্থন করা।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ডব্লিউএইচও এবং জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক শিশু জরুরী তহবিল ইউনিসেফের জয়েন্ট মনিটরিং প্রোগ্রাম (জেএমপি) ২০১৭ সালে রিপোর্ট করেছে যে ৪.৫ বিলিয়ন লোকের বর্তমানে নিরাপদ স্যানিটেশন ব্যবস্থা নেই। এছাড়াও ২০১৭ সালে, বিশ্ব জনসংখ্যার মাত্র ৭১ শতাংশ নিরাপদে ম্যানেজড পানীয় জল ব্যবহার করেছে এবং ২.২ বিলিয়ন মানুষ এখনও নিরাপদে ম্যানেজড পানীয় জল ছাড়াই রয়ে গেছে। জলের চাপের বিষয়ে: ''২০১৭ সালে, মধ্য ও দক্ষিণ এশিয়া এবং উত্তর আফ্রিকা খুব উচ্চ জলের চাপ নিবন্ধন করেছে - মোট পুনর্নবীকরণযোগ্য স্বাদু জলের সম্পদের সাথে প্রত্যাহারকৃত তাজা জলের অনুপাত হিসাবে সংজ্ঞায়িত - ৭০ শতাংশের বেশি''। ২০১৮ সালে জল খাতে সরকারী উন্নয়ন সহায়তা বিতরণ বেড়ে $9 বিলিয়ন হয়েছে।প্রমাণ দেখায় যে সরবরাহ- এবং চাহিদা উভয় পক্ষের হস্তক্ষেপ সাহায্য দ্বারা অর্থায়ন করা প্রচারে জলের প্রাপ্তিতে অবদান রাখতে পারে, তবে ধারাবাহিক দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগ প্রয়োজন।

লক্ষ্য ৭: সাশ্রয়ী ও দূষণমুক্ত জ্বালানি

এসডিজি ৭ হলো ''সকলের জন্য সাশ্রয়ী, নির্ভরযোগ্য, টেকসই ও আধুনিক জ্বালানি সহজলভ্য করা।''

এর পাঁচটি লক্ষ্যমাত্রা বা সূচক রয়েছে, যা ২০৩০ সালের মধ্যে অর্জন করতে হবে। এই লক্ষ্যের একটি সূচক হল সকলের জন্য বিদ্যুতের সার্বজনীন অধিকার নিশ্চিত করা (বিদ্যুতের প্রাপ্যতা সম্প্রসারণের অগ্রগতি বেশ কয়েকটি দেশে হয়েছে, বিশেষ করে ভারত, বাংলাদেশ এবং কেনিয়ায়)। অন্য সূচকগুলি নবায়নযোগ্য জ্বালানি ও জ্বালানি দক্ষতা উন্নয়নে নজর দেয়।

লক্ষ্য ৮: শোভন কাজ ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি

এসডিজি ৮ হলো ''সকলের জন্য পূর্নাঙ্গ ও উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান এবং শোভন কর্মসুযোগ সৃষ্টি এবং স্থিতিশীল, অন্তর্ভক্তিমূলক ও স্ববহন অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন।''

লক্ষ্য ৯: শিল্প, উদ্ভাবন ও অবকাঠামো

এসডিজি ৯ হলো ''অভিঘাতসহনশীল অবকাঠামো নির্মাণ, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও স্ববহন শিল্পায়নের

প্রবর্ধন এবং উদ্ভাবনার প্রসারণ।"

লক্ষ্য ১০: অসমতার হ্রাস

এসডিজি ১০ হলো ''অন্তঃ ও আন্তঃ দেশীয় অসমতা কমিয়ে আনা।"

লক্ষ্য ১১: স্ববহন নগর ও জনপদ

এসডিজি ১১ হলো ''অন্তর্ভুক্তিমূলক, নিরাপদ, অভিঘাতসহনশীল এবং স্ববহন নগর ও জনবসতি গড়ে তোলা।"

লক্ষ্য ১২: পরিমিত ভোগ ও স্ববহন উৎপাদন

এসডিজি ১২ হলো ''পরিমিত ভোগ ও স্ববহন উৎপাদনধরন নিশ্চিত করা।"

লক্ষ্য ১৩: জলবায়ু কার্যক্রম

এসডিজি ১৩ হলো ''জলবায়ু পরিবর্তন ও এর প্রভাব মোকাবেলায় জরুরি কর্মব্যবস্থা গ্রহণ।"

লক্ষ্য ১৪: জলজ জীবন

এসডিজি ১৪ হলো ''স্ববহন উন্নয়নের জন্য সাগর, মহাসাগর ও সামুদ্রিক সম্পদের সংরক্ষণ ও স্ববহন ব্যবহার।"

লক্ষ্য ১৫: স্থলজ জীবন

এসডিজি ১৫ হলো ''স্থলজ বাস্তুতন্ত্রের পুনরুদ্ধার ও সুরক্ষা প্রদান এবং স্ববহন ব্যবহারে পৃষ্ঠপোষণা, টেকসই বন ব্যবস্থাপনা, মরুকরণ প্রক্রিয়ার মোকাবেলা, ভূমির অবক্ষয় রোধ ও ভূমি সৃষ্টি প্রক্রিয়ার পুনরুজ্জীবন এবং জীববৈচিত্র হ্রাস প্রতিরোধ।"

লক্ষ্য ১৬: শান্তি, ন্যায়বিচার ও কার্যকর প্রতিষ্ঠান

এসডিজি ১৬ হলো ''স্ববহন উন্নয়নের জন্য শান্তিপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজব্যবস্থার প্রচলন, সকলের জন্য ন্যায়বিচার প্রাপ্তির পথ সুগম করা এবং সকল স্তরে কার্যকর, জবাবদিহিতাপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রতিষ্ঠান বিনির্মাণ।"

লক্ষ্য ১৭: অভীষ্ট অর্জনে অংশীদারিত্ব

এসডিজি ১৭ হলো ''স্ববহনক্ষম উন্নয়নের জন্য বৈশ্বিক অংশীদারিত্ব উজ্জীবনকরণ ও বাস্তবায়নের উপায়সমূহ শক্তিশালী করা।"

সারাংশ

Paul Baran তাঁর নির্ভরশীলতা তত্ত্বে ব্যাখ্যা করেছেন যে উপনিবেশগুলি তাদের শাসক দেশগুলির উপর নানাভাবে নির্ভরশীল ছিল। ফলে শাসক দেশগুলি উপনিবেশগুলির উদ্বৃত্ত হরণ করেছে। ফলে

উপনিবেশগুলি তাদের বিনিয়োগযোগ্য উদ্বৃত্ত থেকে বঞ্চিত হয়েছে। এটাই উপনিবেশগুলির অনুন্নতির কারণ এবং একই সঙ্গে শাসক দেশগুলির উন্নয়নের কারণ। Frank-এর ঔপনিবেশিক শোষণ তত্ত্ব দেখিয়েছে যে অনুন্নতি এবং উপনিবেশবাদ একে অপরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত। Kayé-এর বাণিজ্য মূলধন ও অনুন্নতির তত্ত্বে তিনি দেখিয়েছেন যে শুধুমাত্র বাজার নিয়ন্ত্রণ করে ব্যবসায়ীরা মুনাফা অর্জন করে। এই বাণিজ্য মূলধন কোনো পণ্য উৎপাদন করে না। ব্যবসায়ীদের বাণিজ্য মূলধনের মুনাফার মোট উৎস হল দুটি ক্রয়ের আর দুটি বিক্রয়ের। সমগ্র বিনিময় চক্রটি হল: M-C-M'- C'-M" বিনিময় প্রক্রিয়ার প্রথম অংশের মুনাফা হল (M'-M)। এই মুনাফা দুটি সূত্র থেকে আসতে পারে। ব্যবসায়ীরা কাঁচামাল কেনার সময় স্বল্পোন্নত দেশের উৎপাদকদের কাঁচামালের জন্য কম মূল্য দিতে পারে এবং এই কাঁচামাল উন্নত দেশের শিল্প মূলধনের কাছে বিক্রির সময় বেশি মূল্য নিতে পারে। একইভাবে বিনিময় চক্রের দ্বিতীয় অংশে মুনাফার পরিমাণ হল (M"-M')। এই মুনাফা আসতে পারে যখন বাণিজ্য মূলধন শিল্পজাত দ্রব্য কেনার সময় শিল্প মূলধনকে কম মূল্য দিতে পারে। আবার বাণিজ্য মূলধন স্বল্পোন্নত দেশে শিল্পজাত দ্রব্য বিক্রির সময় বেশি মূল্য নিতে পারে। এইভাবে বাণিজ্য মূলধন স্বল্পোন্নত দেশগুলিকে দুভাবে শোষণ করে তাদের উদ্বৃত্ত ছিনিয়ে নিয়ে থাকে ফলে তাদের অনুন্নতি হয় অবধারিতভাবে। Emmanuel "তাঁর অসম বিনিময় তত্ত্বে দেখিয়েছেন যে স্বল্পোন্নত দেশে মজুরি কম হওয়ার ফলে দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন ব্যয় তথা দাম সেখানে কম। অন্যদিকে উন্নত দেশে মজুরির হার বেশি। ফলে দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন ব্যয় এবং তাদের দাম বেশি। এই উন্নত দেশের দ্রব্যসামগ্রীর তুলনায় স্বল্পোন্নত দেশের দ্রব্যসামগ্রী সস্তা হওয়ায় এই দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য হলে সেই বাণিজ্যে অসম বিনিময় ঘটে। এইভাবে অসম বিনিময়ের মাধ্যমে স্বল্পোন্নত দেশগুলি উন্নত দেশ দ্বারা শোষিত হয়।

পরবর্তী পর্যায়ে উন্নয়নের আধুনিক তত্ত্ব এর আলোচনায় 'ওয়াশিংটন ঐক্যমত' আলোচনা করা হয়েছে - ওয়াশিংটন ঐক্যমত হল ১৯৮০ এবং ১৯৯০ এর দশকে বিবেচনা করা দশটি অর্থনৈতিক নীতির প্রেসক্রিপশনের একটি সেট যা ওয়াশিংটন, ডিসি-ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ), বিশ্বব্যাংক দ্বারা সঙ্কট-বিপর্যস্ত উন্নয়নশীল দেশগুলির জন্য প্রচারিত ক্ষ্মমানকক্ষ্ম সংস্কার প্যাকেজ গঠন করে।

*আজকের উন্নয়নের সাথে ভবিষ্যৎ উন্নয়নের একটি স্ববিরোধীতা লক্ষ্য করা যায় সেখান থেকে স্ববহন ও দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়নের মডেল এর ধারনার সৃষ্টি, এখানে আমরা স্ববহন উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করবো। স্ববহন উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (Sustainable Development Goals SDGs), এসডিজি বা বৈশ্বিক লক্ষ্যসমূহ হলো ১৭টি আন্তঃসংযুক্ত বৈশ্বিক লক্ষ্যের একটি সমষ্টি যা ক্ষ্মসকলের জনগ্ধ একটি ভালো এবং আরও স্ববহন ও টেকসই ভবিষ্যৎক্ষ্ম অর্জনের পরিকল্পনা হিসাবে তৈরি করা হয়েছে। জাতিসংঘ (United Nation) এ লক্ষ্যগুলো প্রণয়ন করেছে তস্ববহন এবং দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়নের জন্য বৈশ্বিক লক্ষ্যমাত্রাদ হিসেবে লক্ষ্যগুলোকে আখ্যায়িত করেছে। এসব লক্ষ্য সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা -কে প্রতিস্থাপন করেছে, যা ২০১৫ সালের ৩১ শে ডিসেম্বর মেয়াদোত্তীর্ণ হয়েছিল। এসডিজি-এর মেয়াদ ২০১৬ থেকে ২০৩০ সাল। এতে মোট ১৭টি অভীষ্ট, ১৬৯টি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা এবং ১৩৩ টি নির্ধারক অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

৩.১৬ অনুশীলনী

ক। নীচের প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন। (প্রতিটির মান ২.৫)

(১) উন্নয়নের নির্ভরশীলতার তত্ত্ব এর প্রণেতা কে?

(২) অসম উন্নয়নের তত্ত্বের কয়েকজন প্রবক্তার নাম করুন

(৩) বাণিজ্যে অসম বিনিময় হারের অর্থ কি?

(৪) ওয়াশিংটন সহমত কি?

(৫) স্ববহনক্ষম ও দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়ন বলতে কি বোঝেন?

খ) মধ্যদৈর্ঘ্যের প্রশ্ন (প্রতিটির মান ৫)

(৬) ওয়াশিংটনের সহমত কে কেন বাজার মৌলবাদ বা নব্য উদারনীতিবাদ বলা হয় কেন?

(৭) আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক থিঙ্ক ট্যাঙ্ক উইলিয়ামসনের বলা ঐকমত্যের মধ্যে তুলনামূলকভাবে নির্দিষ্ট দশটি নীতি সুপারিশ কি কি?

হ্গ) বড় প্রশ্ন (প্রতিটির মান ১০)

(১) ফ্র্যাঙ্ক-এর ঔপনিবেশিক শোষণের তত্ত্বের একটি আলোচনা করুন।

(২) উন্নত ও অনুন্নত দেশের মধ্যে বাণিজ্যের সময় অসম বিনিময়কেই উন্নয়নের পার্থক্যের (unevenness of development) জন্য প্রাথমিকভাবে দায়ী বলে মনে করা হয় , এটি কার অভিমত? এই মতের যথার্থতা আলোচনা করুন।

(৩) স্ববহনক্ষম বা দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়নের সূচক সহ লক্ষ্যমাত্রা সমূহ সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

(ঘ) সঠিক উত্তর নির্বাচনের প্রশ্নাবলী

স্ববহনক্ষম উন্নয়নের জন্য ২০৩০ এজেন্ডা অনুসারে কয়টি লক্ষ্য গ্রহণ করা হয় ,

ক) চারটি, খ) ছয়টি গ) আটটি ঘ) সতেরটি

অনুন্নতি ও উপনিবেশবাদ সর্বদাই একত্র বিরাজমান। এটি কার উক্তি -

ক) মার্কস খ) ফ্র্যাঙ্ক ৩) মিরদাল ৪) ইমানুয়েল

On Capitalist Underdevelopment গ্রন্থটির রচয়িতা ,

ক) মিরদাল খ) ফ্র্যাঙ্ক গ) মার্কস ঘ) সামির আমিন

৩.১৭ গ্রন্থপঞ্জী

1. Thirlwall A. P. Growth and Development with Special Reference to Developing Economics SELBS/MacMillan 1983V
2. Meier G. M.éôéLeading Issues in Economic Development SNew York– 1976V
3. Gupta Subrata and Ghosh Sujit A Tract On Economic Development Process and Perspectives SCharu Publishing Company– Calcutta 1992V.
4. Myint H. The Economics of the Developing Countries SIndian Edition– B. Publications– 1980V
5. Lewis Arthuréôé"The Slowing Down of the Engine of Growth"– American Economic Review Svol. 70– No. 4– 1980V

   Also see Games Riedel "Trade as an Engine of Growth in Developing Countries Revisited"– The Economic Journal– Vol. 94 SMarch– 1984V
6. Baran– Paul The Political Economy of Growth– The Monthly Review Press– New York– 1957
7. Amin– SamiréôéUnequal Development. The Monthly Review Press– New York– 1976
8. Frank– GéôéOn Capitalist Underdevelopment– The Monthly Review Press– New York– 1967
9. Kay– GéôéDevelopment and Underdevelopment A Marxist Analysis– MacMillan– London– 1975
10. Sarkhel– Jaydeb– Seikh Salim and Anindya Bhukta Economic Development-Institutions– Theory and Policy– Book Syndicate Private Limited– Kolkata– 2023.
11. সরখেল, জয়দেব, সেখ সেলিম, অনিন্দ্য ভুক্ত-অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান, তত্ত্ব ও প্রয়োগ, বুক সিন্ডিকেট প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০২০

একক ৪ ❑ অনুন্নয়ন এর নিরন্তরতা

গঠন

৪.১ উদ্দেশ্য

৪.২ প্রস্তাবনা

৪.৩ অনুন্নয়নের বৈশিষ্ঠ্য

৪.৪ উন্নয়নের বাধা সমূহ

৪.৫ ফাঁদের মডেল

৪.৫.১ স্বল্পোন্নত দেশগুলির নিম্নস্তরের ভারসাম্যের ফাঁদ- নেলসনের মডেল **(Low Level Equilibrium Trap in Less Developed Countries- Nelsonós Model):**

৪.৫.২ সর্বনিম্ন গুরুত্বপূর্ণ বিনিয়োগ প্রচেষ্টা সম্পর্কে লিবেনস্টিনের মডেল **(Leibensteinós Model of Critical Minimum Effort):**

৪.৬ ক্রমযৌগিক কারণের তত্ত্ব

৪.৬.১ ক্রমযৌগিক কারণ ও আন্তর্জাতিক বৈষম্য

৪.৬.২ পরিশেষ মন্তব্য

৪.৭ সারাংশ

৪.৮ অনুশীলনী

৪.৯ গ্রন্থপঞ্জী

৪.১ উদ্দেশ্য

এই এককে আমরা অনুন্নতির বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে একটা ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করব। অর্থনৈতিক উন্নয়নের

পথে বাধাগুলি কী কী তারও অনুসন্ধান করব। অর্থনৈতিক অনুন্নয়নের যে দুষ্টচক্র আছে সেটি কীভাবে অতিক্রম করা যায় সে সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করব। বিভিন্ন অর্থনীতিবিদ উন্নয়নের বিভিন্ন ধরনের কৌশল উদ্ভাবন করেছেন সেগুলি আমরা একে একে ব্যাখ্যা করব।

৪.২ প্রস্তাবনা

বিশ্বের দেশগুলির মধ্যে কিছু দেশ রয়েছে যারা অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদের

উপযুক্ত ব্যবহার ঘটিয়েছে। এগুলি হল উন্নত দেশ। এরা উচ্চ মাথাপিছু আয় ভোগ করছে। অন্যদিকে রয়েছে বহু দেশ যারা তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সম্ভাবনাকে বাস্তবে কাজে লাগাতে পারেনি। এরা অনুন্নত দেশ। অনুন্নত দেশ বলতে একথা বলা হচ্ছে না যে দেশাটির উন্নয়নের কোনো সম্ভাবনাই নেই। আসলে দেশটির সম্পদের উপযুক্ত ব্যবহার হয়নি, আর তাই এর মাথাপিছু প্রকৃত আয় কম। উপযুক্ত উদ্যোগের অভাবেই হয়তো তা হয়ে ওঠেনি। যদি জাতীয় বা মাথাপিছু উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দারিদ্র্য, আয়-বৈষম্য ও বেকারত্ব কমতে থাকে তবেই অর্থনৈতিক উন্নতি ঘটেছে বলা যাবে। বিভিন্ন অর্থনীতিবিদ বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে দারিদ্র্যের এই দুষ্টচক্র ভেদ করার চাবিকাঠি দিয়েছেন। সেগুলির আলোচনার মাধ্যমে আমরা উন্নয়নের পথের সন্ধান করব।

৪.৩ অনুন্নয়নের বৈশিষ্ঠ্য

অনুন্নয়ন এর বৈশিষ্ঠ সমূহ স্বল্পোন্নত অর্থনীতির বিভিন্ন সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করলে এরূপ অর্থনীতির কয়েকটি মৌল বৈশিষ্ট্য নজরে পড়ে। পৃথিবীর স্বল্পোন্নত দেশগুলির মধ্যে নানা বিষয়ে পার্থক্য বিদ্যমান। বিভিন্ন স্বল্পোন্নত দেশের উন্নয়নের স্তরও সমান নয়। অনুন্নত বা স্বল্পোন্নত দেশ হিসাবে ভারত ও শ্রীলঙ্কা, পেরু ও চিলি, মিশর ও বাংলাদেশ-এরা কখনোই এক রকমের নয়। স্বভাবতই কোনো একটা বিশেষ সংজ্ঞা দিয়ে সমস্ত স্বল্পোন্নত অর্থনীতির প্রকৃত স্বরূপ ব্যাখ্যা করা যায় না। তবুও স্বল্পোন্নত দেশগুলোর কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। এই সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলোই আমরা এখানে উল্লেখ করছি।

১. **কম মাথাপিছু আয়:** স্বল্পোন্নত দেশের অধিবাসীদের মাথাপিছু আয় খুবই কম। এরূপ দেশের অর্থনৈতিক সংগঠনগুলো অদক্ষ ও অনুন্নত। দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোও দুর্বল। তাছাড়া, স্বল্পোন্নত দেশে উন্নত কারিগরি জ্ঞানের অভাব। ফলে জাতীয় আয়ের পরিমাণ কম। জনসংখ্যার তুলনায় জাতীয় উৎপাদনের পরিমাণ কম বলে মাথাপিছু আয় খুবই কম। জনসংখ্যার এক বিপুল অংশ দারিদ্র্যের মধ্যে দিনযাপন করে। জনসাধারণের আয় কম বলে জীবনযাত্রার মানও খুব নিম্ন। তারা নানা অপুষ্টিজনিত রোগে ভোগে এবং দেশের জনসাধারণের প্রত্যাশিত গড় আয়ু খুবই কম হয়।

২. **কৃষিনির্ভর অর্থনীতি:** স্বল্পোন্নত অর্থনীতি একান্তভাবে কৃষিনির্ভর। এরূপ অর্থনীতিতে কৃষির গুরুত্ব অপরিসীম। জনসংখ্যার এক বিরাট অংশ কৃষির উপর নির্ভরশীল। জাতীয় আয়ের একটা বড় অংশ কৃষি থেকে উদ্ভূত হয়। সাধারণভাবে দেখা যায় যে, স্বল্পোন্নত দেশগুলোতে মোট জনসংখ্যার প্রায় তিন-চতুর্থাংশ কৃষি ও সংশ্লিষ্ট কাজকর্মে নিযুক্ত। জাতীয় আয়ের প্রায় অর্ধেক বা তার বেশি আসে কৃষিক্ষেত্র থেকে। কিন্তু স্বল্পোন্নত অর্থনীতিতে কৃষি খুব গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হলেও কৃষিব্যবস্থা খুবই অনুন্নত। ফলে কৃষির উৎপাদনশীলতা অত্যন্ত কম। কৃষির উৎপাদন কৌশল সাবেকি ও প্রাচীন ধরনের। ফলে শ্রমিক পিছু বা একর পিছু উৎপাদন ক্ষমতা খুবই কম। এখানে চাষিরা মূলত নিজেদের পরিবারের প্রয়োজন মেটানোর জন্য কৃষিকার্য করে থাকে। বাজারে বিক্রির জন্য উৎপাদন করে না বললেই চলে। অর্থাৎ বাণিজ্যিক কৃষি প্রসার লাভ করেনি। এখানে চাষবাসের উদ্দেশ্য হল

পরিবারের ভরণপোষণ (subsistence farming)

স্বল্পোন্নত দেশে কৃষির এত বেশি গুরুত্বের পিছনে মূলতঃ দুটি বিষয় কাজ করে। প্রথমত, কৃষিকার্যে সাধারণ শিক্ষা বা কারিগরি জ্ঞান কোনোটারই বিশেষ প্রয়োজন হয় না। তাই স্বল্পোন্নত দেশে অশিক্ষিত ও কারিগরি জ্ঞানবর্জিত জনসাধারণের পক্ষে কৃষিই হল উপযুক্ত জীবিকা। দ্বিতীয়ত, স্বল্পোন্নত দেশের জনসাধারণের একটা বড় অংশই দরিদ্র ও সঙ্গতিহীন। এরূপ লোকেদের কাছে কৃষিই একমাত্র উপযুক্ত পেশা, কারণ সাবেকি কৃষি ব্যবস্থায় একসঙ্গে খুব বেশি মূলধন বিনিয়োগের প্রয়োজন হয় না। এ সমস্ত কারণেই স্বল্পোন্নত দেশগুলোতে কৃষির প্রাধান্য লক্ষ করা যায়

৩. **মূলধন স্বল্পতা:** স্বল্পোন্নত দেশগুলোতে মূলধনের বড়ই অভাব। মূলধনের স্বল্পতা এ সমস্ত দেশে একই সঙ্গে দারিদ্র্যের কারণ ও ফল। নার্কসের মতে, মূলধনের স্বল্পতার জন্য স্বল্পোন্নত দেশগুলোতে 'দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র' কাজ করে। স্বল্পোন্নত দেশে মাথাপিছু আয় কম বলে সঞ্চয় কম। সঞ্চয় কম বলে মূলধন গঠনের হারও কম হয়। ফলে শ্রমিকের উৎপাদনশীলতা কম। আর উৎপাদনশীলতা কম বলে আয় কম। এভাবে মূলধনের জোগানের দিক থেকে একটা দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র কাজ করে। আবার, মূলধনের চাহিদার দিক থেকেও অনুরূপ একটি দুষ্টচক্র কাজ করে। অনুন্নত দেশে জনসাধারণের মাথাপিছু আয় কম বলে তাদের ক্রয়ক্ষমতা কম। ফলে দেশীয় বাজার খুব একটা বড় নয়। এজন্য বিনিয়োগকারীরা খুব বেশি বিনিয়োগ করতে আগ্রহী হয় না। এর ফলেও মূলধনের গঠনের হার কম হয় ও শ্রমিকের উৎপাদনশীলতা কম থাকে। ফলে শ্রমিকের আয় কম। এভাবে মূলধনের অভাব স্বল্পোন্নত দেশকে দারিদ্র্যের দুষ্টচক্রে আবদ্ধ রাখে।

৪. **শিল্পে অনগ্রসরতা:** স্বল্পোন্নত দেশ সাধারণভাবে শিল্পে অনগ্রসর। এরূপ দেশে অধিকাংশ শিল্পই হল ভোগ্যপণ্য শিল্প। এসব শিল্প অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কৃষিজ কাঁচামালের উপর নির্ভরশীল। মূলধনী দ্রব্য শিল্প গড়ে না ওঠায় স্বল্পোন্নত দেশে মূল ও ভারী শিল্প তেমন গড়ে ওঠেনি। মূলধনী দ্রব্য শিল্প গড়ে না ওঠায় স্বল্পোন্নত দেশে শিল্পের বনিয়াদ খুব দৃঢ় নয়। প্রয়োজনীয় মূলধনী দ্রব্য বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়। ফলে মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয়িত হয় এবং লেনদেন ব্যালান্সে প্রতিকূলতা দেখা দেয়।

৫. **জনসংখ্যার চাপ:** অধিকাংশ স্বল্পোন্নত অর্থনীতির অপর একটি বৈশিষ্ট্য হল জনসংখ্যা বৃদ্ধির চাপ। এরূপ অর্থনীতিতে জনসংখ্যা যে হারে বাড়ে, জাতীয় আয় সেই হারে বাড়ে না। ফলে মাথাপিছু আয় খুব ধীর গতিতে বাড়ে। স্বল্পোন্নত অর্থনীতিতে অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রক্রিয়া শুরু হবার সাথে সাথেই মৃত্যুহার দ্রুত হ্রাস পায়। কিন্তু জন্মহার মোটামুটি একই থাকে। ফলে জনসংখ্যা দ্রুত হারে বৃদ্ধি পায়। দ্রুত হারে জনসংখ্যার ভোগব্যয় মেটানোর জন্য উৎপাদনের একটি বড় অংশই ব্যয় করতে হয়। ফলে সঞ্চয় ও মূলধন গঠন খুব কম হয়। এভাবে দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে বাধার সৃষ্টি করে।

৬. **বেকারত্ব:** স্বল্পোন্নত দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার খুবই বেশি। অথচ বিনিয়োগের হার খুবই কম। এ

সমস্ত দেশে শিল্প তেমন প্রসার লাভ করেনি। তাই শিল্পে কর্মসংস্থানের সুযোগ খুবই সীমিত। ফলে স্বল্পোন্নত দেশে দেখা দেয় গণ-বেকারত্ব। শিল্পে নিয়োগের সুযোগ কম হওয়ায় বর্ধিত জনসংখ্যা কৃষিতে ভিড় করে। কিন্তু স্বল্পোন্নত দেশের কৃষিপদ্ধতি চিরাচরিত ও সাবেকি ধরনের। সারা বছর কৃষিকার্য চলে না, বছরের কয়েকটি ঋতুতে কৃষিকার্যে ব্যস্ততা লক্ষ করা যায়। ফলে উদ্বৃত্ত জনসংখ্যা কৃষিক্ষেত্রে এসে ভিড় করলে কৃষিতে দেখা দেয় অর্ধ-বেকারত্ব ও প্রচ্ছন্ন বেকারত্ব। এই অর্ধ-বেকারত্ব ও প্রচ্ছন্ন বেকারত্বের সঙ্গে উন্মুক্ত বেকারত্ব যুক্ত হয়ে স্বল্পোন্নত দেশে ভয়াবহ বেকার সমস্যার সৃষ্টি করে।

৭. **ঔপনিবেশিক বৈদেশিক বাণিজ্য:** স্বল্পোন্নত দেশগুলো প্রধানত কৃষিজাত দ্রব্যসামগ্রী রপ্তানি করে ও শিল্পজাত দ্রব্যসামগ্রী আমদানি করে। এরূপ বৈদেশিক বাণিজ্যকে ঔপনিবেশিক বৈদেশিক বাণিজ্য বলা হয়। স্বল্পোন্নত অর্থনীতিতে কৃষিক্ষেত্রটিই প্রধান ক্ষেত্র। এই অর্থনীতির রপ্তানি দ্রব্যের মধ্যে কৃষিজাত দ্রব্যের প্রাধান্য বেশি থাকে। স্বল্পোন্নত অর্থনীতিতে শিল্পের খুব বেশি বিকাশ ঘটেনি। ফলে ঐ অর্থনীতি বিদেশ থেকে শিল্পজাত দ্রব্য আমদানি করে। এরূপ ক্ষেত্রে বাণিজ্য হারও স্বল্পোন্নত দেশগুলোর বিপক্ষে যায়। অর্থাৎ স্বল্পোন্নত দেশগুলো কৃষিজ কাঁচামাল ও খাদ্যশস্য কম দামে রপ্তানি করে, বিনিময়ে অধিক দাম দিয়ে শিল্পজাত দ্রব্য কেনে। ফলে এই দেশগুলোর বৈদেশিক বাণিজ্যে প্রায়ই ঘাটতি লক্ষ করা যায়।

৮. **নিম্ন মানের মানবিক মূলধন:** স্বল্পোন্নত দেশের অপর একটি বৈশিষ্ট্য হল মানবিক মূলধনের নিম্ন মান। স্বল্পোন্নত দেশে জনসংখ্যার ব্যাপক অংশ নিরক্ষর। ফলে তাদের কাজকর্মে ও চিন্তাভাবনায় প্রগতিশীলতার অভাব। নানা কুসংস্কার ও রক্ষণশীলতায় তাদের চিন্তাশক্তি আচ্ছন্ন। শ্রমিকদের মধ্যে সাধারণ শিক্ষা ও কারিগরি জ্ঞানের খুবই অভাব। এ সমস্ত কারণে শ্রমিকদের দক্ষতা ও উৎপাদনশীলতা অত্যন্ত কম। তাছাড়া, ঝুঁকি গ্রহণে আগ্রহী এরূপ উদ্যোক্তারও অভাব লক্ষ করা যায়। এছাড়া, নানারকম কুসংস্কারের ফলে শ্রম ও মূলধনের চলনশীলতা খুব কম থাকে। এ সমস্ত কারণে স্বল্পোন্নত দেশগুলোতে জনসংখ্যার গুণগত মান খুবই নিম্নে থাকে।

৯. **দ্বৈত অর্থনীতি:** স্বল্পোন্নত দেশগুলিতে একটি দ্বৈত অর্থনীতি লক্ষ করা যায়। অর্থনীতিটি যেন দুটি ক্ষেত্রে বিভক্ত। একটি উন্নত ক্ষেত্র এবং অপরটি অনুন্নত ক্ষেত্র। উন্নত ক্ষেত্রে উৎপাদনের কাজে আধুনিক কলাকৌশল গ্রহণ করা হয়। অন্যদিকে, অনুন্নত ক্ষেত্রটিতে উৎপাদন কৌশল প্রাচীন ও সাবেকি ধরনের। স্বল্পোন্নত অর্থনীতিতে এই দুটি ক্ষেত্র দুটি বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো সহাবস্থান করে। একটি ক্ষেত্র অপর ক্ষেত্রকে প্রভাবিত করতে পারে না অর্থাৎ উন্নয়নের সুফল উন্নত ক্ষেত্র থেকে অনুন্নত ক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়ে না। আবার, অনুন্নত ক্ষেত্রও উন্নত ক্ষেত্রকে প্রভাবিত করতে পারে না। দুটি ভিন্ন ধরনের অর্থনীতি যেন পাশাপাশি বিরাজ করে। একেই দ্বৈত অর্থনীতি বলে।

১০. **আয় ও সম্পদ বণ্টনে বৈষম্য:** স্বল্পোন্নত দেশগুলোতে আয় ও সম্পদ বণ্টনে বৈষম্য দেখা যায়। মুষ্টিমেয় কিছু লোকের হাতেই অধিক আয় ও সম্পদ কেন্দ্রীভূত হয়। ফলে অর্থনৈতিক ক্ষমতা

মুষ্টিমেয় কিছু ব্যক্তির হাতে কেন্দ্রীভূত হয়ে থাকে। মোট জনসংখ্যার একটা নগণ্য অংশের আয় ও সম্পদ বেশি। কিন্তু জনসংখ্যার বিশাল অংশ গণ-দারিদ্র্য ও গণ-বেকারত্বের মধ্যে দিন কাটায়। আয় ও সম্পদ বণ্টনের বৈষম্য এবং অর্থনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন স্বল্পোন্নত দেশগুলোর একটি অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য।

১১. **প্রাকৃতিক সম্পদের অপূর্ণ ব্যবহার:** স্বল্পোন্নত দেশগুলোর আর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হল প্রাকৃতিক সম্পদের স্বল্প বা অপূর্ণ ব্যবহার। অর্থনৈতিক অনুন্নতির এটি একটি অন্যতম প্রধান কারণ। প্রায় সমস্ত স্বল্পোন্নত দেশেই প্রাকৃতিক সম্পদ প্রচুর পরিমাণে রয়েছে। কিন্তু প্রাকৃতিক সম্পদকে ঠিকভাবে কাজে লাগানোর ক্ষমতা নেই। প্রাকৃতিক সম্পদের উপযুক্ত ব্যবহার করতে না পারার জন্যই অনেক দেশ অনুন্নত রয়েছে। প্রাকৃতিক সম্পদ অব্যবহৃত থাকার পিছনে দুটি প্রধান কারণ রয়েছে। প্রথমত, প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার করার জন্য যে মূলধন প্রয়োজন, স্বল্পোন্নত দেশে সেই মূলধনের অভাব লক্ষ করা যায়। মূলধনের অভাবের জন্য প্রাকৃতিক সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার সম্ভব হয় না। দ্বিতীয়ত, প্রাকৃতিক সম্পদের অপূর্ণ ব্যবহারের কারণ হল উপযুক্ত কারিগরি জ্ঞানের অভাব। প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার করার জন্য যে কারিগরি জ্ঞান প্রয়োজন, স্বল্পোন্নত দেশে সেই কারিগরি জ্ঞানের অভাব রয়েছে। ফলে অনেক স্বল্পোন্নত অর্থনীতিতে প্রাকৃতিক সম্পদ অব্যবহৃত রয়েছে এবং সেজন্যই ঐ সব দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটছে না।

১২. **অন্যান্য বৈশিষ্ট্য:** উপরের অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্যগুলো ছাড়াও স্বল্পোন্নত দেশগুলোতে কিছু অন-অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্যও লক্ষ করা যায়। এগুলো হল: (i) নিরক্ষরতা ও অশিক্ষা, (ii) পরিবর্তনবিমুখ, কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজ কাঠামো, (iii) শিশু শ্রমিকের আধিক্য, (iv) সমাজে নারীদের নীচু স্থান ও অপুষ্টি, (v) উচ্চ শিশু মৃত্যুর হার, (vi) জনগণের রাজনৈতিক ও সামাজিক সচেতনতার অভাব, (vii) অদক্ষ ও দুর্নীতিগ্রস্ত প্রশাসন প্রভৃতি।

সংক্ষেপে বলতে গেলে অনুন্নতিকে কয়েকটি সাধারণ বৈশিষ্ট্যের দ্বারা চেনা যায়। সে বৈশিষ্ট্যগুলি যে সকল প্রধান বিষয়ের উপর আলোকপাত করে সেগুলো হল অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা, প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা, বাজারের অসম্পূর্ণতা এবং অর্থনীতির দ্বৈতাবস্থা। এ প্রসঙ্গে এটাও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, অনুন্নত দেশের বৈশিষ্ট্যগুলো একই সঙ্গে ঐ দেশে বিদ্যমান অনুন্নতির কারণ ও ফল উভয়ই। অনুন্নতির কারণগুলোকে (causes) তাদের ফল (effects) হতে বিচ্ছিন্ন করা যায় না কারণ তারা অঙ্গাঙ্গীভাবে বিশিষ্ট

৪.৪ উন্নয়নের বাধা সমূহ

স্বল্পোন্নত দেশগুলো অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে অগ্রসর হওয়ার সময় যে সমস্ত সমস্যার সম্মুখীন হয়, সেগুলোকেই বলা হয় অর্থনৈতিক উন্নয়নের বাধা। এগুলোর জন্যই অনুন্নত দেশগুলো অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে এগিয়ে যেতে পারে না। বিভিন্ন অর্থনীতিবিদ অর্থনৈতিক উন্নয়নের বিভিন্ন ধারার কথা উল্লেখ করেছেন।

তবে এই বাধাগুলো সব দেশের পক্ষে সমান নয়। অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে যে সমস্ত বাধা লক্ষ করা যায় সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য বাধাগুলো নিম্নে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল:

২. মূলধনের স্বল্পতা (Lack of capital):

অনুন্নত দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে বড় বাধা হল মূলধনের অভাব। নার্কসের মতে, অনুন্নত দেশে মূলধনের জোগান কম, আবার মূলধনের চাহিদাও কম। মূলধনের চাহিদা ও জোগান উভয় দিক হতেই দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র কাজ করে। এই দুষ্টচক্র হল এমন কতকগুলো শক্তির একত্র সমাবেশ যারা একে অপরের উপর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমেই একটি অনুন্নত দেশকে অনুন্নতির জালে আবদ্ধ রাখে। এই দুষ্টচক্রের প্রধান কারণ হল মূলধনের স্বল্পতা। এর ফলেই একটি দরিদ্র দেশ দরিদ্রই রয়ে যায়।

৩. বাজারের অসম্পূর্ণতা (Market imperfections):

অনুন্নত দেশে বাজারের নানা অসম্পূর্ণতা রয়েছে। এ সমস্ত দেশে উৎপাদনের উপাদানগুলো সম্পূর্ণরূপে গতিশীল নয়। বিভিন্ন সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক কারণে শ্রমিকেরা দেশের এক অংশ হতে অন্য অংশে বা এক পেশা হতে অন্য পেশায় যেতে চায় না। মূলধনও সম্পূর্ণরূপে গতিশীল নয়। এর ফলে সম্পদের কাম্য ও পূর্ণ ব্যবহার ঘটে না এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে বাধার সৃষ্টি হয়।

৪. আন্তর্জাতিক শক্তিসমূহ (International forces):

বৈদেশিক বাণিজ্য এবং মূলধন গমনাগমনের মধ্য দিয়ে আন্তর্জাতিক শক্তিগুলো কাজ করে। এই শক্তিগুলো যেমন একদিকে উন্নত দেশগুলোকে আরও অগ্রসর হতে সাহায্য করেছে, অন্যদিকে তেমনি অনুন্নত দেশগুলোকে পিছনে ঠেলে দিয়েছে। আন্তর্জাতিক শক্তিগুলো নিম্নলিখিতভাবে অনুন্নত দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে।

(ক) আন্তর্জাতিক বাণিজ্য অনুন্নত দেশগুলোকে কৃষিপণ্য রপ্তানিকারী এবং শিল্পদ্রব্য আমদানিকারী দেশ হিসেবে রেখে দিয়েছে।

(খ) বৈদেশিক বাণিজ্য হার কৃষিপণ্যের প্রতিকূলে থেকেছে এবং তা অনুন্নত দেশের স্বার্থহানি ঘটিয়েছে।

(গ) আন্তর্জাতিক বাণিজ্য অনুন্নত দেশে আন্তর্জাতিক প্রদর্শন প্রভাব সৃষ্টি করেছে। Nurkse মনে করেন যে, আন্তর্জাতিক স্তরে প্রদর্শন প্রভাব কার্যকর হবার ফলে অনুন্নত দেশগুলোর ভোগ্যব্যয় অপেক্ষাকৃতভাবে বেশি হয়। ফলে এদের সঞ্চয় কমে, মূলধন গঠন কম হয় এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন ব্যাহত হয়।

(ঘ) বিদেশি মূলধন ও বিদেশি কৃৎকৌশলের মাধ্যমে অনুন্নত দেশ থেকে মুনাফা ও রয়াল্টি বাবদ মোটা টাকা বিদেশে চলে যায়। এভাবে অনুন্নত দেশ থেকে সম্পদের নিঃসরণ (drain) ঘটে। উন্নত দেশের বহুজাতিক সংস্থাগুলো নানাভাবে অনুন্নত দেশে শোষণ চালায়। উনবিংশ শতাব্দীতে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম অর্ধে উন্নত দেশগুলো অনুন্নত দেশে উপনিবেশ স্থাপন করেছিল এবং তাদের নানাভাবে শোষণ করেছিল। বর্তমানে প্রত্যক্ষ ঔপনিবেশিক শোষণের অবসান ঘটলেও আন্তর্জাতিক

বাণিজ্য ও মূলধন হস্তান্তরের মাধ্যমে পরোক্ষ শোষণ বজায় আছে। এ সমস্ত শোষণই অনুন্নত দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে বড় বাধা।

৫. উপযুক্ত পরিবেশের অভাব (Lack of suitable environment):

অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য চাই রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা। অনুন্নত দেশে প্রায়শই তা থাকে না। তাছাড়া, শিল্পবিপ্লব সার্থক হওয়ার জন্য কৃষি ও ব্যবসা-বাণিজ্যেও বিপ্লব সংঘটিত হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু এর জন্য যে উপযুক্ত পরিবেশ প্রয়োজন তা অনুন্নত দেশে নেই। ফলে এই দেশগুলোতে অর্থনৈতিক উন্নয়ন বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে।

৬. কৃৎকৌশলগত বাধা (Technological constraints):

পাশ্চাত্যের কৃৎকৌশল অনুন্নত দেশগুলোর ক্ষেত্রে সম্পূর্ণরূপে প্রযোজ্য নয়। উন্নত দেশগুলোর কৃৎকৌশল শ্রমসঞ্চয়ী ও মূলধন ব্যবহারকারী। কিন্তু অনুন্নত দেশে অদক্ষ শ্রম উদ্বৃত্ত, অথচ সেখানে মূলধনের অভাব। আবার, এখানে দক্ষ শ্রমিকেরও অভাব। এরূপ দেশের পক্ষে উপযুক্ত কৃৎকৌশল এখনও উদ্ভাবিত হয়নি। তাই বাধ্য হয়ে তারা উন্নত দেশগুলো থেকে অত্যাধুনিক কৃৎকৌশল আমদানি করে। ফলে একদিকে মূলধন ও দক্ষ শ্রমিকের প্রচণ্ড চাহিদার সৃষ্টি হয়, অন্যদিকে বহু সংখ্যক অদক্ষ শ্রমিক বেকার থেকে যায়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, পাশ্চাত্য ধরনের কৃৎকৌশল গ্রহণ করার অসুবিধা হল অনুন্নত দেশগুলোর অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে একটা বড় বাধা।

৭. পশ্চাদগামী প্রভাব (Backwash effect):

Myrdal-এর মতে, অনুন্নত দেশে সাধারণত একটি দ্বৈত অর্থব্যবস্থা বিরাজ করে। এখানে একটি ক্ষুদ্র অংশ খুবই উন্নত এবং বাকি বৃহৎ অংশ অনুন্নত। এই দুই অংশ পাশাপাশি বিরাজ করে কিন্তু উন্নত অংশ দেশের অনুন্নত অংশকে টেনে উপরে তুলতে পারে না। বরং উন্নত অংশটি অনুন্নত অংশের সম্পদ টেনে নিয়ে নিজে আরও উন্নত হয় এবং অনুন্নত অংশটি ক্রমাগত অনুন্নত হতে থাকে। একেই Myrdal অর্থনৈতিক উন্নয়নের পশ্চাদ্গামী প্রভাব (Backwash effect) বলেছেন। এই প্রভাব অনুন্নত দেশগুলোতে অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে বাধার সৃষ্টি করেছে বলে ঋন্ত্মখত্মনে করেন।

৮. কৃষি সম্পর্কিত বাধা (Agricultural constraints) :

অধিকাংশ অনুন্নত দেশে কৃষিই প্রধান কার্য হলেও কৃষিক্ষেত্র তেমন উন্নত নয়। এখানে কৃষি উৎপাদক পুরোপুরি প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল (gamble in monsoons)। ফলে কৃষি উৎপাদন স্থিতিশীল নয়। ফলে কৃষিতে বিনিয়োগ ঘটে না। এজন্য সমগ্র অর্থনীতিই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাছাড়া, কৃষকেরা নিরক্ষর, রক্ষণশীল ও প্রাচীনপন্থী। উন্নত বীজ, সার, কৃষিপদ্ধতি তারা গ্রহণ করতে আগ্রহী নয়। ফলে কৃষিত বিশেষায়ণ ঘটে না, শ্রমের চলনশীলতা ব্যাহত হয়। এসবের ফলে অনুন্নত দেশের কৃষিতে উৎপাদনশীলতা খুবই কম। এটিও অনুন্নত দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে বড় বাধা কেননা অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটাতে গেলে অন্তত উন্নয়নের প্রাথমিক স্তরে কৃষি উৎপাদন বাড়াতেই হবে।

৯. মানব সম্পদের বাধা (Human resource constraint):

অনুন্নত দেশের মানব সম্পদও অনুন্নত। এ সমস্ত দেশে জনসংখ্যা খুব বেশি, কিন্তু পাশাপাশি দক্ষ শ্রমিকের অভাব। শ্রমিকের শিক্ষাদীক্ষার মানও উন্নত নয়। ফলে শ্রমের চলনশীলতা খুবই কম। বৃত্তিগত বিশেষায়ণও বড় একটা ঘটে না। এসবের ফলে শ্রমিকের উৎপাদনশীলতা তথা সমগ্র দেশের প্রসারের হার খুবই কম হয়।

১০. অন্যান্য বাধা (Other constraints):

এই বাধাগুলোর মধ্যে কয়েকটি হল অর্থনৈতিক, কয়েকটি রাজনৈতিক বাধা, আবার কয়েকটি সামাজিক-সাংস্কৃতিক বাধা। অর্থনৈতিক অন্যান্য বাধার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল: (i) ঝুঁকি ও উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য যথেষ্ট সংখ্যক ও উপযুক্ত মানের ব্যক্তির অভাব, (ii) দক্ষ পরিচালকের অভাব, (iii) কারিগরি জ্ঞান প্রদানকারী সংস্থার অভাব, (iv) উন্নত পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাব, (v) উন্নত ব্যাঙ্ক ও ঋণ ব্যবস্থার অভাব প্রভৃতি।

রাজনৈতিক বাধাগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল (১) স্থিতিশীল সরকারের অভাব, (i) জনগণের রাজনৈতিক চেতনার অভাব, (ii) জনগণের অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে সম্যক ধারণার অভাব, (iii) অনুকূল আইন-শৃঙ্খলা ব্যবস্থার অভাব প্রভৃতি।

সামাজিক-সাংস্কৃতিক বাধাগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল (১) শিক্ষার অভাব, (i) জাতিভেদ প্রথা, বর্ণবৈষম্য প্রভৃতি কুসংস্কারের উপস্থিতি, (ii) আত্মতৃপ্তির মনোভাব ও ভাগ্যে বিশ্বাস, (iii) কর্মবিমুখতা, (iv) ধর্মীয় ও সামাজিক উৎসবে সাধ্যের অতিরিক্ত ব্যয় প্রভৃতি।

এসমস্ত বাধার ফলে অনুন্নত দেশগুলো অনুন্নতই রয়ে যায়। উন্নয়ন ঘটাতে গেলে এসমস্ত বাধা দূর করতে হবে। Rosenstein-Rodan বলেছেন, এজন্য চাই এক বিরাট বা জোর ধাক্কা। Leibenstein বলেছেন Critical minimum effort প্রয়োজন। আর ঞ্চুন্ড্ধন্স্ত্র এবং জ্রত্রন্দ্রু্ন্ বলেছেন, কৃষিক্ষেত্রের উদ্বৃত্ত শ্রম শিল্পে নিয়োগ করে মূলধন গঠন করা প্রয়োজন।

৪.৫ ফাঁদের মডেল

৪.৫.১ স্বল্পোন্নত দেশগুলির নিম্নস্তরের ভারসাম্যের ফাঁদ- নেলসনের মডেল (Low Level Equilibrium Trap in Less Developed Countries- Nelson's Model):

স্বল্পোন্নত দেশগুলিতে যদি প্রাকৃতিক সম্পদের যথাযথ ব্যবহার করা সম্ভব হয়, বিনিয়োগের পরিমাণ বাড়ানো হয় এবং শ্রমিকদের কার্যক্ষমতা বাড়ে, তবে তার প্রভাবে দেশের আয়-বৃদ্ধিকারী শক্তিগুলি (Income-raising forces) সক্রিয় হয়। আবার যদি জনসংখ্যার চাপ অত্যধিক বেড়ে যাবার দরুন মাথাপিছু উৎপাদন ও আয় কমে যায়, মূলধনের সঞ্চয় বাড়ানো এবং প্রাকৃতিক সম্পদের যথাযথ ব্যবহার করা সম্ভব না হয়, তবে আয়-সংকোচনকারী শক্তিগুলি (income-depressing forces) সক্রিয় হয়। নেলসন (Nelson)

স্বল্পোন্নত দেশগুলির নিম্নস্তরের ভারসাম্য-বহনকারী আয় ও স্থিতিশীলতার ফাঁদ সম্পর্কে যে মডেল তৈরি করেছেন তাতে আয়-সংকোচনকারী শক্তিগুলি আয়-বৃদ্ধিকারী শক্তিগুলি অপেক্ষা অধিকতর ক্ষমতাসম্পন্ন। নেলসনের মতে স্বল্পোন্নত দেশে (১) মাথাপিছু আয়ের সঙ্গে জনসংখ্যা বৃদ্ধির বিশেষ সম্পর্ক আছে, (২) অতিরিক্ত মাথাপিছু আয় মাথাপিছু বিনিয়োগের পরিমাণ বাড়ায় না, (৩) অনাবাদী চাষের জমির স্বল্পতা পরিলক্ষিত হয়, এবং (৪) উৎপাদন পদ্ধতিও খুব অনগ্রসর ও অদক্ষ। এগুলি হল আয়- সংকোচনকারী শক্তি। পরবর্তী চিত্রে নেলসনের মডেল দেখানো হয়েছে।

এই চিত্রটির তিনটি ভাগ আছে, প্রথম ভাগে (A) অনুভূমিক অক্ষে (horizontal axis) মাথাপিছু আয় ধরা হয়েছে এবং উল্লম্ব অক্ষে (vertical axis) জনসংখ্যা বৃদ্ধির শতকরা হার ধরা হয়েছে। (বিন্দুটি হল সর্বনিম্ন স্তরে জীবনধারণের (minimum subsistence level) মাথাপিছু আয়। (বিন্দুর উপর জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার যতক্ষণ পর্যন্ত সর্বোচ্চ হারে (dp/ P) না পৌঁছেছে ততক্ষণ পর্যন্ত বেড়ে যাচ্ছে। এখানে দেখা যাচ্ছে মাথাপিছু আয় বেড়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে জনসংখ্যাও বেড়ে যাচ্ছে। কিন্তু যখন মাথাপিছু আয় OL হয়েছে তখন জনসংখ্যা বৃদ্ধির সর্বোচ্চ হার অর্জিত হয়েছে। এক্ষেত্রে মৃত্যুহার কমে যাওয়া হল জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ। (বিন্দুর বাঁদিকে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার নেতিবাচক, কারণ এক্ষেত্রে জন্মহার অপেক্ষা মৃত্যুহার বেশি। নেলসনের মডেলে জন্মহারের উপর মাথাপিছু আয়ের প্রতিক্রিয়া কী হবে তা বিবেচিত হয়নি।

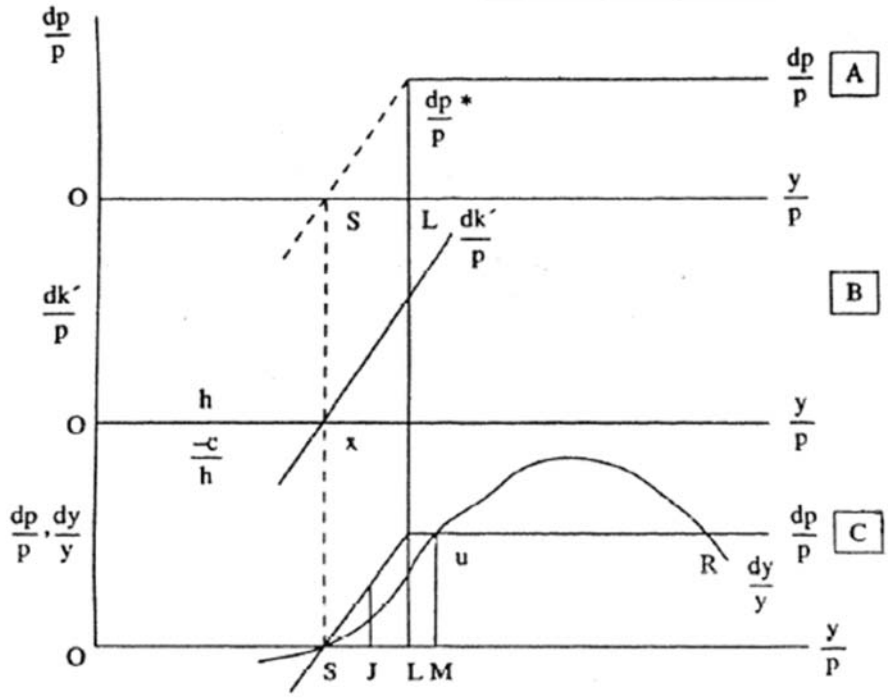

চিত্রটির দ্বিতীয় ভাগে (B) উল্লম্ব অক্ষে মাথাপিছু আয় থেকে বিভিন্ন পর্যায়ে যে সঞ্চয় সেই সঞ্চয়ের ভিত্তিতে মাথাপিছু বিনিয়োগের হার (dk / P) ধরা হয়েছে। ড় বিন্দুটি হল এমন আয় যেখানে সঞ্চয় হল শূন্য (অর্থাৎ সব আয়ই খরচ হয়ে যাচ্ছে)। আয় বেড়ে যাবার ফলে যে সঞ্চয় হয় এবং নতুন জমি যদি চাষের আওতায় আসে তবে এক্ষেত্রে মূলধন সৃষ্টি হয়। এক্ষেত্রে নতুন জমিতে চাষের দিকটি বিবেচনা না করে নতুন সঞ্চয় কতটা হচ্ছে তা বিবেচনা করা হয়েছে এবং তার ভিত্তিতেই বিনিয়োগ বাড়ছে বলে ধরা হয়েছে। X বিন্দু পর্যন্ত কোনো বিনিয়োগ হচ্ছে না-এক্ষেত্রে মাথাপিছু আয় এত অল্প যে সঞ্চিত অর্থ ব্যয় করা হচ্ছে (dissaving) অথবা বিলগ্নীকরণ (disinvestment) করা হচ্ছে; এটা h এবং X বিন্দুর মধ্যবর্তী অবস্থায় দেখানো হয়েছে। X বিন্দুর পর যে ঊর্ধ্বমুখী রেখাটি অঙ্কিত হয়েছে তাতে মাথাপিছু বিনিয়োগ বৃদ্ধির হার বোঝাচ্ছে।

চিত্রটির তৃতীয় ভাগে (C) উল্লম্ব অক্ষে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার (dp / P) এবং আয় বৃদ্ধির হার (SdyV/ y) উভয়ই ধরা হয়েছে। এখানে S = X এবং এটাই হল নিম্নস্তরের ভারসাম্যের ফাঁদ। এই ভাগে (বিন্দুতে জনসংখ্যা বৃদ্ধি রেখা (Population growth curve or dp / P curve) এবং আয় বৃদ্ধির রেখা (Income growth curve or dy/y) পরস্পরকে ছেদ করেছে। শূন্য উন্নয়ন থেকে যদি আরম্ভ করা হয় তবে দেখা যায় (থেকে। বিন্দু পর্যন্ত মাথাপিছু আয় যখন বাড়ছে, তখন মোট আয় বৃদ্ধির হার থেকে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বেশি। তার ফলে মাথাপিছু আয় আবার কমে যাবে এবং OS পর্যায়ে আসবে, এই আয় হল জীবনধারণের জন্য সর্বনিম্ন আয় (minimum subsistence level of income)। যতক্ষণ পর্যন্ত মাথাপিছু আয় ঞ্জঞ্চপর্যন্ত না বাড়ছে ততক্ষণ পর্যন্ত আয়-সংকোচনকারী শক্তি (income-depressing force) আয় বৃদ্ধিকারী শক্তি (incomeéôéraising force) অপেক্ষা বেশি ক্ষমতাসম্পন্ন (dp/p > dy/y)

যদি দেশের অর্থব্যবস্থা মাথাপিছু আয়ের পরিমাণ OM অপেক্ষা বেশি বাড়াতে পারে তবে আয়-বৃদ্ধিকারী শক্তি আয়-সংকোচনকারী শক্তি অপেক্ষা বেশি ক্ষমতাসম্পন্ন হবে এবং সংশ্লিষ্ট দেশটি নিম্নপর্যায়ের ভারসাম্যের ফাঁদ থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে। বিনিয়োগ বৃদ্ধির ওপর আয়-বৃদ্ধিকারী শক্তিগুলি নির্ভরশীল। শ্রমিকদের মাথাপিছু উৎপাদনী শক্তির বৃদ্ধি এবং উৎপাদনের ক্ষেত্রে উন্নত কলাকৌশল প্রয়োগ আয়-বৃদ্ধিকারী শক্তি হিসাবে বিবেচিত হয়। এই চিত্রে ডড থেকে ট্ট পর্যন্ত আয়-বৃদ্ধিকারী শক্তির প্রভাব বেশি।

স্বল্পোন্নত দেশগুলির অনতম বড় সমস্যা হল জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার প্রতিহত করা। যদি জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার প্রতিহত করা যায় এবং দেশের মোট উৎপাদন ও আয় বাড়ানো যায় তবে মাথাপিছু আয় বাড়বে এবং স্বল্পোন্নত দেশের পক্ষে অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথেই এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে। স্বল্পোন্নত দেশের আরেকটি বড় সমস্যা হল দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র থেকে বেরিয়ে আসার পথ খোঁজা।

৪.৫.২ সর্বনিম্ন গুরুত্বপূর্ণ বিনিয়োগ প্রচেষ্টা সম্পর্কে লিবেনষ্টিনের মডেল (Leibensteinós Model of Critical Minimum Effort):

লিবেনষ্টিন তাঁর মডেলে দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র থেকে উদ্ভুত অবস্থা এবং কীভাবে সর্বনিম্নস্তরে ভারসাম্যের ফাঁদ থেকে বেরিয়ে আসা যায় সে সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। আয়-সংকোচনকারী শক্তি এবং আয়-বৃদ্ধিকারী

শক্তি কীভাবে একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ভূমিকা গ্রহণ করে তা আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে যদি আয়-সংকোচনকারী শক্তিগুলি (income depressing forces) আয়-বৃদ্ধিকারী শক্তি (income raising forces) অপেক্ষা বেশি ক্ষমতাশালী হয় তবে স্বল্পোন্নত দেশগুলিতে উন্নয়নের স্তর খুব নীচু থাকে।

লিবেনষ্টিনের মতে আয়-সংকোচনকারী শক্তিগুলির একটি সর্বোচ্চ সীমা থাকবে, কিন্তু আয়-বৃদ্ধিকারী শক্তিগুলির সর্বোচ্চ সীমা থাকতেও পারে, না-ও থাকতে পারে। যদি আয়-বৃদ্ধিকারী শক্তিগুলির সর্বোচ্চ সীমা থাকে, তবে সেই সীমা আয়-সংকোচনকারী শক্তিগুলির সর্বোচ্চ সীমার উপরে থাকবে। এখন প্রশ্ন হল, কতটা সর্বনিম্ন বিনিয়োগ করলে আয়-বৃদ্ধিকারী শক্তিগুলিকে আয়-সংকোচনকারী শক্তিগুলির সর্বোচ্চ সীমার উপর রাখা যাবে। লিবেনষ্টিনের গুরুত্বপূর্ণ সর্বনিম্ন প্রচেষ্টা (critical minimum effort) তত্ত্ব অনুযায়ী সেই পরিমাণ বিনিয়োগের দরকার যার ফলে মাথাপিছু আয় এমন একটি স্তরে পৌঁছে যাবে যার পরে মাথাপিছু আয় আর বাড়লেও আয়-সংকোচনকারী শক্তিগুলি আয়-বৃদ্ধিকারী শক্তিগুলি অপেক্ষা বেশি ক্ষমতাসম্পন্ন হবে না। লিবেনষ্টিনের এই তত্ত্বটি নিম্নের চিত্রে দেখানো হয়েছে।

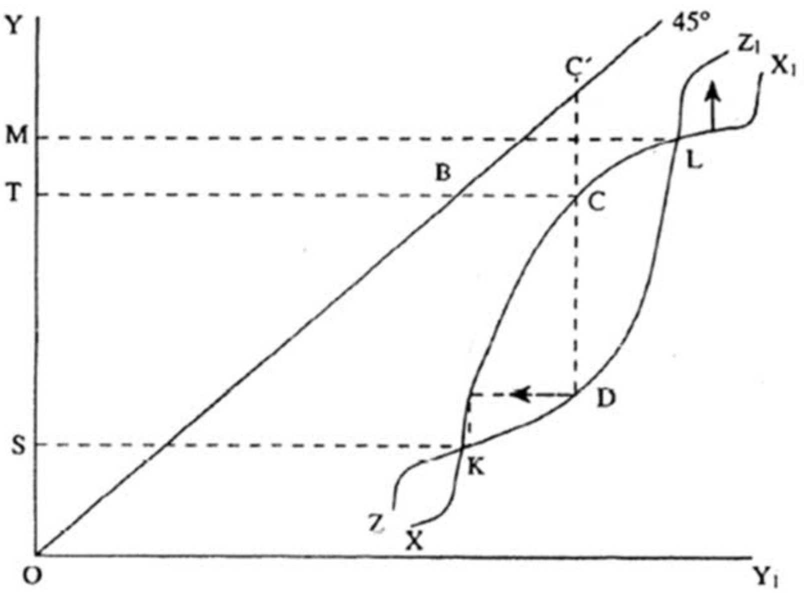

এই চিত্রের উল্লম্ব রেখায় (OY) মাথাপিছু আয় এবং প্রণোদিত আয়-হ্রাস (Per Capita income and induced income decline) দেখানো হয়েছে এবং অনুভূমিক রেখায় (OY1) মাথাপিছু আয় এবং প্রণোদিত আয়-বৃদ্ধি (per capita income and induced income growth) দেখানো হয়েছে।

চিত্রে রেখা XX1 আয়-বৃদ্ধিকারী প্রভাব এবং ZZ1রেখা আয়-সংকোচনকারী প্রভাব বোঝাচ্ছে। এই চিত্রে বিভিন্ন মাথাপিছু আয়ের ক্ষেত্রে XX1 রেখা এবং ৪৫ ডিগ্রি রেখার মধ্যে অনুভূমিক দূরত্ব (horizontal distance) হল আয়-বৃদ্ধিকারী শক্তির পরিমাপক। অপরদিকে ZZ1 রেখা এবং ৪৫ ডিগ্রি রেখার মধ্যে

উল্লম্ব দূরত্ব (vertical distance) হল বিভিন্ন মাথাপিছু আয়ের ক্ষেত্রে আয়-সংকোচনকারী শক্তির পরিমাপক। O আয়ে BC (= C C') হল আয়-বৃদ্ধিকারী শক্তি এবং C'D (এক্ষেত্রে C C' < C' D) হল আয়-সংকোচনকারী শক্তির পরিমাপক। K বিন্দুতে XX1 রেখা এবং ZZ1রেখা পরস্পরকে ছেদ করেছে। এখানে K বিন্দু বা জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় আয়ের (subsistence income level) সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। K বিন্দুর পর XX 1 রেখা ZZ1 রেখার উপরে আছে; অর্থাৎ, K বিন্দুর পর আয়-বৃদ্ধিকারী প্রভাব আয়-সংকোচনকারী প্রভাব অপেক্ষা বেশি ক্ষমতাশালী। এই দুটি রেখা আবার L বিন্দুতে ছেদ করেছে। L বিন্দুতে মাথাপিছু আয়ের পরিমাণ হল OM এবং এক্ষেত্রে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি উঁচু পর্যায়ে স্থায়ী হয়েছে। সুতরাং L বিন্দুতে পৌঁছতে গেলে জ্ঞ বিন্দু পৌঁছবার পর থেকে যথেষ্ট পরিমাণে বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। K বিন্দুর পর বিনিয়োগ বাড়ার প্রচেষ্টা না থাকলে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন করা সম্ভব হয় না। এজন্য প্রয়োজন হলে বৈদেশিক সাহায্যও গ্রহণ করা যেতে পারে। কারণ দেশের আভ্যন্তরীণ সঞ্চয় ও মূলধন সৃষ্টির হার খুব কম থাকলে এবং মূলধন উৎপাদন অনুপাত বেশি থাকলে বৈদেশিক বিনিয়োগের সাহায্য ছাড়া নিম্নস্তরের ভারসাম্যের ফাঁদ (Low Level Equilibrium Trap) থেকে বেরিয়ে আসা সম্ভব নয়।

লিবেনষ্টিনের মডেলের ভিত্তিতে বলা যায় স্বল্পোন্নত দেশের পক্ষে নিম্নস্তরের ভারসাম্যের ফাঁদ থেকে বেরিয়ে আসতে হলে বৈদেশিক সাহায্য ও বৈদেশিক বিনিয়োগের উপর নির্ভর না করা ছাড়া অন্য উপায় থাকে না। কারণ স্বল্প মূলধন ও স্বল্প মূলধন সৃষ্টির হার এবং বিনিয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় মূলধনের অভাব, উপযুক্ত প্রযুক্তি ও শ্রমিকদের কারিগরি দক্ষতার অভাব, স্বল্পোন্নত দেশকে বিদেশি সাহায্যের উপর নির্ভরশীল করে তোলে। যেহেতু দেশের ভিতর বিনিয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় সঞ্চয়ের অভাব, সেজন্য সঞ্চয়-বিনিয়োগের ফাঁক (Saving-Investment Gap) দূর করার জন্য বিদেশি বিনিয়োগের প্রয়োজন হয়। বিদেশি বিনিয়োগ বাড়লে তার প্রভাবে দেশের ভিতর উৎপাদন ও কর্মনিয়োগ বেড়ে যেতে পারে এবং তার ফলে জনপ্রতি আয় এবং প্রণোদিত আয়ের বৃদ্ধি হতে পারে। স্বল্পোন্নত দেশে বৈদেশিক বাণিজ্যে যে ভারসাম্যের অভাব পরিলক্ষিত হয় এবং যে বৈদেশিক মুদ্রাসংকট পরিলক্ষিত হয় তার মোকাবিলা করা এবং সেই সঙ্গে দেশের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখার সমস্যা সমাধান করা-উভয় উদ্দেশ্যেই অর্থনীতির কাঠামোগত সামঞ্জস্য (structural adjustment) অর্জন করা জরুরি প্রয়োজন হিসাবে বিবেচিত হয়। এজন্য স্বল্পোন্নত দেশগুলিকে আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার (International Monetary Fund) এবং বিশ্বব্যাংকের (World Bank) সাহায্যের উপর নির্ভর করতে হয়। প্রতিযোগিতামূলক বিশ্ব-বাজারে টিকে থাকতে হলে স্বল্পোন্নত দেশকে বিনিয়োগ বাড়াতে হবে এবং উন্নতমানের রপ্তানি-দ্রব্য উৎপাদন করতে হবে। এজন্যও বিদেশ থেকে সাহায্যের প্রয়োজন হয়। বৈদেশিক বিনিয়োগ এবং বৈদেশিক সাহায্য স্বল্পোন্নত দেশকে শিল্পায়নের পথে নিয়ে যেতে পারে এবং নিম্নস্তরের ভারসাম্যের ফাঁদ থেকে স্বল্পোন্নত দেশকে বের করে আনতে পারে।

৪.৫.৩. দারিদ্র্যের দুষ্টচক্রের । ধারনা

দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র (Vicious Circle of Poverty):

তাঁর সুবিখ্যাত "Problems of Capital Formation" গ্রন্থে দারিদ্র্যের দুষ্টচক্রের ধারণাটি ব্যাখ্যা করেন। স্বল্পোন্নত বা অনুন্নত দেশে অনুন্নতির স্থায়িত্ব (persistence) ব্যাখ্যা করতে নার্কস এই ধারণাটির

অবতারণা করেন। দারিদ্র্যের দুষ্টচক্রের ধারণাটির মূল কথা হল একটি দেশ দরিদ্র কারণ তার মূলধন কম, আর মূলধন কম কারণ দেশটি দরিদ্র। (A country is poor because it has little capital, and it cannot raise capital because it is poor)। সেজন্য অনেক সময় হাল্কাভাবে ধারণাটিকে এরূপভাবে ব্যক্ত করা হয় একটি দেশ দরিদ্র কারণ সে দরিদ্র। (A country is poor as it is poor)। নার্কসের মতে, অনুন্নত দেশে একটি দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র কাজ করে এবং এই দুষ্টচক্রই দেশটিকে দরিদ্র বা অনুন্নত করে রাখে অর্থাৎ যেন বলা হচ্ছে,

দারিদ্র্যই দারিদ্র্যের কারণ। তাই 'দুষ্টচক্র' কথাটি ব্যবহৃত হয়েছে। দারিদ্র্যের দুষ্টচক্রের ধারণাটি দুটি চিত্রের (চিত্র ৪.১ ও চিত্র৪.২) সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যায়। নার্কসের মতে, মূলধনের চাহিদা ও মূলধনের জোগান উভয় দিক হতেই একটি চক্রাকার বা বৃত্তাকার শক্তি কাজ করে। মূলধনের চাহিদা ও জোগান উভয় দিক হতেই দুষ্টচক্রের ধারণাটিকে ব্যাখ্যা করা যায়। মূলধনের জোগানের (চিত্র৪.১) দিক থেকে দেখতে গেলে, অনুন্নত দেশে মূলধনের জোগান কম কারণ সঞ্চয় কম। আর সঞ্চয় কম কারণ আয় কম। আয় কম হবার কারণ হল কম উৎপাদনশীলতা। কম উৎপাদনশীলতার কারণ হল শ্রমিকের মাথাপিছু মূলধন কম। আর মাথাপিছু মূলধন কম হবার কারণ হল মূলধনের কম জোগান। এভাবে মূলধনের জোগানের দিক হতে বৃত্তটি সম্পূর্ণ। বৃত্তটির পরিধির দুই প্রান্তবিন্দু একটি বিন্দুতে এসে মিলিত হয়। অধ্যাপক Hicks মন্তব্য করেছেন: "The snake eats its own tail”

মূলধনের চাহিদার দিক হতেও বৃত্তটি সম্পূর্ণ (চিত্র ৪.২)। অনুন্নত দেশে মূলধনের চাহিদা কম কারণ এখানে উৎপাদকদের বিনিয়োগ করার প্রবণতা কম। আর বিনিয়োগ প্রবণতা কম কারণ অভ্যন্তরীণ বাজার সংকীর্ণ। দ্রব্যসামগ্রীর বাজার বা চাহিদা নেই কারণ লোকের ক্রয়ক্ষমতা কম। আর লোকের ক্রয়ক্ষমতা কম কারণ তাদের উৎপাদনশীলতা কম। উৎপাদনশীলতা কম হবার কারণ হল শ্রমিকপিছু মূলধনের ব্যবহার বা চাহিদা কম। এভাবে মূলধনের চাহিদার দিক হতেও বৃত্তটি সম্পূর্ণ।

এ প্রসঙ্গে একটি প্রশ্ন উঠতে পারে। অনুন্নত দেশে মূলধনের চাহিদা কম, এই কথাটি আপাতবিরোধী মনে হতে পারে। আমরা জানি, অনুন্নত দেশে মূলধনের অভাব অর্থাৎ এখানে মূলধনের জোগানের তুলনায় চাহিদা বেশি। কিন্তু নার্কসের যুক্তি হল, অনুন্নত দেশে লোকের ক্রয়ক্ষমতা কম। ফলে এখানে অভ্যন্তরীণ বাজার সীমিত। ফলে উদ্যোক্তাদের বিনিয়োগ প্রবণতা কম কারণ তাদের বিনিয়োগ করার

ইচ্ছা বাজারের আয়তন বা বিস্তৃতির দ্বারা সীমাবদ্ধ। তাই এরূপ দেশে মূলধনের জোগান যেমন কম, চাহিদাও কম। উভয় কারণেই বৃত্তটি সম্পূর্ণ। এভাবে, নার্কসের ভাষায়, দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র হল এমন কতকগুলো শক্তির একত্র সমাবেশ যারা

একে অপরের সঙ্গে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে একটি দরিদ্র দেশকে দারিদ্র্যের মধ্যে আবদ্ধ রাখে (A vicious circle of poverty is the circular constellation of forces tending to act and react upon one another so as to keep a poor country in a state of poverty)

অধ্যাপক Meier এবং অধ্যাপক Baldwin দারিদ্র্যের দুষ্টচক্রের ধারণাটিকে আরও একভাবে বর্ণনা করেছেন। তাঁদের মতে, বাজারের অপূর্ণতা, অনুন্নত প্রাকৃতিক সম্পদ ও দেশের জনসাধারণের পশ্চাদ্গামী মনোভাব একটি দেশকে দারিদ্র্যের দুষ্টচক্রের আবর্তে নিক্ষেপ করতে পারে। পাশের ছকের সাহায্যে আমরা এটি দেখিয়েছি। এই তিনটি বিষয় একে অপরকে পুষ্ট করে। এর ফলে একটি দরিদ্র দেশ দারিদ্র্যের ফাঁদে আটকে থাকে।

কীভাবে এই দুষ্টচক্র ভাঙা যাবে? (How to break this Vicious CircleÚ)

এখন প্রশ্ন হল, কীভাবে এই দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র ভাঙা যাবে? অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূল কথা হল এই দুষ্টচক্রকে কোনো না কোনো বিন্দুতে ছেদ করা। নার্কস মনে করেন যে, এই দুষ্টচক্রকে ভাঙা সম্ভব। তাঁর মতে, এই দুষ্টচক্র ভাঙতে হলে বাজার প্রসারিত করতে হবে। তাহলে প্রশ্ন হল, একটি অনুন্নত দেশের বাজার

কীভাবে প্রসারিত করা যাবে? যেহেতু একটি স্বল্পোন্নত দেশের পক্ষে বিদেশের বাজার দখল করা খুবই কঠিন, তাই অভ্যন্তরীণ বাজার প্রসারিত করতে হবে। এজন্য অর্থনীতির সমস্ত ক্ষেত্রে উৎপাদনশীলতা বাড়াতে হবে। নার্কসের মতে, এর জন্য প্রয়োজন দেশটির সমস্ত প্রধান ক্ষেত্রে বিনিয়োগ বাড়ানো। শুধুমাত্র একটি শিল্পে বিনিয়োগ বাড়ালে ঐ শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকদের আয় বাড়বে এবং ঐ শিল্পের উৎপাদন বাড়বে। কিন্তু ঐ বর্ধিত উৎপাদনের সবটাই বিক্রি হবে না কারণ কেবলমাত্র ঐ শিল্পে নিযুক্ত লোকেদের আয় বেড়েছে। তারা তাদের বর্ধিত আয়ের সবটাই ঐ শিল্পে উৎপাদিত দ্রব্যে ব্যয় করবে না। ফলে দেখা দেবে অতিরিক্ত জোগানের সমস্যা। তাই নার্কসের মতে, সমস্ত প্রধান শিল্পে একযোগে বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। তাহলে একের জোগান অপরের চাহিদার দ্বারা নিঃশেষিত হবে। স্পষ্টতই এক্ষেত্রে নার্কসের যুক্তির ভিত্তি হল (থা'ন্স জ্রথন্দ্র যার মূলকথা হল ‘‘Supply creates its own demand”, কিন্তু সমস্ত প্রধান শিল্পে বিনিয়োগ বাড়াতে হলে চাই বিপুল পরিমাণ মূলধন। সেই মূলধন কোথা থেকে আসবে? নার্কসের তত্ত্বে তার উত্তর পাওয়া যায় না। নার্কস বলেছেন, মূলধন কোথা থেকে আসবে সেটি মূলধনের জোগানের প্রশ্ন এবং সেটিকে ভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনা করতে হবে। আর একটি বিষয় উল্লেখ করা যেতে পারে। দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র ভাঙতে নার্কস দেশীয় বাজার প্রসারিত করতে এবং উৎপাদনশীলতা বাড়াতে বলেছেন। এর জন্য তিনি সমস্ত প্রধান শিল্পে একসঙ্গে বিনিয়োগ করতে বলেছেন। একযোগে সমস্ত প্রধান শিল্পে বিনিয়োগের দ্বারা উন্নয়নের এই কৌশলকে এক কথায় বলা হয় সুষম উন্নয়ন কৌশল। নার্কস এই সুষম উন্নয়ন কৌশলের অন্যতম প্রবক্তা। দেখা যাচ্ছে যে, নার্কস সুষম উন্নয়ন কৌশলকে দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র ভাঙার কৌশল বা শক্তি হিসেবে দেখেছেন।

কিন্তু Hirschman এবং Singer মনে করেন যে, দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র একটি অনুন্নত দেশের যে অনড়তা নির্দেশ করে তা ভাঙতে হলে অসম উন্নয়ন কৌশল গ্রহণ করা প্রয়োজন। তাঁদের যুক্তি, বিনিয়োগের জন্য কিছু শিল্পকে নির্বাচন করতে হবে। তাহলে উৎসাহ ও উদ্দীপনা বেশি তৈরি হবে। আবার, দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র ভাঙার জন্য Rosenstein-Rodan জোর ধাক্কা দেওয়ার কথা বলেছেন। আর অনুন্নত দেশের অর্থনীতিকে স্বয়ংচালিত উন্নয়নের পথে টেনে তুলতে গেলে একটা একান্ত প্রয়োজনীয় সর্বনিম্ন প্রচেষ্টা প্রয়োজন বলে Leibenstein মনে করেন।

আবার মূলধনের জোগানের দিক হতেও দারিদ্র্যের দুষ্টচক্রটি ভাঙা যেতে পারে। এর জন্য প্রয়োজন সঞ্চয়ের হার বৃদ্ধি করা। দেশে সমস্ত রকমের অপচয় বন্ধ করতে হবে এবং অপ্রয়োজনীয় ব্যয় কমাতে হবে। তবেই সঞ্চয়ের হার বাড়বে। তাছাড়া বিভিন্ন উৎসাহ প্রদানের মাধ্যমেও সঞ্চয়ের অনুপ্রেরণা বাড়ানো যেতে পারে। এছাড়া অনুন্নত দেশের কৃষিক্ষেত্রের প্রচ্ছন্ন বেকারি সুপ্ত সঞ্চয় হিসাবে বিরাজ করে। যদি এই প্রচ্ছন্ন বেকারদের মূলধন প্রকল্পে নিয়োগ করা সম্ভব হয়, তাহলেও মূলধন গঠনের হার বা সঞ্চয়ের হার বাড়বে। নার্কস এবং লুইস আলাদা আলাদাভাবে এরূপ মূলধন গঠনের কথা বলেছেন।

সবশেষে দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র ভাঙতে হলে এর বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ ও সামনাসামনি আঘাত হানা প্রয়োজন। মূলধনের জোগান ও মূলধনের চাহিদা বৃদ্ধির পথে যে সমস্ত বাধা বা অন্তরায় আছে, সেগুলো কার্যকরীভাবে

দূর করতে হবে। এর জন্য প্রয়োজন অর্থনৈতিক কাজকর্মে সরকারের প্রত্যক্ষভাবে অংশ গ্রহণ করা এবং ঐ সমস্ত কাজকর্ম পরিচালনা করা।

৪.৫.৪ দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র ধারণাটির সীমাবদ্ধতা (Limitations)

দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র ধারণাটির কয়েকটি সীমাবদ্ধতা আছে।

প্রথমত, দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র অনুন্নতির কারণ হিসাবে মূলধনের অভাবকে দায়ী করেছে। কিন্তু অনুন্নতির পিছনে এটা অন্যতম প্রধান কারণ হলেও একমাত্র কারণ নয়। প্রাকৃতিক সম্পদের অপ্রতুলতা, কারিগরি জ্ঞানের অভাব, সাম্রাজ্যবাদী শোষণ, উদ্যমের অভাব ইত্যাদি কারণেও একটি দেশ অনুন্নত থাকতে পারে।

দ্বিতীয়ত, Nurkse দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র ভাঙার জন্য সুষম উন্নয়ন কৌশল গ্রহণ করার সুপারিশ করেছেন। কিন্তু Hirschman এবং Singer মনে করেন যে, অনুন্নত দেশের প্রাথমিক অচলতা ও অনড়তা (initial deadlock) কাটাতে গেলে অসম উন্নয়ন কৌশল গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়।

তৃতীয়ত, দুষ্টচক্র তত্ত্বের মূল যুক্তিকে (নিম্ন আয়ের জন্যই নিম্ন আয় বা দারিদ্র্যই দারিদ্র্যের কারণ) যদি সত্য বলে ধরা হয়, তাহলে বিশ্বের পূর্বতন কিছু দরিদ্র দেশ বর্তমানে উন্নত দেশরূপে আত্মপ্রকাশ করত না।

চতুর্থত, দুষ্টচক্র তত্ত্বে ধরা হয়েছে যে, অনুন্নত দেশে সঞ্চয় বলতে বিশেষ কিছু হয় না। আর এজন্যই এই দেশগুলো অনুন্নত। পরিসংখ্যান কিন্তু অন্য কথা বলে। অনুন্নত দেশেও সঞ্চয়ের পরিমাণ বরাবরই যথেষ্ট বেশি ছিল, অন্তত সঞ্চয় যতটা কম বলে মনে করা হয়, ততটা কম নয়। যেমন, সঞ্চয় যদি না হত, তাহলে ভারতে তাজমহলের ন্যায় সৌধ এবং আরও অসংখ্য দূর্গ ও মন্দির তৈরি হত না, মিশরে পিরামিড তৈরি হত না। এগুলোর অস্তিত্ব প্রমাণ করে যে, সে যুগেও উদ্বৃত্ত বা সঞ্চয় যথেষ্ট পরিমাণে ছিল। বর্তমানেও অনেক অনুন্নত দেশে সঞ্চয়ের হার যথেষ্ট বেশি। সমস্যা সঞ্চয়ের অপ্রতুলতার নয়, সমস্যা হল সঞ্চয়ের উপযুক্ত ব্যবহারের। রিকার্ডোর মতে, সঞ্চয় সৃষ্টিকারী শ্রেণির নিকট হতে উদ্বৃত্ত বা সঞ্চয় নিঃসরণ করতে না পারা এবং তা উপযুক্তভাবে ব্যবহার করতে না পারাই হল পশ্চাদ্গামিতার (backwardness) মূল কারণ।

পঞ্চমত, দারিদ্র্যের দুষ্টচক্রে অনুন্নতির কারণ হিসেবে যেগুলো দেখানো হয়েছে তার অনেকগুলিই একই সঙ্গে দারিদ্র্যের কারণ ও ফল। যেমন, কোনো ব্যক্তির উৎপাদনশীলতা কম হলে সে দরিদ্র। আবার দরিদ্র বলেই তার সুস্বাস্থ্য এবং উপযুক্ত শিক্ষার অভাবের দরুন উৎপাদনশীলতা কম। এক্ষেত্রে কম উৎপাদনশীলতা একই সঙ্গে দারিদ্র্যের কারণ ও ফল। Higgins তাই বলেছেন যে, অনুন্নতির কারণ উল্লেখ করার ক্ষেত্রে দুষ্টচক্র তত্ত্বে 'Egg and Hen' জাতীয় সমস্যা (অর্থাৎ ডিম আগে না মুরগি আগে?) রয়েছে।

ষষ্ঠত, Leibenstein মনে করেন যে, দুষ্টচক্র তত্ত্বে দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র কীভাবে ভাঙা যাবে তার সদুত্তর নেই। দুষ্টচক্র ভাঙতে গেলে সঞ্চয় উৎসাহিত করতে হবে, সরকারি বিনিয়োগ পরিকল্পিত ভাবে ব্যবহার করতে হবে, উপযুক্ত কৌশল ও ক্ষেত্র নির্বাচন করে সেখানে বিনিয়োগ বাড়াতে হবে প্রভৃতি।

সপ্তমত, Nelson মনে করেন যে, স্বল্পোন্নত দেশের অনুন্নতির একটা বড় কারণ হল জনসংখ্যার চাপ।

জনসংখ্যার উচ্চ হারে বৃদ্ধির দরুনই এ সমস্ত দেশে মাথাপিছু আয় তথা জীবনযাত্রার মান বাড়ছে না। দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র তত্ত্বে এই জনসংখ্যার সমস্যার উপর কোনো আলোকপাত করা হয়নি।

উপসংহারে বলা যেতে পারে যে, এ সমস্ত সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র তত্ত্বটি গুরুত্বপূর্ণ। এই তত্ত্বে নিম্ন আয়ের কারণ হিসাবে সঞ্চয় ও বিনিয়োগের অপ্রতুলতার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। সন্দেহ নেই, অনুন্নতির পিছনে এগুলো অন্যতম প্রধান কারণ। অবশ্য বিশ্বের স্বল্পোন্নত দেশগুলোর মধ্যে নানা বিষয়ে পার্থক্য রয়েছে, তারা কখনোই এক জাতীয় নয়। ফলে অনুন্নতির বৈশিষ্ট্য এবং তাদের আপেক্ষিক গুরুত্ব দেশে দেশে ভিন্ন। তাই অনুন্নতির কারণ হিসাবে কোনো 'সাধারণ বিষয়' (common factor) উল্লেখ করা সম্ভব নয়। দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র তত্ত্বে অনুন্নতির কারণ হিসাবে মূলধনের অভাবকেই দায়ী করা হয়েছে। অন্যান্য বিষয় এখানে কিছুটা উপেক্ষিত। সেদিক থেকে বিচার করে এই তত্ত্বটিকে কিছুটা একপেশে (one-sided) বলে অনেকে মনে করেন।

৪.৬ ক্রমযৌগিক কারণের পদ্ধতি

আঞ্চলিক উন্নয়নের পদ্ধতির শুরুর বিষয়টি অধিকাংশ উন্নয়ন অর্থনীতিবিদের কাছে এখন খুব একটা পরিষ্কার নয়। পেরক্স (Perroux) এবং বউডভেলি (Boudeville's) আঞ্চলিক উন্নয়ন তত্বের বিষয়টি র ধারনা তাদের উন্নয়ন মেরু তত্ত্বের (Growth Pole Theory) মাধ্যমে ব্যাখ্যা করেন। একি রকমভাবে গুনার মিরদাল তার ক্রমযৌগিক কারণ তত্ত্বের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করেন আঞ্চলিক উন্নয়নের পদ্ধতিটি। গুন্নার মিরদাল স্টকহোম বিশ্ববিদ্যালয় এর পলিটিকাল ইকোনমির অধ্যাপক ছিলেন, তাঁর ধারনা ছিল আর্থিক শ্রীবৃদ্ধির প্রভাবের বণ্টন সমাজের সর্বক্ষেত্রে সুষম হয়না। অর্থাৎ গুনার মিরদাল এর মতে অর্থনৈতিক শ্রীবৃদ্ধি সুসম নয়, তার মানে আর্থিক শ্রীবৃদ্ধি ভৌগোলিক অঞ্চল ভেদে তারতম্য থাকে। সুবিধাজনক অঞ্চলে আর্থিক শ্রীবৃদ্ধির কেন্দ্রীভাবন লক্ষ্য করা যায়। আর্থিক শ্রীবৃদ্ধির প্রক্রিয়ার ফলে উন্নত অঞ্চল গুলির আর্থিক ভাবে অগ্রসর মানুষের উন্নয়ন এর বৃদ্ধি পেতে থাকে অন্যদিকে অনগ্রসর অঞ্চলের আর্থিক অবস্থা খারাপ হতে থাকে। উন্নত অঞ্চল গুলির আর্থিক ভাবে অগ্রসর শ্রেণী নিজেদের মধ্যে সমঝোতার মাধ্যমে দরকষাকষির ফলে বিনিময় হার তাদের পক্ষে রাখে ফলে আর্থিকভাবে অগ্রসর শ্রেণী তাদের আয়ের হার কে উর্ধমুখী রাখে আর দরিদ্ররা তাদের পরিষেবার ন্যায্য মূল্য পায়না। বিষয়টি আর একটু পরিষ্কার করা যাক মিরদালের ক্রমযৌগিক কারণ তত্ত্বটির মূল কারণ হোল ভৌগলিক বা আঞ্চলিক দ্বৈত্যবাদ , শক্তিশালী পশ্চাৎ প্রতিক্রিয়া (Back wash effect) ও দূর্বল প্রসার প্রতিক্রিয়ার (Spread effect)। এই ক্রিয়া যুগলের ঘাত-প্রতিঘাতে অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া ক্রিয়াশীল থাকে। বিষয়টা একটু খতিয়ে দেখা যাক, মনে করি একটি অনুন্নত দেশের সমস্ত অঞ্চলগুলি সমভাবে অনুন্নত অবস্থায় আছে যা প্রতিফলিত হচ্ছে সমান মাথাপিছু আয় অথবা একই কাজে শ্রমের সমদক্ষতা বা সমান উৎপাদনশীলতা এবং সমান মজুরির হার থেকে। এই ক্ষেত্রে কোন বাহ্যিক বা আভ্যন্তরীণ কারণ উদ্দীপকের কাজ করে অঞ্চলগুলির মধ্যে যে ভারসাম্য ছিল তা নষ্ট করে দেয়। এরফলে সুবিধা প্রাপ্ত বিশেষ অঞ্চল আপেক্ষিকভাবে অন্য অঞ্চলটির থেকে এগিয়ে যায় উন্নয়নের দৃষ্টিকোণ থেকে। মিরদালের মতে আর্থিক ও সামাজিক বিষয়গুলি উদ্দীপকের চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করে আঞ্চলিক

বৈষম্যের সৃষ্টি করে, আঞ্চলিক ভারসাম্য নষ্ট করে দিয়ে। ক্রমযৌগিক কারণে সুবিধাপ্রাপ্ত অঞ্চলটির আপেক্ষিক আর্থিক অগ্রগতির প্রক্রিয়া ক্রিয়াশীল থাকে। এবং অন্য অঞ্চলটির তুলনামূলক অগ্রগতির কমে যায়, অন্তত ঐ সুবিধা প্রাপ্ত অঞ্চলটিকে ছাড়িয়ে যেতে পারেনা কখনো। নিম্নের চিত্রের সাহায্যে বিষয়টি একটু পরিষ্কার করে বুঝে নেওয়া যাক । মনে করে নেওয়া যাক একটি অনুন্নত দেশে দুইটি অঞ্চল A এবং B, মনে করা যাক A অঞ্চলে মজুরির হার হচ্ছে - WA আর B অঞ্চলে মজুরির হার হচ্ছে WB, প্রাথমিক ভারসাম্য অবস্থায় মজুরির হার দুটি সমান ছিল অর্থাৎ WA = WB. । এখন ধরা যাক কোন বাহ্যিক বা আভ্যন্তরীণ উদ্দীপকের ক্রিয়াশীলতার কারণে A অঞ্চলে শ্রমের চাহিদা রেখা DA সরণ ঘটার ফলে শ্রমের অতিরিক্ত চাহিদা জনিত কারণে মজুরির হার বৃদ্ধি পেয়ে WA, এ পৌছুলো, এর ফলে B অঞ্চলে শ্রমের অভিগমন (Migration) A অঞ্চলে শুরু হোল যার প্রভাবে B অঞ্চলে শ্রমের যোগান কমবে আর A অঞ্চলে শ্রমের যোগান বাড়বে যার প্রভাবে A অঞ্চলে মজুরির হার কমতে থাকবে আর B অঞ্চলে মজুরির হার বাড়তে থেকে প্রাথমিক ভাবে সমতার দিকে যেতে থাকবে কিন্তু ক্রমযৌগিক কারণ তত্ত্ব অনুসরণ করে B অঞ্চল থেকে অভিগমনের ফলে B অঞ্চলে দ্রব্য ও পরিষেবা এবং উৎপাদনের উপকরণের চাহিদা হ্রাস পেতে থাকবে। অন্যদিকে ঠিক বিপরীত কারণে A অঞ্চলে দ্রব্য, পরিষেবা এবং উপকরণের চাহিদা বৃদ্ধির সাথে সাথে শ্রমের চাহিদাও বৃদ্ধি পেয়ে ডানদিকে সরে আসবে D2 এর ফলে A অঞ্চলে মজুরির হার বৃদ্ধি পেতে থাকবে এর ফলে আগের মজুরির আঞ্চলিক তারতম্য অন্তত কমবে না, এমনকি বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে।

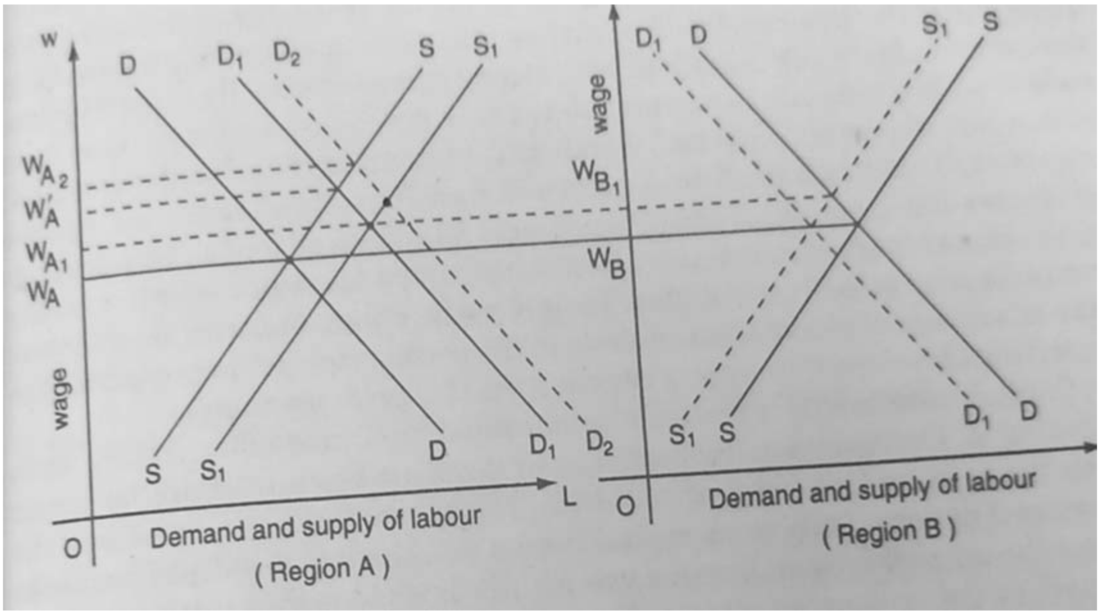

একই রকম ভাবে মূলধন ও উন্নত অঞ্চলে ধাবমান হবে যেখানে চাহিদার প্লবতা থাকবে। অর্থাৎ B অঞ্চল থেকে A অঞ্চলের দিকে। স্বাভাবিক ভাবে বাণিজ্যের সুবিধা ঐ একি অঞ্চলে কেন্দ্রীভূত হবে। যদি

ক্রম- বর্দ্ধমান প্রতিদানের বিধি কার্য্যকর থাকে তবে সে ক্ষেত্রে সুবিধাপ্রাপ্ত অঞ্চলে কম উৎপাদন ব্যয়ে অধিক উৎপাদনের পরিবেশ উপভোগ করবে উন্নয়নের প্রতিযোগিতায় বাড়তি সুবিধা ভোগ করবে এর ফলে উন্নয়নের মাত্রার তারতম্যও অব্যাহত থাকবে।

এই আঞ্চলিক বৈষম্য যদি কমিয়ে আনতে হয় সেখানে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের প্রয়োজন হয়ে পড়ে, কোন স্বয়ংক্রিয় প্রক্রিয়া নেই যার ফলে এই আঞ্চলিক বৈষম্য হ্রাস পেতে থাকবে। মিরদাল লক্ষ্য করেছেন অনুন্নত দেশগুলির সরকার এই আঞ্চলিক বৈষম্য নিরসনের জন্য বিশেষ বা নির্দিষ্ট নীতি গ্রহণ করেছে, গোটা বিষয়টি মুক্ত বাজার প্রক্রিয়ার (Lassez-faire) ওপর ছেড়ে দিয়ে থাকে আঞ্চলিক বৈষম্য নিরসনের জন্য, ফলে আঞ্চলিক বৈষম্য অব্যাহত থেকেছে এই ক্রমযৌগিক কারণ এর উপস্থিতিতে। এছাড়াও লক্ষ্য করা গেছে যে এই আঞ্চলিক বা ভৌগলিক বৈষম্যের একটা বড় কারণ সামন্ততান্ত্রিক ও বৈষম্যমূলক প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার উপস্থিতি। এদের উপস্থিতিতে ধনীদের দরিদ্রের শোষণের প্রক্রিয়া উৎসাহিত হয়। তাই সরকারকে সাম্যকারী নীতি প্রণয়ন করে বৈষম্য কমাতে হবে।

এর বিকল্প হচ্ছে এই ক্রমযৌগিক কারণ প্রক্রিয়ার স্বাভাবিক অবলুপ্তির জন্য অনন্তকাল অপেক্ষা করা যখন ক্রমবর্ধমান উৎপাদন ব্যয়ের নীতি কার্য্যকর হয়ে উন্নয়নের গতি স্তব্দ হবে। উচ্চ জীবনধারণের ব্যয় এবং বাহ্যিক অসুবিধার (External Diseconomies) কারন গুলি শেষ অব্দি উন্নত অঞ্চলের আকর্ষনীয়তা ক্রমশ কমিয়ে আনবে এবং অভিগমনের প্রক্রিয়ার অভিমুখ পাল্টে দিতে পারে, যদিও এটি দীর্ঘ সময় কাল অতিবাহিত করবে। দেখা গেছে অনুন্নত দেশগুলির সরকারের সক্রিয়তার অভাবে অনুন্নয়নের প্রক্রিয়া দীর্ঘস্থায়ী হয় অন্য দিকে উন্নতদেশে সরকারের তৎপরতায় আঞ্চলিক বৈষম্য দ্রুত নিরসন হয়ে থাকে।

৪.৬.১ ক্রমযৌগিক কারণ ও আন্তর্জাতিক বৈষম্য

মিরদালের মতে আন্তর্জাতিক বৈষম্যের উৎস হিসেবে আমরা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যকে একটি প্রধান কারণ হিসেবে ভাবতে পারি, এর শক্তিশা্লী পশ্চাৎ প্রতিক্রিয়া অনুন্নত দেশগুলিতে প্রবল ভাবে অনুভূত হয় বাস্তবে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য অনুন্নত দেশগুলির প্রতি বৈষম্য যুক্ত যার ফলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য থেকে আপেক্ষিক ভাবে বেশি সুবিধা ভোগ করে, ঐতিহাসিক ভাবে পরিলক্ষিত সত্য এই যে উন্নত দেশগুলি সাধারণত কম উৎপাদন ব্যয়ের কারণে অপেক্ষাকৃত কম দামে শিল্পদ্রব্য উৎপাদন ও রপ্তানি করে থাকে অনুন্নত দেশগুলিতে, ফলস্বরূপ অনুন্নত দেশগুলির ক্ষুদ্র ও, মাঝারী শিল্প জাত দ্রব্যগুলি প্রতিযোগিতায় হটতে শুরু করে এবং শেষ অব্দি অস্থিতিস্থাপক প্রাথমিক পণ্যের রপ্তানিতে নিয়োজিত থাকে, এর ফলে আন্তর্জাতিক বাজারে প্রাথমিক পণ্যের দাম কমা বা বাড়ার কোন সুবিধাই গ্রহণ করতে পারেনা বাজারের অস্থিতিস্থাপকতার কারণে।

অন্য দিকে বিনিয়োগের ক্ষেত্র বিভিন্ন আপেক্ষিক অসুবিধা (মূলত পরিপূরকতার অভাব) থাকার কারণে অনুন্নত দেশে গুলিতে মূলধনের অনুপ্রবেশ তুলনামূলক ভাবে অনেক কম ছিল, ঔপনিবেশিক শাসনের সুবিধার কারণে যে সমস্ত ক্ষেত্রে বিনিয়োগ কে অপরিহার্য্য মনে করেছে সেখানেই কিছু বিনিয়োগ এসেছে যেমন চা, কফি, খনিশিল্পে এবং রেল, রোড প্রভৃতি পরিকাঠামো নির্মানে যা ঔপনিবেশিক শাসন কে মজবুত

করতে সাহায্য করবে, শুধুমাত্র সেই সব ক্ষেত্রেই মূলধনের প্রবেশ ঘটেছে, শুধু তাই নয় মূলধনের এই অনুপ্রবেশের ফলে এই দেশগুলি থেকে সম্পদের নির্গমনের স্রোত তৈরি হয় ফলে বলা যায় মূলধনের প্রবেশ অনুন্নত দেশগুলিতে শক্তিশালী পশ্চাৎ প্রতিক্রিয়া চলতে থাকে।

আন্তর্জাতিক শ্রমিক অভিগমন প্রক্রিয়ার ফলে যে উন্নত ও স্বল্পোন্নত দেশগুলির মধ্যে বৈষম্য হ্রাস পেয়েছে এ কথা জোর দিয়ে বলা যায়না। স্বল্পোন্নত দেশগুলি থেকে উন্নত দেশে শ্রমের অভিগমনের ফলে একদিকে যেমন জনসংখ্যার চাপ কমে, কমে বেকারত্বের পরিমাণ এবং দেশে অর্থ প্রেরণের মাধ্যমে স্বল্পোন্নত দেশগুলির বৈদেশিক বাণিজ্যের ঘাটতির পরিমাণের কিছু সুরাহা হয় কিন্তু অন্য দিকে অভিগমন মানে মানব-মুল্ধনের (Human Capital) এবং শ্রমিকের সংখ্যার হ্রাস পাওয়া জনিত ক্ষতি।

৪.৬.২ পরিশেষ মন্তব্য

ক্রমযৌগিক কারণ তত্ত্ব আঞ্চলিক বৈষম্য ও আন্তর্জাতিক বৈষম্য উভয়কে ব্যাখ্যা করতে সমর্থ। দেশগুলির মাথাপিছু আয় এর তারতম্য কমে অভিসৃতির (Convergence) কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছেনা অর্থাৎ ক্রমযৌগিক কারণ তত্ত্ব এর যথার্থতা নিয়ে এখন কোন প্রশ্ন উঠে আসেনি। এমন কি আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের লেনদেনের হার কিম্বা বাণিজ্যের লাভ স্বল্পোন্নত দেশগুলির পক্ষে যাচ্ছে বা তা সমভাবে বন্টিত হচ্ছে সেরকম কোন ইঙ্গিতও পাওয়া যাচ্ছেনা।

মিরদাল সুন্দরভাবে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক শক্তিগুলিকে ব্যবহার করে দেখিয়েছেন কি ভাবে অনুন্নয়ন কে স্থায়িত্ব প্রদান করে চলেছে অর্থনৈতিক বাস্তবতা। তার মতে এর পেছনে কাজ করছে স্বল্পোন্নত দেশের শক্তিশালী পশ্চাৎ প্রতিক্রিয়া (Back wash effect) ও দূর্বল প্রসার প্রতিক্রিয়ার (Spread effect । আর এর ফলে দারিদ্র্যের ফাঁদে হাবুডুবু খাচ্ছে। সেই অর্থে এটিকে ফাঁদ -মডেল হিসেবেও পরিগণিত করা যায়।

৪.৬.৩ সারাংশ

স্বল্পোন্নত অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা দেখেছি এদের মাথাপিছু প্রকৃত আয় কম হয়, এরা কৃষিক্ষেত্রের উপর ভীষণভাবে নির্ভরশীল, এদের মূলধনের স্বল্পতায় এরা খুবই জর্জরিত। শিল্পে অনগ্রসরতা এদের প্রধান বৈশিষ্ট্য, তার উপর আছে জনসংখ্যার চাপ ফলে বেকারত্বের বোঝা অপরিসীম। এরা কোনো উন্নত দেশের হয়তো উপনিবেশ মানব, মূলধনও খুব নিম্নমানের। এই অর্থনীতির এক প্রধান বৈশিষ্ট্য হল এখানে দ্বৈত অর্থনীতি দেখা যায় অর্থাৎ একদিকে কিছুটা উন্নত ক্ষেত্র আর অপরদিকে খুবই অনুন্নত ক্ষেত্র বিরাজমান। আয় ও সম্পদ বন্টনে অত্যন্ত বৈষম্য বিদ্যমান। প্রাকৃতিক সম্পদের অপূর্ণ ব্যবহারের ফলে অনুন্নতির প্রাবল্য দেখা যায়। স্বল্পোন্নত অর্থনীতিগুলি দারিদ্র্যের দুষ্টচক্রের মধ্যে আবর্তিত হয়। অর্থাৎ কম আয়ের জন্য কম সঞ্চয়, কম সঞ্চয়ের জন্য কম মূলধন গঠন, কম মূলধনের জন্য কম উৎপাদনশীলতা, কম উৎপাদনশীলতার জন্য কম আয়। এই দুষ্টচক্র কীভাবে অতিক্রম করা যায় সেই সমস্ত তত্ত্ব আমরা আলোচনা করেছি। অনুন্নয়নের বিভিন্ন বাধাগুলি আমরা সবিস্তারে আলোচনা করেছি এই অধ্যায়ে, অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে পরস্পর বিপরীতমুখী ক্রিয়া , প্রতিক্রিয়া কার্যকরী থেকে অনুন্নয়ন কে দীর্ঘস্থায়ী করে, এই ফাঁদের সম্পর্কে নেলসন মডেল এবং ফাঁদের বাইরে বের হয়ে আসার জন্য সর্বনিম্ন গুরুত্বপূর্ণ বিনিয়োগ প্রচেষ্টা

সম্পর্কে লিবেনষ্টিনের মডেল (Leibenstein's Model of Critical Minimum Effort) এই অধ্যায়ে নিবিড় ভাবে আলোচনা করা হয়েছে। আঞ্চলিক ও অন্তর্দেশীয় বৈষ্যমের ব্যাখ্যার জন্য গুনার মিরদাল তার ক্রমযৌগিক কারণ তত্ত্বের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করেন, এই অধ্যায়ে আমরা এই তত্ত্বের সীমাবদ্ধতাও তুলে ধরেছি।

৪.৭ অনুশীলনী

নীচের প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন। (প্রতিটির মান ২.৫)

(১) উন্নয়নের সূত্রপাত কীভাবে হতে পারে?

(২) ক্রমযৌগিক কারণ তত্ত্বে পশ্চাৎ প্রতিক্রিয়া কাকে বলে?

(৩) ক্রমযৌগিক কারণ তত্ত্বে প্রসার প্রতিক্রিয়া কি?

(৪) স্বল্পোন্নত দেশের মূল বৈশিষ্ঠটি কি?

(৫) ভৌগলিক বা আঞ্চলিক দ্বৈত্য বাদ কাকে বলে?

(৬) অনুন্নয়নের ফাঁদ কি?

(৭) অনুন্নতির কারণ এর ক্ষেত্রে দুষ্টচক্র তত্ত্বে 'Egg and Hen' জাতীয় সমস্যা কাকে বলে?

নীচের প্রশ্নগুলি মাঝারি দৈর্ঘ্যের (প্রতিটির মান ৫)

(৮) নিম্নস্তরে ভারসাম্যের ফাঁদ বলতে কী বোঝায়?

(৯) গুরুত্বপূর্ণ সর্বনিম্ন প্রচেষ্টায় কি পরিমাণ বিনিয়োগ প্রয়োজন হয়?

(১০) নিম্নস্তরের ভারসাম্যের ফাঁদ থেকে বেরিয়ে আসতে হলে বৈদেশিক সাহায্য ও বৈদেশিক বিনিয়োগের উপর নির্ভর করা যায় কি?

(১১) নেলসনের মতে আয় সংকোচনকারী শক্তিগুলি কখন সক্রিয় হয়?

বড় প্রশ্ন (প্রতিটির মান ১০)

(১) সংক্ষেপে দারিদ্র্যের দুষ্টচক্রের ধারনাটি পরিষ্কার করুন।

(২) দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র ধারণাটির সীমাবদ্ধতাগুলি (Limitations) আলোচনা করুন।

(৩) সুষম সমৃদ্ধির পথে কয়েকটি বাধার উল্লেখ করে সমৃদ্ধির ইচ্ছাপূর্বক অসমতার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করুন।

(৪) ক্লার্ক, ফিশারের ক্রমযৌগিক কারণ তত্ত্বের একটি মূল্যায়ন করুন?

সঠিক উত্তর নির্বাচনের প্রশ্নাবলী

ক্রমযৌগিক কারণ তত্ত্বটির মূল কারণ হোল,

ক) ভৌগলিক দ্বৈত বাদ ও আঞ্চলিক দ্বৈত বাদ

খ) শক্তিশা্লী পশ্চাৎ প্রতিক্রিয়া (Back wash effect)

গ) দূর্বল প্রসার প্রতিক্রিয়ার (Spread effect)

ঘ) সবকটিই

ক্রমযৌগিক কারণ তত্ত্ব এর প্রবক্তা কে?

ক) পেরক্স (Perroux)

খ) বউডভেলি (Boudevilleós)

গ) ক্লার্ক - ফিশার

ঘ) মিরদাল

নিম্নস্তরের ভারসাম্যের ফাঁদ তত্ত্বটি কার প্রণীত ,

ক) নেলসন খ) লিবেন্সটাইন গ) নার্কস ঘ) এরা কেউ নন

৪.৮ গ্রন্থপঞ্জী

1. Myint– H. The Economics of The Developing Countries SIndian Edition– B. Publications– New Delhi– 1981V
2. Thirlwall A. P. Growth and Development with Special Reference to Developing Economics SELBS/MacMillan 1983V
3. Meier G. M.éôéLeading Issues in Economic Development SNew York– 1976V
4. Hirschman A. O. The Strategy of Economic Development SNew Haven– 1958V
5. Kindleberger C. P.éôéEconomic Development SMcGrawéôéHill– New York– 1958V Or
6. Higgins B. Economic DevelopmentéôéPrinciples– Problems and Policies SIndian Edition– Central Book Depot– Allahabad– 1963V
7. অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান, তত্ত্ব ও প্রয়োগ-জয়দেব সরখেল, শেখ সেলিম, অনিন্দ্য ভুক্ত; বুক সিন্ডিকেট প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা; ২০০৭
8. Economic Theory and Underdeveloped Regions' Gunnar Myrdal

৫ উন্নয়নের কৌশল সমূহ

৫.১ গঠন

৫.২ উদ্দেশ্য

৫.৩ প্রস্তাবনা

৫.৪ জোর ধাক্কার তত্ব

৫.৫ সুষম ও অসম সমৃদ্ধি

৫.৫.১ সুষম উন্নয়নের পক্ষে যুক্তি **(Arguments in favour of Balanced GrowthV)**

৫.৫.২ অসম সমৃদ্ধি বা বিষম সমৃদ্ধি সম্পর্কে সিঙ্গার-হাশচম্যান ভাষ্য **(Singer-Hirschman Versions of Unbalanced Growth)**

৫.৫.৩ সুষম সমৃদ্ধির পথে কয়েকটি বাধা থাকে:

৫.৬ প্রয়োগ-কৌশল নির্বাচন **(Choice of Technique)**

৫.৬.১ প্রয়োগ-কৌশল সম্পর্কে অমর্ত্য সেনের বিশ্লেষণ **(Sen Criterion of the Choice of Technique)**

৫.৬.২ শ্রম-নিবিড় বনাম মূলধন-নিবিড় উৎপাদন পদ্ধতি **(LabouréôéIntensive versus CapitaléôéIntensive Methods of Production)**

৫.৭ বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বিভিন্ন লক্ষণ **(Investment Criteria)**

৫.৭.১ মূলধন-উৎপাদন অনুপাতের লক্ষণ **(CapitaléôéOutput Ratio Criterion)**

৫.৭.২ সামাজিক প্রান্তিক উৎপাদনের লক্ষণ **(Social Marginal Productivity Criterion)**

৫.৮ সারাংশ

৫.৯ অনুশীলনী

৫.১০ গ্রন্থপঞ্জী

৫.১ গঠন

৫.২ উদ্দেশ্য

এই এককে আমরা অনুন্নতির বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে একটা ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করব। অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে বাধাগুলি কী কী তারও অনুসন্ধান করব। অর্থনৈতিক অনুন্নয়নের যে দুষ্টচক্র আছে সেটি কীভাবে অতিক্রম করা যায় সে সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করব। বিভিন্ন অর্থনীতিবিদ উন্নয়নের বিভিন্ন ধরনের কৌশল উদ্ভাবন করেছেন সেগুলি আমরা একে একে ব্যাখ্যা করব।

৫.৩ প্রস্তাবনা

বিশ্বের দেশগুলির মধ্যে কিছু দেশ রয়েছে যারা অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদের উপযুক্ত ব্যবহার ঘটিয়েছে। এগুলি হল উন্নত দেশ। এরা উচ্চ মাথাপিছু আয় ভোগ করছে। অন্যদিকে রয়েছে বহু দেশ যারা তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সম্ভাবনাকে বাস্তবে কাজে লাগাতে পারেনি। এরা অনুন্নত দেশ। অনুন্নত দেশ বলতে একথা বলা হচ্ছে না যে দেশাটির উন্নয়নের কোনো সম্ভাবনাই নেই। আসলে দেশটির সম্পদের উপযুক্ত ব্যবহার হয়নি, আর তাই এর মাথাপিছু প্রকৃত আয় কম। উপযুক্ত উদ্যোগের অভাবেই হয়তো তা হয়ে ওঠেনি। যদি জাতীয় বা মাথাপিছু উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দারিদ্র্য, আয়-বৈষম্য ও বেকারত্ব কমতে থাকে তবেই অর্থনৈতিক উন্নতি ঘটেছে বলা যাবে। বিভিন্ন অর্থনীতিবিদ বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে দারিদ্র্যের এই দুষ্টচক্র ভেদ করার চাবিকাঠি দিয়েছেন। সেগুলির আলোচনার মাধ্যমে আমরা উন্নয়নের পথের সন্ধান করব।

৫.৪. উন্নয়নের জন্য জোর ধাক্কা দেওয়ার তত্ত্ব (The Theory 'of Big Push'):

৫.৪.১ শিল্পোন্নয়নের সুযোগ থেকে বঞ্চিত দেশগুলিতে অথবা শিল্পোন্নয়নের ক্ষেত্রে অনেক পিছিয়ে আছে এমন দেশগুলিতে আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তন দরকার বলে পি. এন. রোজেনষ্টিন-রোডান (P.N. RosensteinéôéRodan) তাঁর জোর ধাক্কা দেওয়ার তত্ত্বে মন্তব্য করেছেন। শিল্পোন্নয়নের ক্ষেত্রে (উদাহরণস্বরূপ পূর্ব ইউরোপের দেশগুলির ক্ষেত্রে) প্রথম প্রয়োজন হল কৃষকদের উপযুক্ত কারিগরি দক্ষতা বাড়িয়ে পুরো সময়ের জন্য অথবা আংশিক সময়ের জন্য-শিল্পকর্মীতে পরিণত করা। এজন্য কৃষকদের এবং শ্রমিকদের উৎপাদনী শক্তি বাড়াবার জন্য প্রশিক্ষণ খাতে প্রচুর অর্থ বিনিয়োগ করা দরকার। শিল্পোন্নয়নের জন্য এবং সেইসঙ্গে পরিবহন ব্যবস্থা ও আবাসন ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য প্রচুর অর্থ বিনিয়োগের ব্যবস্থা করা উন্নয়ন প্রচেষ্টাকে জোরে ধাক্কা দেওয়ার তত্ত্বের পক্ষে একটি অন্যতম প্রধান যুক্তি। বিভিন্ন শিল্পের পরিপূরকতা (complementarities) বৃহদায়তন শিল্পোন্নয়নের প্রয়াসের পক্ষে খুব অনুকূল, এবং এই পরিপূরকতাকে কাজে লাগানোর জন্য বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ঝুঁকির পরিমাণ কিছু হ্রাস পায় এবং বৃহদায়তন উৎপাদনের বাহ্যিক সুবিধা (external economies) অর্জন করার সম্ভাবনা থাকে, তাছাড়া

একটি শিল্পে বেশি বিনিয়োগ হলে অন্যান্য সহায়ক শিল্পেরও উন্নতি হয়। বৃহদায়তন শিল্পের বাহ্যিক সুবিধাগুলি (external economies) অর্থনৈতিক উন্নয়নের পক্ষে সহায়ক এবং এই বাহ্যিক সুবিধাগুলি পেতে গেলে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে একটি জোরে ধাক্কা দেওয়ার প্রয়োজন বলে রোজেনস্টিন- রোডান মনে করেন। এই বিনিয়োগ কর্মসূচী সফল করার জন্য একটি ন্যূনতম পর্যায়ে সম্পদ আহরিত হওয়া দরকার। প্রয়োজনীয় সম্পদ সংগৃহীত হলে এবং বিনিয়োগের পরিমাণ বাড়ানো হলে উৎপাদন অপেক্ষকের অবিভাজ্যতার (indivisibilities) সদ্ব্যবহার করার কাজ সহজ হয়। উৎপাদনের উপাদানগুলির অবিভাজ্যতার সদ্ব্যবহার হলে ক্রমবর্ধমান উৎপাদনের নিয়ম (Law of Increasing Returns) কার্যকর হয়। অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই প্রসঙ্গে সামাজিক মূলধন সম্পর্কিত ধারণাটি বোঝা দরকার। সামাজিক মূলধন বলতে বোঝায় সেই মূলধন যা রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক মালিকানাধীন এবং যা থেকে সঞ্চয় ও আর্থিক সম্পদের বা সমাজের আয়ের সৃষ্টি হয়, উৎপাদকের স্থাবর বা স্থির এবং অস্থাবর মূলধনও সামাজিক মূলধনের পর্যায়ে আসতে পারে। সামাজিক স্থির মূলধনে (Social overhead capital) আমরা চার প্রকার অবিভাজ্যতা দেখতে পাই; যথা- (১) সময়ের দিক দিয়ে অবিভাজ্যতা, প্রত্যক্ষভাবে উৎপাদনশীল বিনিয়োগের আগেই দেশে সামাজিক স্থির মূলধন থাকে; (২) সামাজিক স্থির মূলধনের ক্ষেত্রে সরঞ্জামের স্থায়িত্ব (durability) খুব বেশি স্থায়িত্বের মাত্রা কম হলে তার কারিগরি দক্ষতা কম হতে পারে অথবা মোটেই না থাকতে পারে; (৩) সামাজিক স্থির মূলধনের ক্ষেত্রে বিনিয়োগ এবং তার ফল প্রাপ্তির মধ্যে সময়ের ব্যবধানও (gestation periods) বেশি থাকে; এবং (৪) একটি ন্যূনতম সামাজিক স্থির মূলধন শিল্পের টিকে থাকার একটি শর্ত। সামাজিক স্থির মূলধন আমদানি করা যায় না বলে এবং স্থির মূলধনের অবিভাজ্যতাগুলির জন্যই বেশি পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগের প্রয়োজন খুব বেশি। স্বল্পোন্নত দেশগুলির পক্ষে বেশি মাত্রায় বিনিয়োগ করা সবসময় সম্ভব হয় না বটে কিন্তু দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্বার্থে এটার প্রয়োজন খুবই বেশি। স্বল্পোন্নত দেশগুলির ছোট বাজারে বিনিয়োগের পরিমাণ আপেক্ষিকভাবে কম হয়। যদি সব বিনিয়োগ প্রকল্প স্বাধীন হত এবং তাদের সংখ্যাও যদি বেশি হত, তাহলে প্রতিটি বিনিয়োগেরই ঝুঁকি কমে যেত। বিনিয়োগের ঝুঁকি কম হলে বিনিয়োগকারীর পক্ষে সহজে ঋণ পাওয়া সম্ভব এবং সেক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ ব্যয় সংকোচের (internal economies) সুবিধাগুলি ভোগ করাও সম্ভব। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় বিভিন্ন বিনিয়োগ প্রকল্প বহু ক্ষেত্রেই স্বাধীন নয়। কোনো দ্রব্যের বাজারে কতটা বিক্রি হবে সে ব্যাপারে অনিশ্চয়তা থাকায় বিনিয়োগ প্রকল্পগুলি ঝুঁকিবহুল হয় এবং বিনিয়োগ বাড়াবার আগ্রহও তাতে কমে যায়। বেশি পরিমাণ বিনিয়োগের জন্য বেশি পরিমাণ অভ্যন্তরীণ সঞ্চয়ের (domestic savings) প্রয়োজন। কিন্তু স্বল্পোন্নত দেশগুলিতে সঞ্চয়ের হার ও পরিমাণ অপেক্ষাকৃত কম।

সঞ্চয়ের জোগানের ক্ষেত্রে শূন্য অথবা স্বল্প মূল্য স্থিতিস্থাপকতা (Zero or low price elasticity of saving) এবং সঞ্চয়ের ক্ষেত্রে বেশি আয়-স্থিতিস্থাপকতা (high income elasticity of saving) হলে আরেকটি অবিভাজ্যতা।

এই অবিভাজ্যতা উৎপাদনের উপকরণের ক্ষেত্রে অবিভাজ্যতা এবং এগুলি থেকে সৃষ্ট বাহ্যিক সুবিধা (external economies) ও সেই সঙ্গে শ্রমিকদের কারিগরি প্রশিক্ষণ দেওয়ার বাহ্যিক সুবিধা-এই উপাদান

হল স্বল্পোন্নত দেশের সমৃদ্ধি মডেলের (Growth models) বৈশিষ্ট্য।

অধ্যাপক হাওয়ার্ড এস. এলিস (Howard S. Ellis) মনে করেন যে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে জোর ধাক্কা দেওয়ার তত্ত্বটি কৃষি বা প্রাথমিক উৎপাদনের জন্য বিনিয়োগের তুলনায় শিল্পক্ষেত্রে বিনিয়োগকে উৎকৃষ্টতর মনে করে; কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে কৃষি বা প্রাথমিক উৎপাদনক্ষেত্রে বিনিয়োগ ও উন্নয়নের পন্থা হিসাবে বিবেচিত হতে পারে। অধ্যাপক জেকব ভাইনার (Jacob Viner) মনে করেন উন্নয়নশীল দেশে বৈদেশিক বাণিজ্য অভ্যন্তরীণ বিনিয়োগ ছাড়াই বিশ্বের বাজারে অর্থনৈতিক সুবিধা অর্জনের ক্ষেত্রে সহায়ক হয়। বিনিয়োগে জোর ধাক্কা দেওয়ার তত্ত্বটির একটি সীমাবদ্ধতা হল এই যে এই তত্ত্বটি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে জোর ধাক্কা দেওয়ার কথা বলে-অথচ উন্নয়নশীল দেশের অর্থনৈতিক পরিকাঠামোয় বিনিয়োগের ক্ষেত্রে জোর ধাক্কা দেওয়া সম্ভব কিনা অথবা বিনিয়োগের পরিমাণ বাড়াবার উপযুক্ত মূলধন সহজলভ্য কিনা সেই সমস্যাটির উপর বিশেষ আলোকপাত করেনি। তাছাড়া বিনিয়োগ বৃদ্ধির জন্য দেশে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা আছে কিনা, উৎপাদনের উপকরণগুলির দক্ষতা আছে কিনা, দেশে বিনিয়োগের পক্ষে অনুকূল অর্থনৈতিক পরিকাঠামো আছে কিনা এবং দেশের সরকারি নীতি-বিশেষ করে সরকারের শিল্পনীতি, বাণিজ্যনীতি ও আয়-ব্যয় নীতি বিনিয়োগের পক্ষে অনুকূল কিনা সেগুলিও বিশেষভাবে বিবেচ্য।

৫.৫ সুষম ও অসম সমৃদ্ধি

সুষম সমৃদ্ধি এবং অসম বা বিষম সমৃদ্ধি (Balanced growth and unbalanced growth)

সুষম সমৃদ্ধির বিভিন্ন ব্যাখ্যা আছে। যদি দেশে মূলধনের জোগান (capital stock) নির্দিষ্ট থাকে, তাহলে কোনো অনুপাতে মূলধনের জোগান বাড়ালে সমান অনুপাতে উৎপাদন বাড়ছে কিনা, আবার একটি পর্যায়ে উৎপাদন যে হারে বাড়ল পরবর্তী পর্যায়ে মূলধনের জোগান সেই অনুপাতে বাড়ল কিনা তার ভিত্তিতে সুষম উন্নয়নের ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। আবার অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রের উন্নয়ন হার যদি পরস্পরের সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রাখতে পারে অথবা পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত শিল্পগুলির উন্নয়ন যদি সমানভাবে হয়, তবে তাকেও সুষম উন্নয়ন বলা যেতে পারে।

৫.৫.১ সুষম উন্নয়নের পক্ষে যুক্তি (Arguments in favour of Balanced Growth)

দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র থেকে যাতে অনুন্নত অর্থনীতি বেরিয়ে আসতে পারে সেজন্য পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত শিল্পগুলির সুষম উন্নয়নের উপর রগ্নাগনার নুর্কসি (Ragnar Nurkse) গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। পরস্পর নির্ভরশীল শিল্পগুলির যুগপৎ উন্নয়নে বিভিন্ন শিল্প পরস্পরের জন্য বাজারের সম্প্রসারণ করতে পারে। স্বল্পোন্নত দেশগুলিতে বিনিয়োগ কম হবার কারণ হল বাজারের সীমিত আয়তন। সীমিত বাজারের বেড়াজাল থেকে বেরিয়ে আসার উপায় হিসাবে নুর্কসি পরস্পর নির্ভরশীল শিল্পগুলির সুষম উন্নয়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। সুষম উন্নয়নের পক্ষে আর একটি যুক্তি হল, বিভিন্ন পরস্পর সংযুক্ত শিল্পের

যুগপৎ উন্নয়ন হলে শিল্পগুলির পক্ষে নতুন উৎপাদনীশক্তি সৃষ্টি করা এবং তার ব্যবহার করা সম্ভব হয়। একটি শিল্পের উন্নয়ন হলে তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য শিল্পের যুগপৎ উন্নয়ন হল প্রথম শিল্পটির উন্নয়নের প্রসারণ প্রভাব (Spread Effect)। সুষম উন্নয়নে শিল্পোন্নয়নের প্রসারণভাব অধিকতর পরিলক্ষিত হয়।

অধ্যাপক লুইস মনে করেন, উন্নয়নশীল দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সুষম উন্নয়ন পদ্ধতি খুবই প্রয়োজনীয়। এক্ষেত্রে শিল্প ও কৃষির যুগপৎ উন্নয়ন সুষম উন্নয়নের একটি অঙ্গ। অবশ্য সুষম উন্নয়ন বলতে সবক্ষেত্রেই যে সমান হারে উন্নয়ন হবে তা নয়। সীমিত বৈদেশিক মুদ্রা-ভাণ্ডার, শ্রমশক্তির কর্মকুশলতা, প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার, বিভিন্ন উৎপাদিত দ্রব্যের জন্য ক্রেতাদের আয় স্থিতিস্থাপকতা, রপ্তানি সম্প্রসারণের সম্ভাব্যতা, রপ্তানি-চালিত উন্নয়ন প্রভৃতি সবগুলি বিবেচ্য বিষয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বজায় রেখেই সুষম উন্নয়নের কর্মসূচী তৈরি করা দরকার। প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং সেবাক্ষেত্রের উন্নয়ন পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। এজন্যই সবগুলি ক্ষেত্রের সুষম উন্নয়ন প্রয়োজন। অর্থনৈতিক পরিকল্পনা, বিশেষ করে বিনিয়োগ পরিকল্পনার মাধ্যমে তা অর্জন করা সম্ভব।

সুষম সমৃদ্ধির বিভিন্ন ভাষ্য (Different versions of Balanced Growth)

সুষম সমৃদ্ধির প্রথম ভাষ্য হল, বাজারের ক্ষুদ্র গন্ডী দূর করার অন্যতম উপায় হিসাবে বিভিন্ন পরস্পর-সংযুক্ত ভোগসামগ্রী শিল্পগুলির যুগপৎ উন্নয়ন। এই ভাষ্যটি রগ্নাগনার নুর্কসির যুক্তির অনুরূপ। এক্ষেত্রে বিভিন্ন কলকারখানা স্থাপন ও তাদের নৈপুণ্য বৃদ্ধি, উৎপাদন ব্যয় ও উৎপাদিত পণ্যের মূল্য এবং উৎপাদিত পণ্যের জন্য চাহিদার মূল্য স্থিতিস্থাপকতাও গুরুত্বপূর্ণ। এই ভাষ্যের একটি অন্তর্নিহিত ধারণা হল, দেশে যথেষ্ট পরিমাণ সামাজিক স্থির মূলধন (Social Overhead Capital) আছে যার সাহায্যে ভোগসামগ্রী শিল্পগুলির প্রয়োজন মেটানো সম্ভব। যদি সামাজিক স্থির মূলধনের যথাযথ সদ্ব্যবহার হয় তবে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত ভোগসামগ্রী শিল্পগুলির যুগপৎ উন্নয়ন সম্ভব হয়। আবার প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সামাজিক স্থির মূলধন বাড়াবার জন্য বিনিয়োগের প্রয়োজন

সুষম বৃদ্ধির দ্বিতীয় ভাষ্য হল, একদিকে দেশের ভোগসামগ্রী শিল্প এবং অপরদিকে সামাজিক স্থির মূলধনের মধ্যে সামঞ্জস্য বজায় রাখা। এক্ষেত্রে একটি সমস্যা হল, স্বল্পোন্নত দেশ প্রয়োজন হলে বা ইচ্ছা করলেই সামাজিক স্থির মূলধন বাড়াতে বা উন্নত করতে পারে না। তাছাড়া সামাজিক স্থির মূলধন বাড়াবার ক্ষেত্রে যথেষ্ট সময় লাগে। কিন্তু ভোগসামগ্রী শিল্পগুলির উন্নয়ন এই সময় ব্যবধানের (gestation lag) জন্য অপেক্ষা করে থাকতে পারে না।

সুষম সমৃদ্ধির তৃতীয় ভাষ্য হল, ভোগসামগ্রী শিল্প, মূলধন সামগ্রী শিল্প এবং সামাজিক স্থির মূলধন অনুভূমিক এবং উল্লম্ব ভারসাম্যের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত; রোজেনস্টিন-রোডান (Rosenstein-Rodan) জোরে ধাক্কা তত্ত্বের (Big Push Theory) অনুরূপ। এই তত্ত্ব অনুযায়ী দারিদ্র্যের কবল থেকে বেরিয়ে আসার জন্য কৃষি, ভোগসামগ্রী শিল্প, মূলধন সামগ্রী শিল্প, সামাজিক স্থির মূলধন সর্বত্রই বিনিয়োগের পরিমাণ বাড়াতে হবে। সুষম উন্নয়নের তৃতীয় ভাষ্যটি ভোগসামগ্রী শিল্প, মূলধন-সামগ্রী শিল্প এবং সুসংহত উন্নয়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করে। তবে এই ভাষ্য অনুযায়ী সুষম উন্নয়ন অর্জন করা যথেষ্ট ব্যয়-সাপেক্ষ। সীমিত

সম্পদের সুষম সমৃদ্ধির তৃতীয় ভাষ্যের দুটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হল, (১) উৎপাদনের বাহ্যিক ব্যয়-সংকোচনের সুবিধা থাকে। (২) স্বল্পোন্নত দেশগুলির অর্থনৈতিক কাঠামোকে জোরদার করার জন্য একটি সর্বাত্মক উৎপাদনসূচী (comprehensive programming) প্রয়োজন হয়।

৫.৫.২ অসম সমৃদ্ধি বা বিষম সমৃদ্ধি সম্পর্কে সিঙ্গার-হাশচম্যান ভাষ্য (Singer-Hirschman Versions of Unbalanced Growth)

হ্যান্স সিঙ্গার (Hans Singer) মনে করেন স্বল্পোন্নত দেশগুলির পক্ষে ভোগসামগ্রী শিল্প ও মূলধন-সামগ্রী শিল্প অথবা কৃষি, সবগুলি ক্ষেত্রে একই সঙ্গে বিনিয়োগ বাড়াবার মতো আর্থিক সম্পদের প্রাচুর্য নেই। এর ফলে একই সঙ্গে যুগপৎ সব শিল্পে বিনিয়োগ বাড়াতে পারলে তবে যে প্রসারণ প্রভাব তৈরি হতে পারে সেটা অর্জন করার মতো পুরো সুযোগ স্বল্পোন্নত দেশ পায় না। সেজন্য সিঙ্গারের মতে প্রত্যক্ষ উৎপাদনশীল ক্রিয়াকলাপ (Direct Productive Activities or DPA) এবং সামাজিক স্থির মূলধনের (SOC) সঙ্গে কৃষিক্ষেত্রের কাম্য উন্নয়ন দরকার। যদিও স্বল্পোন্নত দেশের প্রায় অর্ধাংশ শ্রমশক্তি কৃষিক্ষেত্রে নিযুক্ত, তবুও জনপ্রতি উৎপাদন অকৃষিক্ষেত্রের তুলনায় কৃষিক্ষেত্রে খুব কম। উন্নত দেশগুলিতে সাধারণত গড়ে ১৫ শতাংশ লোক কৃষিক্ষেত্রে নিযুক্ত থাকে বলে কৃষি ও অকৃষিক্ষেত্রের মধ্যে জনপ্রতি উৎপাদনের ব্যবধান অনেক কম। এজন্য সিঙ্গার মনে করেন, স্বল্পোন্নত দেশগুলির আর্থিক সম্পদের পরিমাণ যেহেতু সীমিত সেজন্য এই সম্পদ এমন কতিপয় ক্ষেত্রে বেশি বিনিয়োগ করা দরকার যেগুলিতে দ্রুত উন্নয়ন একান্ত কাম্য। এই ধরনের বিনিয়োগের মাধ্যমে সমৃদ্ধি অর্জন করাকে অসম বিনিয়োগ (Unbalanced investment) বলা যেতে পারে; অগ্রাধিকারের (priority) ভিত্তিতে এই ধরনের বিনিয়োগ করা দরকার। হাশচম্যানের (Hirschman) মতে সমৃদ্ধিতে ইচ্ছাপূর্বক অসম (deliberate unbalancing of growth) করা স্বল্পোন্নত দেশের পক্ষে প্রয়োজন হয়।

৫.৫.৩ সুষম সমৃদ্ধির পথে কয়েকটি বাধা থাকে:

প্রথমত, যতক্ষণ পর্যন্ত বাজারের আয়তন বড় না হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত বিনিয়োগের বাঞ্ছনীয় সম্প্রসারণ করা সম্ভব হয় না। অবশ্য বাজারের সম্প্রসারণের অভাব এক্ষেত্রে একমাত্র প্রতিবন্ধক নয়। সুষম উন্নয়ন ছাড়াও অন্যান্য উপায়ে যেমন আমদানি নিয়ন্ত্রণ, বাণিজ্যের সম্প্রসারণ, পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়ন, রপ্তানি বৃদ্ধি, প্রভৃতির মাধ্যমে বাজারের সম্প্রসারণ করা সম্ভব।

দ্বিতীয়ত, বাজারের সম্প্রসারণ চাহিদার উপর গুরুত্ব আরোপ করে-জোগানের দিকটি এক্ষেত্রে সেভাবে বিবেচিত হয়নি। জোগানের অস্থিতিস্থাপকতা সুষম সমৃদ্ধির পথে প্রতিবন্ধক হতে পারে।

তৃতীয়ত, সুষম সমৃদ্ধির জন্য অর্থনৈতিক পরিকল্পনা দরকার। সুসংহত অর্থনৈতিক পরিকল্পনার কর্মসূচী হিসাবেই সুষম সমৃদ্ধি অর্জন করা সম্ভব।

সুষম সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে যে বাধাগুলি পরিলক্ষিত হয় তার পরিপ্রেক্ষিতে হাশচম্যান উন্নয়নের একটি বিকল্প পন্থা গ্রহণের যুক্তি দেখিয়েছেন- সেটা হল সমৃদ্ধির ইচ্ছাপূর্বক অসমতার (deliberate unbalancing of

growth) ভিত্তিতে বিনিয়োগের সম্প্রসারণ করা। হার্শম্যানের মতে যেহেতু স্বল্পোন্নত দেশগুলির বিনিয়োগ সম্পদের পরিমাণ খুব সীমিত সেজন্য বিনিয়োগের জন্য এমন কয়েকটি ক্ষেত্র নির্বাচন করা উচিত যেগুলিতে বিনিয়োগের পরিমাণ বাড়ালে দ্রুত উৎপাদন বেড়ে যাবার সম্ভাবনা আছে এবং দ্রুত সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যাবার সম্ভাবনা আছে।

হার্শম্যানের মতে যে শিল্পগুলি বিনিয়োগের জন্য নির্বাচিত হবে সেগুলি এমন হওয়া চাই যেন তাদের প্রসারণ প্রভাব (Spread effect) থাকে। এই প্রসারণ প্রভাব থেকে সংযোগ প্রভাব (Linkage effect) পরিলক্ষিত হয়। সংযুক্তি প্রভাবের ক্ষেত্রে অগ্রবর্তী যোগসূত্র বা অগ্রবর্তী সংযোগ প্রভাব (Forward linkage) এবং পশ্চাদবর্তী যোগসূত্র বা পশ্চাদবর্তী সংযোগ প্রভাব (Backward linkage) উভয়ই থাকতে পারে। অগ্রবর্তী যোগসূত্রের থেকে অগ্রণী শিল্পগুলি উৎপাদনের পরবর্তী পর্যায়গুলিতেও বিনিয়োগে উৎসাহিত হয়। অপরদিকে পশ্চাদগামী যোগসূত্রের ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি, একটি শিল্প যেমন A, অপর কতিপয় শিল্প যেমন B, C, D-র সঙ্গে পশ্চাদবর্তী শিল্প হিসাবে এভাবে যুক্ত থাকতে পারে যে, B, C, D প্রভৃতি শিল্প যেসব উপাদান সরবরাহ করবে সেগুলির সাহায্যেই A শিল্পটির পক্ষে উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব। হার্শম্যানের মতে যে শিল্পগুলির অগ্রবর্তী যোগসূত্র (Forward linkage) এবং পশ্চাদবর্তী যোগসূত্র (Backward linkage) উভয় প্রভাবই যথেষ্ট জোরদার সেই শিল্পগুলিই বিনিয়োগ বৃদ্ধির মাধ্যমে সমৃদ্ধির গতি দ্রুত বাড়াতে পারে। তাঁর মতে এভাবে স্বেচ্ছাপূর্বক অসম সমৃদ্ধির মাধ্যমেই চূড়ান্ত পর্যায়ে সুষম সমৃদ্ধি অর্জন করা সম্ভব। হার্শম্যানের এই যুক্তিটি পরের চিত্রে দেখানো হয়েছে।

এই চিত্রে উল্লম্ব অক্ষে প্রত্যক্ষ উৎপাদনমূলক ক্রিয়াকলাপ (DPA) এবং অনুভূমিক অক্ষে সামাজিক স্থির মূলধন (SOC) বোঝানো হচ্ছে। I1, I2, I3 প্রভৃতি হচ্ছে সম উৎপাদন রেখা।

I_1, I_2, I_3 প্রভৃতি হচ্ছে সম উৎপাদন রেখা।

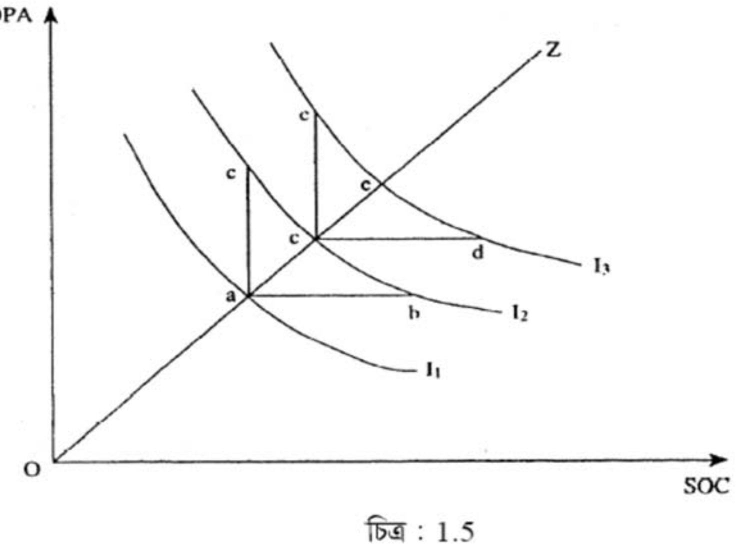

চিত্র : 1.5

OZ. হল সুষম সমৃদ্ধি রেখা (Balanced Growth Path)। গোড়ায় আমরা অসম সমৃদ্ধির সূচনা দেখতে পাই যদি সামাজিক স্থির মূলধনের (SOC) প্রাচুর্য এবং প্রত্যক্ষ উৎপাদনমূলক ক্রিয়াকলাপের (DPA) স্বল্পতা থাকে, তবে a b c d e হল অসম উন্নয়নের পথ। উন্নয়ন যত সুষম হবে তত সামাজিক স্থির মূলধনের প্রাচুর্য ও প্রত্যক্ষ উৎপাদনমূলক ক্রিয়াকলাপের স্বল্পতা দূর হয়ে যাবে এবং সামাজিক স্থির মূলধনের অগ্রবর্তী ও পশ্চাদবর্তী সংযুক্তির প্রভাবে সমৃদ্ধির গতিপথ a বিন্দু থেকে c বিন্দু এবং c বিন্দু থেকে e বিন্দু এভাবে এগিয়ে যাবে। দেখা যাচ্ছে, অসম ভারসাম্যহীনতা থেকে সুষম ভারসাম্যের অবস্থার দিকে সমৃদ্ধির হার এগিয়ে যাচ্ছে।

স্বল্পোন্নত দেশগুলির জন্য হাশ্চম্যান এই ধরনের উন্নয়ন পন্থা অনুসরণ করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। কারণ, স্বল্পোন্নত দেশগুলিতে অনেক সময় বিশেষ একটি ক্ষেত্র জরুরি ভিত্তিতে অগ্রাধিকার পায় এবং সেজন্য সেক্ষেত্রে সুষম উন্নয়ন হবে এই আশা নিয়ে উৎপাদন প্রচেষ্টা চালানো সম্ভব নয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, ভারতের প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনা খাদ্য ও কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল-প্রথম পরিকল্পনায় দ্রুত শিল্পোন্নয়নের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। তখন বলা হয়েছিল, প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনায় কৃষি-উৎপাদন বাড়লে শিল্পক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় কাঁচামালের উৎপাদন বাড়বে এবং তার ভিত্তিতে দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধির উপর গুরুত্ব আরোপ করা হবে। দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় গুরুভার ও মূলধন শিল্পের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল। আবার তৃতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় কৃষি ও শিল্পে সুষম উন্নয়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল। এক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, প্রথম ও দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় অনুসৃত হয়েছিল স্বেচ্ছাকৃত অসম সমৃদ্ধি অর্জন করার নীতি এবং তৃতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ছিল সুষম সমৃদ্ধি অর্জন করা।

অসম সমৃদ্ধি সাধারণত অগ্রাধিকারভিত্তিক হয়ে থাকে; সবক্ষেত্রেই যে উৎপাদনের সংহতি বা ভারসাম্য বজায় থাকবে তা নয়।

৫.৬ প্রয়োগ-কৌশল নির্বাচন (Choice of Technique)

উৎপাদন ক্ষেত্রে প্রয়োগ-কৌশল বা উৎপাদন পদ্ধতি কী হবে তা নিয়ে বিতর্ক দেখা যায়। আমরা এক্ষেত্রে শ্রম-নিবিড় এবং মূলধন-নিবিড়, উভয় প্রকার উৎপাদন পদ্ধতির বিভিন্ন দিক আলোচনা করেছি। স্বল্পোন্নত দেশে জনসংখ্যার আধিক্য এবং উদ্বৃত্ত শ্রমিক সরবরাহ থাকে বলে শ্রম-নিবিড় পদ্ধতি (Labouréôé intensive Method of Production) প্রয়োগের ক্ষেত্রে অনেকে যুক্তি দেখিয়ে থাকেন। শ্রম-নিবিড় উৎপাদন পদ্ধতিতে মূলধন বিনিয়োগের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত কম। স্বল্পোন্নত দেশের পক্ষে প্রচুর পরিমাণ মূলধন বিনিয়োগ করা সম্ভব নয়। তাছাড়া এই পদ্ধতিতে অধিক পরিমাণ শ্রমিক বিভিন্ন উৎপাদনমূলক কাজে নিয়োগ করা হয় বলে বেকার সমস্যার মোকাবিলা করা সম্ভব হয়। অপরদিকে মূলধন-নিবিড় উৎপাদন পদ্ধতির (Capital-intensive Method of Production) পক্ষে প্রধান যুক্তি হল, বেশি করে মূলধন বিনিয়োগ করতে পারলে একটি দেশের পক্ষে সমৃদ্ধির হার দ্রুত বাড়ানো সম্ভব হয় এবং উন্নত ধরনের দ্রব্য

উৎপাদন করা সম্ভব হয়। তাছাড়া শিল্পোন্নয়নের ভিত মজবুত করার জন্যও মূলধন-নিবিড় উৎপাদন পদ্ধতি প্রয়োগ করার প্রয়োজন হয়। প্রয়োগ-কৌশল নির্বাচনের এই বিতর্ক সব সময়েই চলছে। তবে বর্তমান বিশ্বে বাণিজ্যের বিশ্বায়ন (Globalisation) খুব গুরুত্বপূর্ণ হওয়ায় বিভিন্ন দেশের মধ্যে শিল্প-বাণিজ্যে প্রতিযোগিতাও বেড়ে গেছে। এই প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে হলে এবং প্রতিযোগিতামূলক দক্ষতা বাড়াতে গেলে কোনো দেশের উদ্বৃত্ত শ্রম-শক্তি এবং বিনিয়োগযোগ্য মূলধনের দুষ্প্রাপ্যতার সমস্যাটিও উপেক্ষা করা যায় না।

অমর্ত্য সেন উন্নয়নশীল দেশে প্রয়োগ-কৌশলের নির্বাচন কীভাবে করা যেতে পারে সে সম্পর্কে একটি মডেল তৈরি করেছেন। এই প্রসঙ্গে আমরা এটা আলোচনা করতে পারি।

৫.৬.১ প্রয়োগ-কৌশল সম্পর্কে অমর্ত্য সেনের বিশ্লেষণ (Sen Criterion of the Choice of Technique)

অমর্ত্য সেন বিনিয়োগের বণ্টন ও পরিমাণ নির্ধারণে সময়ের উপাদানের (time element) উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। অমর্ত্য সেন ছাড়াও অধ্যাপক মরিস ডব (Maurice Dobb) প্রয়োগ-কৌশলের নির্বাচন নিয়ে একই ধরনের আলোচনা করেছেন। যদি বিনিয়োগ থেকে ফলপ্রাপ্তি দশ বছরের কম সময়ের ভিতর অর্জন করতে হয়, তবে সংশ্লিষ্ট দেশের পক্ষে শ্রম-নিবিড় উৎপাদন পদ্ধতি প্রয়োগ করা সমর্থনযোগ্য। অপরদিকে যদি বিনিয়োগ থেকে ফলপ্রাপ্তির জন্য দশ বছরেরও অধিককাল পর্যন্ত অপেক্ষা করা সম্ভব হয় তবে মূলধন-নিবিড় উৎপাদন পদ্ধতি প্রয়োগ করা সমর্থনযোগ্য।

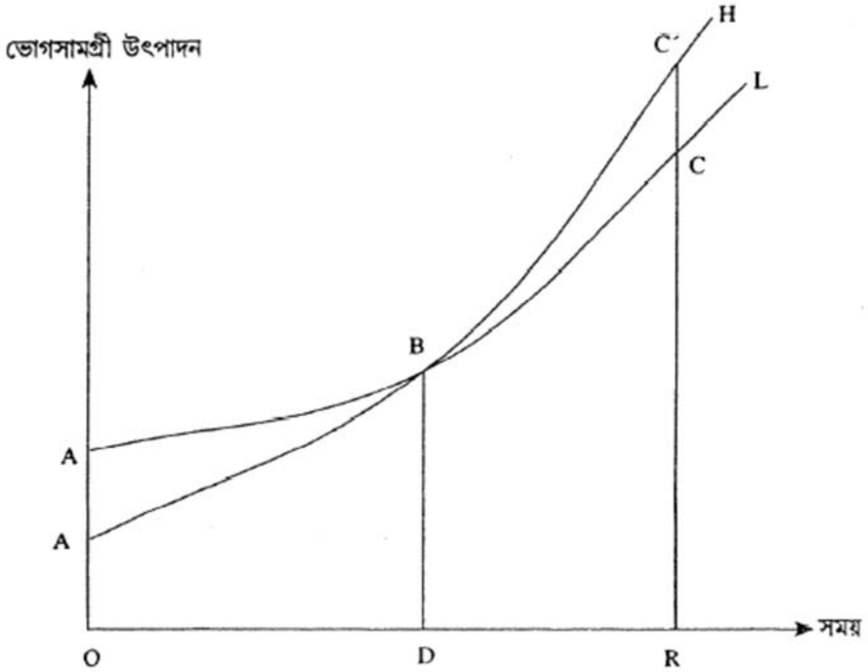

চিত্র : 1.6

এই সময়সীমা অনমনীয় নয়, এর এদিক-ওদিক হতে পারে। উপরের চিত্রে এটা বোঝানো হয়েছে। এই চিত্রে(৫.২) অনুভূমিক অক্ষে সময় এবং উল্লম্ব অক্ষে ভোগ-সামগ্রীর উৎপাদন ধরে নেওয়া হয়েছে।

এই চিত্রে H এবং L দুটি পদ্ধতির মাধ্যমে সময়ের ব্যবধানে প্রকৃত ভোগের প্রবাহ বোঝাচ্ছে। AL হল শ্রম-নিবিড় উৎপাদন পদ্ধতি এবং AH হল মূলধন-নিবিড় উৎপাদন পদ্ধতি। মূলধন-নিবিড় পদ্ধতি (A'H) থেকে স্বল্পকালে কম পরিমাণে উৎপাদন পদ্ধতি (AL) থেকে উন্নয়ন হার বেশি থাকে। এই চিত্রে ঙ্গ বিন্দুতে পৌঁছানোর আগে পর্যন্ত AL পদ্ধতিতে A'H পদ্ধতি অপেক্ষা বেশি উৎপাদন হচ্ছে। এর ফলে A'H পদ্ধতি, অর্থাৎ মূলধন-নিবিড় পদ্ধতি অনুসরণ করার ফলে উৎপাদনের মোট ফাঁক হচ্ছে ABA'। এরপর ট্র বিন্দুতে মূলধন-নিবিড় পদ্ধতি এই উৎপাদনের ফাঁক দূর করে দিচ্ছে CBC' এলাকাক্ষেত্র দ্বারা। অর্থাৎ, স্বল্পকালে শ্রম-নিবিড় উৎপাদন পদ্ধতি প্রয়োগের ফলে উৎপাদনের যে লাভ হচ্ছে এবং মূলধন-নিবিড় পদ্ধতির ক্ষেত্রে উৎপাদনের যে ক্ষতি হচ্ছে, দীর্ঘকালে মূলধন-নিবিড় পদ্ধতিতে উৎপাদন যা বেড়ে যায় তাতে এই ক্ষতি দূর হয়ে যায়। এই চিত্র অনুযায়ী OR হল উৎপাদন পুনরুদ্ধারের সময় (Period of Recovery), কারণ এই সময়ের মধ্যে সামগ্রিক ভোগের স্তর একই থাকে। যদি পুনরুদ্ধারের সময় অনেক দীর্ঘ হয় তবে গোড়ায় মূলধন-নিবিড় উৎপাদন পদ্ধতির প্রয়োগের ফলে আমরা যে উৎপাদন-হ্রাস দেখতে পাই, সেই ক্ষতি D বিন্দুর পর চট করে পূরণ করা যায় না। সেক্ষেত্রে আমাদের শ্রম-নিবিড় উৎপাদন পদ্ধতিই গ্রহণ করা উচিত। আবার পুনরুদ্ধারের সময় যদি কম হয়, অর্থাৎ, A'H পদ্ধতি থেকে উৎপাদনের যে প্রারম্ভিক ক্ষতি হয় সেটা পুনরুদ্ধার করতে যদি বেশি সময় না লাগে তবে মূলধন-নিবিড় উৎপাদন পদ্ধতি প্রয়োগ করা উচিত।

অমর্ত্য সেন নিম্নের ৫.৩ রেখাচিত্রের সাহায্যে প্রয়োগ-কৌশলের সমস্যার বিস্তৃত ব্যাখ্যা করেছেন।

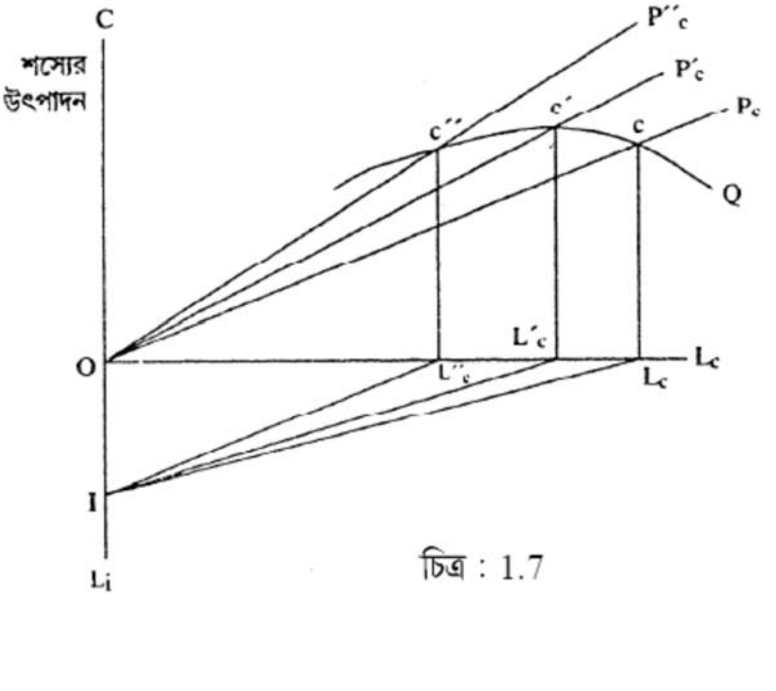

চিত্র : 1.7

এই চিত্রে (৫.৩) মূলধন-নিবিড়তার তিনটি মাত্রা দেখানো হয়েছে। OLcI হল প্রথম মাত্রা, OL'cI হল দ্বিতীয় মাত্রা এবং OL"cl হল তৃতীয় মাত্রা। প্রথম মাত্রায় শস্যের উৎপাদন হল CLc; দ্বিতীয় মাত্রায় শস্যের উৎপাদন হল C'L'c এবং তৃতীয় মাত্রায় শস্যের উৎপাদন হল C"L"c। Q হল উৎপাদন রেখা (output curve) এবং এই উৎপাদন রেখা শস্য উৎপাদন এবং শস্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে কর্মনিয়োগের মধ্যে সম্পর্ক বোঝাচ্ছে। মূলধন-নিবিড় উৎপাদন পদ্ধতির প্রথম মাত্রায় কর্মনিয়োগের পরিমাণ হল OLc; দ্বিতীয় মাত্রায় কর্মনিয়োগের পরিমাণ হল OL'c এবং তৃতীয় মাত্রায় কর্মনিয়োগের পরিমাণ হল OL"c।

প্রয়োগ-কৌশল নির্বাচনের ক্ষেত্রে অমর্ত্য সেনের মতে পুনরুদ্ধারের সময় (period of recovery) এবং পরিকল্পার সময়-এই দুটির তুলনা করতে হবে। কোনো অর্থনীতিতে যদি দ্রুত সমৃদ্ধি অর্জন করতে হয়, তবে একটি নির্দিষ্ট সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে সমৃদ্ধির সর্বাধিক হার অর্জন করতে হবে। সেক্ষেত্রে মূলধন-নিবিড় উৎপাদন পদ্ধতি অনুসৃত হলে সাময়িকভাবে বর্তমানে ভোগ-সামগ্রীর উৎপাদন কম হলেও চূড়ান্ত পর্যায়ের ভোগ-সামগ্রীর উৎপাদন বাড়বে এবং বর্তমানের ঘাটতি দূর করবে। সুতরাং প্রয়োগকৌশল নির্বাচনের সঙ্গে পুনরুদ্ধারের সময় ও পরিকল্পনার সময় জড়িত। প্রকৃত সমস্যা হল, সঠিক প্রয়োগকৌশল (appropriate technology) নির্বাচন করা। কোনো দেশের পক্ষে সঠিক প্রয়োগকৌশল কী হবে অর্থাৎ কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে শ্রম-নিবিড় পদ্ধতি এবং কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে মূলধন-নিবিড় পদ্ধতি গৃহীত হবে, সেটা সেই দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো ও অবস্থার ওপর নির্ভর করে।

৫.৬.২ শ্রম-নিবিড় বনাম মূলধন-নিবিড় উৎপাদন পদ্ধতি (LabouréôéIntensive versus CapitaléôéIntensive Methods of Production)

কোনো উন্নতিকামী দেশের পক্ষে একটি প্রধান সমস্যা হল, উন্নয়নের পদ্ধতি মনোনয়ন করা (choice of technique)-অর্থাৎ কি পদ্ধতিতে উৎপাদন বাড়ানো হবে তা স্থির করা। উন্নতিকামী দেশের পক্ষে দুটি উৎপাদন পদ্ধতি খোলা আছে-একটি হল শ্রম-নিবিড় উৎপাদন পদ্ধতি (Labour-Intensive method of production) এবং অপরটি হল মূলধন-নিবিড় উৎপাদন পদ্ধতি (CapitaléôéIntensive method of production)।

শ্রম-নিবিড় উৎপাদন পদ্ধতির অর্থ হল মূলধনের পরিমাণ বেশি না বাড়িয়ে মূলধনের অনুপাতে অধিক সংখ্যক শ্রমিক নিয়োগ করে উৎপাদন বাড়ানোর প্রচেষ্টা। অপরদিকে মূলধন-নিবিড় উৎপাদন পদ্ধতির অর্থ হল, শ্রমের অনুপাতে অধিক মাত্রায় বেশি মূলধন বিনিয়োগ করে বা প্রয়োগ করে উৎপাদন বাড়ানোর প্রচেষ্টা।

শ্রম-নিবিড় উৎপাদন পদ্ধতির পক্ষে যুক্তি-উন্নতিকামী দেশে, বিশেষ করে ভারতের মতো দেশে যেখানে জনসংখ্যার চাপ বেশি এবং বেকার সমস্যার তীব্রতা খুব বেশি অধিক সংখ্যক শ্রমিক নিয়োগ করে যন্ত্রপাতির প্রবর্তন সীমিত রাখা উচিত। কারণ প্রথমত, অধিক যন্ত্রপাতির প্রবর্তনে শিল্পক্ষেত্রে শ্রমিক ছাঁটাইয়ের সম্ভাবনা থাকে। তার ফলে বেকার সমস্যার তীব্রতা আরও বেড়ে যাবে।

দ্বিতীয়ত, অনগ্রসর বা উন্নতিকামী দেশের পক্ষে অধিক পরিমাণ মূলধন বিনিয়োগ করা সম্ভব নয়।

মূলধনের স্বল্পতা থাকায় মূলধন-নিবিড় উৎপাদন পদ্ধতি প্রয়োগ করতে হলে বিদেশ থেকে মূলধন আমদানি করতে হবে-তার ফলে দেশের বহির্বাণিজ্যের লেনদেনের ওপর (balance of payments) চাপ পড়বে এবং বৈদেশিক বিনিময় মুদ্রার সংকট বাড়বে। সেজন্য মূলধন-নিবিড় উৎপাদন পদ্ধতির পরিবর্তে শ্রম-নিবিড় উৎপাদন পদ্ধতির প্রয়োগ এক্ষেত্রে বেশি কাম্য। তাছাড়া শ্রম-নিবিড় উৎপাদন পদ্ধতির প্রয়োগ করা হলে মুদ্রাস্ফীতির সম্ভাবনা অপেক্ষাকৃত কম থাকে।

তৃতীয়ত, অনগ্রসর দেশগুলিতে উন্নত ধরনের প্রযুক্তিবিদ্যার প্রয়োগ এখনও হয়নি। সুতরাং সেক্ষেত্রে মূলধন-নিবিড় উৎপাদন পদ্ধতি ব্যয়বহুল হবে। বরং শ্রম-নিবিড় উৎপাদন পদ্ধতির প্রয়োগ করলে এক্ষেত্রে উৎপাদন খরচ অনেক কম হবে।

চতুর্থত, শ্রম-নিবিড় উৎপাদন পদ্ধতিতে শ্রমিকদের মজুরি বাড়ে এবং তার ফলে তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়।

সর্বশেষে শ্রম-নিবিড় উৎপাদন পদ্ধতিতে অধিক পরিমাণে মজুরি দ্রব্য (wage goods) অর্থাৎ, মজুরির ভিত্তিতে শ্রমিক নিয়োগ করে দ্রব্যের উৎপাদন, মুদ্রাস্ফীতির প্রতিষেধক হিসাব বিবেচিত হয়। কারণ, মজুরি দ্রব্যের উৎপাদন ব্যয় কম থাকে এবং এজন্য এই দ্রব্যগুলির দামও অপেক্ষাকৃত কম থাকে। উদ্বৃত্ত শ্রমশক্তিসম্পন্ন গরিব দেশে অধিক পরিমাণে মজুরি দ্রব্য উৎপাদন আর্থিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখার সহায়ক হয় বলে মনে করা হয়। দেশের কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্পগুলিকে টিকিয়ে রাখার জন্যও শ্রম-নিবিড় উৎপাদন পদ্ধতি কার্যকর হয়।

শ্রম-নিবিড় উৎপাদন পদ্ধতির বিপক্ষে যুক্তি শ্রম-নিবিড় উৎপাদন পদ্ধতির বিপক্ষে প্রধান যুক্তি হল এই পদ্ধতিতে দেশের উন্নয়ন হার (growth-rate) দ্রুত বাড়ানো সম্ভব নয়। অধিকতর মূলধন বিনিয়োগের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি দ্রুত হয়, এবং মেশিনের সাহায্যে উৎপাদন করলে উৎপাদিত সামগ্রীর উৎকর্ষ বেশি হয়। উৎপাদনের পরিমাণ এবং উৎপাদন বৃদ্ধির হার সর্বাধিক করার জন্য মূলধন-নিবিড় উৎপাদন পদ্ধতির প্রয়োগ অধিকতর কাম্য। শ্রম-নিবিড় উৎপাদন পদ্ধতিতে উন্নত প্রযুক্তিবিদ্যার প্রয়োগ সম্ভব নয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় কম্পিউটারের মাধ্যমে উৎপাদন পদ্ধতির উন্নয়ন এবং শ্রম-নিবিড় উৎপাদন পদ্ধতি পরস্পরবিরোধী। কারণ, কম্পিউটার প্রবর্তিত হলে উৎপাদন ক্ষেত্রে উদ্বৃত্ত শ্রমিকের সংখ্যা বেড়ে যাবে।

শ্রম-নিবিড় উৎপাদন পদ্ধতির বিপক্ষে আরেকটি যুক্তি হল স্বল্পোন্নত দেশে শ্রমিকদের কারিগরি দক্ষতা কম থাকে। এর ফলে ক্রেতাদের চাহিদা ও রুচি অনুযায়ী উৎকৃষ্ট দ্রব্য তৈরি করা এবং উৎপাদনে 'বৈচিত্র্য আনা সব সময় সম্ভব হয় না। তাছাড়া এমন অনেক দ্রব্য আছে যেগুলি উৎপাদন করার জন্য আধুনিক যন্ত্রপাতির প্রয়োজন। প্রতিযোগিতামূলক বাজারে অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক উভয় ধরনের বাজারেই মূলধনী দ্রব্য উৎপাদন করা একান্ত প্রয়োজনীয়। শ্রম-নিবিড় উৎপাদন পদ্ধতির মাধ্যমে মূলধনী দ্রব্য উৎপাদন করা সম্ভব হয় না।

মূলধন-নিবিড় উৎপাদন পদ্ধতির পক্ষে যুক্তি উৎপাদনের পরিমাণ এবং উৎপাদন বৃদ্ধির হার সর্বাধিক হবার জন্য মূলধন-নিবিড় উৎপাদন পদ্ধতির প্রয়োগ অপরিহার্য। যন্ত্রপাতির প্রবর্তনের মাধ্যমে উৎপাদিত সামগ্রীর উৎকর্ষ বাড়ানো এবং উৎপাদন পদ্ধতি নিখুঁত করা সম্ভব হয়। তাছাড়া উন্নত ধরনের প্রযুক্তিবিদ্যার

প্রয়োগও মূলধন-নিবিড় উৎপাদন পদ্ধতির মাধ্যমেই সম্ভব। উদাহরণ হিসাবে কম্পিউটারের প্রবর্তনের মাধ্যমে উৎপাদন পদ্ধতি উন্নত করার কথা বলা যেতে পারে।

মূলধন-নিবিড় উৎপাদন পদ্ধতির পক্ষে সবচেয়ে বড় যুক্তি হল, স্বল্পোন্নত দেশকে যদি শিল্পোন্নত দেশে পরিণত করতে হয় তবে দেশে মৌলিক ও গুরুভার শিল্পগুলিতে উৎপাদন ক্ষমতা এবং উৎপাদন উভয়ই বাড়ানো দরকার এবং এজন্য আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা দরকার ও প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে বিদেশি প্রযুক্তির সাহায্য গ্রহণ করা দরকার। মূলধন-নিবিড় উৎপাদন পদ্ধতি প্রয়োগ করেই এটা করা যেতে পারে।

মূলধন-নিবিড় উৎপাদন পদ্ধতি প্রয়োগ করা হলে প্রাথমিকভাবে মূলধন-ব্যয় বেড়ে গেলেও চূড়ান্ত পর্যায়ে উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইউনিট পিছু উৎপাদন ব্যয় কমে আসে। তাছাড়া স্থায়ী ভোগ-সামগ্রী (durable consumer goods) উৎপাদনের জন্যও আধুনিক যন্ত্রপাতির প্রয়োজন; মূলধন-নিবিড় উৎপাদন পদ্ধতির প্রয়োগের মাধ্যমেই এটা সম্ভব হয়। ইস্পাত উৎপাদন, মোটর গাড়ি উৎপাদন, রেলওয়ে ওয়াগন উৎপাদন এবং উন্নত ধরনের যন্ত্রপাতি ও মূলধনী দ্রব্য উৎপাদনের জন্য কখনই শ্রম-নিবিড় উৎপাদন পদ্ধতি প্রয়োগের ওপর নির্ভর করা যায় না-এক্ষেত্রে মূলধন-নিবিড় উৎপাদন পদ্ধতিই প্রয়োগ করতে হয় এবং তার ফলেই দেশে উন্নয়ন হার বাড়তে পারে ও কর্মসংস্থানের সম্প্রসারণও হতে পারে।

মূলধন-নিবিড় উৎপাদন পদ্ধতির বিপক্ষে যুক্তি মূলধন-নিবিড় উৎপাদন পদ্ধতির বিপক্ষে প্রধান যুক্তি হল, দেশে অতিরিক্ত শ্রমিক সরবরাহ থাকলে অধিক অনুপাতে যন্ত্রপাতি প্রবর্তন বেকার সমস্যার তীব্রতা বাড়িয়ে দেয়। কারণ, তাতে শ্রমিক ছাঁটাইয়েরও সম্ভাবনা থাকে-তাছাড়া শ্রমিকদের কর্মনিযুক্তির সম্ভাবনাও কমে যায়।

দ্বিতীয়ত, মূলধন-নিবিড় উৎপাদন পদ্ধতির প্রয়োগ খুবই ব্যয়সাধ্য। অনগ্রসর দেশে মূলধনের স্বল্পতা থাকায় মূলধন-নিবিড় উৎপাদন পদ্ধতির প্রয়োগের জন্য দেশকে প্রচুর মূল্য দিতে হয়। কৃষি ও শিল্পক্ষেত্রে অধিক পরিমাণ মূলধন বিনিয়োগ করার জন্য বিদেশ থেকে সাহায্য গ্রহণ করতে হয় এবং তার ফলে বৈদেশিক বাণিজ্যে লেনদেনের ওপর চাপ সৃষ্টি হয় ও বৈদেশিক বিনিময় মুদ্রার সংকট বাড়ে।

তৃতীয়ত, অনগ্রসর দেশে তাড়াহুড়ো করে উন্নত ধরনের প্রযুক্তিবিদ্যার প্রয়োগ সম্ভব নয়। মূলধন-নিবিড় উৎপাদন পদ্ধতির সঙ্গে সঙ্গে প্রযুক্তিবিদ্যারও পরিবর্তন হয়। অনগ্রসর দেশের শ্রমিকদের পক্ষে উন্নত ধরনের প্রযুক্তিবিদ্যার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে সময় লাগে; কারণ, তারা যথেষ্ট কর্মনিপুণ (skilled) নয়। চতুর্থত, মূলধন-নিবিড় উৎপাদন পদ্ধতি প্রয়োগে মুদ্রাস্ফীতির সম্ভাবনা থাকে। অধিক মূলধন বিনিয়োগের সঙ্গে সঙ্গে দেশে মুদ্রা সরবরাহ এবং জনসাধারণের ক্রয়শক্তি উভয়ই বাড়ে। অথচ মূলধন বিনিয়োগের সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদন বাড়ে না। মূলধন-বিনিয়োগ এবং উৎপাদন বৃদ্ধির মধ্যে সময়ের ব্যবধান (gestation lag) থাকে তার ফলে মুদ্রাস্ফীতির সৃষ্টি হয়। সর্বক্ষেত্রে স্বল্পোন্নত দেশে মূলধন-নিবিড় উৎপাদন পদ্ধতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে শ্রমিকদের উপযুক্ত কারিগরি দক্ষতার অভাব সমস্যার সৃষ্টি করে।

৫.৭ বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বিভিন্ন লক্ষণ (Investment Criteria)

বিনিয়োগের পরিমাণ ও হার নির্ধারণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন লক্ষণ আলোচিত হয়েছে। যেমন, মূলধন-উৎপাদন অনুপাতের (Capital-Output Ratio) ভিত্তিতে বিনিয়োগ নির্ধারণ, সামাজিক প্রান্তিক উৎপাদনের (Social Marginal Productivity) ভিত্তিতে বিনিয়োগ নির্ধারণ এবং গ্যালেনসন এবং লিবেনষ্টিন (Galenson and Leibenstein) প্রান্তিক মাথাপিছু পুনর্বিনিয়োগের পরিমাণ সর্বাধিক করাকে বিনিয়োগের অন্যতম লক্ষণ হিসাবে বিবেচনা করেছেন। প্রান্তিক মাথাপিছু পুনর্বিনিয়োগের (Marginal Per Capita Reéôé investment) ভিত্তিতে বিনিয়োগ নির্ধারণ।

৫.৭.১ মূলধন-উৎপাদন অনুপাতের লক্ষণ (Capital-Output Ratio Criterion)

হ্যারড (Harrod) প্রদত্ত সমৃদ্ধি মডেল অনুযায়ী সমৃদ্ধির হার সঞ্চয়-আয় অনুপাত (S) এবং মূলধন-উৎপাদন অনুপাতের (C) সঙ্গে জড়িত। এই মডেল অনুযায়ী G =s/c; এক্ষেত্রে G হল সমৃদ্ধির হার, S হল সঞ্চয়-আয় অনুপাত এবং C হল মূলধন-উৎপাদন অনুপাত। বিনিয়োগ কতটা করা উচিত সেটা নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে অনেক সময়েই মূলধন-উৎপাদন অনুপাত বিবেচনা করা হয়। মূলধন-উৎপাদন অনুপাত কম হলে মূলধনের উৎপাদনী শক্তি বেশি হয় এবং মূলধন-বিনিয়োগের ওপর প্রতিদানের হার (rate of return) বেশি হয়। মূলধন-উৎপাদন অনুপাত হল বর্ধিত আয়-বিনিয়োগ অনুপাতের (dY/I) বিপরীত, অর্থাৎ মূলধন-উৎপাদন অনুপাত (I/(dY)) হল বিনিয়োগ এবং বর্ধিত আয় বা উৎপাদনের অনুপাত। অর্থাৎ আয়-বিনিয়োগের অনুপাতকে সর্বাধিক করতে পারলেই মূলধন-উৎপাদন অনুপাত সর্বনিম্ন করা সম্ভব হয়। পোলক (Polok) এবং বুকানন (Buchanon) এভাবে এটা ব্যাখ্যা করেছেন।

সর্বনিম্ন (I/dY) অথবা (It/ Yt Yt-1) = (dKt+1/d Yt Yt-1) অর্থাৎ (dY/I) করায় বিনিয়োগের ভিত্তি হওয়া উচিত। এক্ষেত্রে I হোল বিনিয়োগ জ্ঞ হোল মূলধন Y হোল আয় বা উৎপাদন’

সর্বনিম্ন $\frac{I}{dY}$ অথবা $\frac{I_t}{y_{t+1}-y_t}=\frac{dK_{t+1}}{y_{t+1}-y_t}$ অর্থাৎ, $\frac{dy}{I}$ করাই বিনিয়োগের ভিত্তি হওয়া উচিত।

এক্ষেত্রে I হল বিনিয়োগ, y হল আয় বা উৎপাদন এবং K হল মূলধন।

1.8 চিত্রে বর্ধিত মূলধন-উৎপাদন অনুপাত এবং গড় মূলধন-উৎপাদন দেখানো হয়েছে।

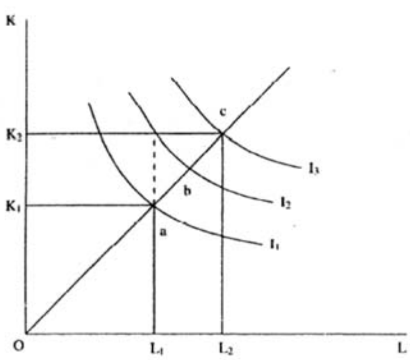

চিত্র : 1.8

৫.৪ চিত্রে I1, I2, I3 হল কয়েকটি সম উৎপাদন রেখা (isoquants); উল্লম্ব অক্ষে মূলধন (K) এবং অনুভূমিক অক্ষে শ্রম (L) ধরা হয়েছে। I1 সম-উৎপাদন রেখায় থ হল ভারসাম্য বিন্দু এবং এক্ষেত্রে মূলধন হল OK1এবং শ্রম হল OL1 যদি মূলধনের পরিমাণ OK1 থেকে OK2পর্যন্ত বাড়ানো হয় অথচ শ্রমের পরিমাণ অপরিবর্তিত রাখা হয়; তবে উৎপাদন ab পরিমাণ বাড়বে।

এক্ষেত্রে (K1K2/(ab) হল প্রান্তিক বা বর্ধিত মূলধন-উৎপাদন অনুপাত (incremental capitaléôéoutput ratio)। যদি শ্রমের পরিমাণ OL1 থেকে OL2 পর্যন্ত বাড়ানো হয়, অথচ মূলধনের পরিমাণ স্থির রাখা হয়, তবে উৎপাদন খত্ব পরিমাণ বাড়ছে। এক্ষেত্রে মূলধন-উৎপাদন অনুপাত (Capital output ratio) হল (K1K2/(ac) : এক্ষেত্রে গড় মূলধন-উৎপাদন অনুপাত (average capital -output ratio) হল (OK1/(Oa)

মূলধন-উৎপাদন অনুপাতের ভিত্তিতে বিনিয়োগ নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে দুটি শর্ত পূরণ হওয়া দরকার। একটি হল, এই অনুপাতের স্থিতিশীল (stable) হওয়া দরকার এবং অপরটি হল, এই অনুপাত যতটা সম্ভব কম (low) হওয়া দরকার।

মূলধন-উৎপাদন অনুপাত গড় অনুপাত (average ratio) এবং প্রান্তিক অনুপাত (marginal ratio) হতে পারে। এক্ষেত্রে প্রশ্ন হল, কোন্ মূলধন-উৎপাদন অনুপাতের ভিত্তিতে বিনিয়োগের সম্পদ বণ্টন করতে হবে? এই অনুপাত কি গড় অনুপাত হবে অথবা প্রান্তিক বা বর্ধিত অনুপাত হবে? তাছাড়া, আরও একটি প্রশ্ন হল, এই অনুপাত কি স্থূল (gross) অনুপাত হবে, অথবা নীট (net) অনুপাত হবে?

এমন হতে পারে, একই প্রকল্প হয়ত নীট প্রান্তিক মূলধন-উৎপাদন অনুপাতের ভিত্তিতে গ্রহণযোগ্য হতে পারে, আবার স্থূল -প্রান্তিক মূলধন-উৎপাদন অনুপাতের ভিত্তিতে গ্রহণযোগ্য না-ও হতে পারে। সুতরাং স্থূল অনুপাতের ভিত্তিতে প্রকল্পটি বিবেচিত হবে অথবা নীট অনুপাতের ভিত্তিতে বিবেচিত হবে-সেটা নির্ভর করে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্তর এবং অর্থনীতিতে কাঠামোগত রূপান্তরের হারের ওপর। যদি অর্থনীতির কাঠামোর রূপান্তরের হার (rate of transformation) খুব উঁচু হয় তবে আন্তঃক্ষেত্র মূলধনের আনাগোনা বেশি হবে এবং অবচয়ের (depreciation) হারও উঁচু হবে; সেক্ষেত্রে মূলধন-উৎপাদনে অনুপাতের স্থূল হিসাব অধিকতর কার্যকর হবে।

আবার মূলধন-উৎপাদন অনুপাত একটি নির্দিষ্ট সময়ে হিসাব করলেও উৎপাদনের প্রবাহ বহু বছর ধরে চলতে থাকে। উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উপাদানের ব্যবহারও চলতে থাকে। বর্তমানে যে মূলধন বিনিয়োগ করা হবে তার সুফল পাওয়া যেতে পারে ভবিষ্যতে। সুতরাং বর্ধিত মূলধনের সঙ্গে উৎপাদনের অনুপাত এক্ষেত্রে প্রকল্পটির যথার্থতা সম্পর্কে সঠিক তথ্য না-ও দিতে পারে। স্বল্পোন্নত দেশগুলিতে মূলধন-উৎপাদন অনুপাত অর্থনৈতিক উন্নয়নের পদ্ধতি হিসাবে সব সময় গ্রহণযোগ্য নয়। দেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রের উৎপাদন লক্ষ্য অনুযায়ী মূলধনের সামগ্রিক প্রয়োজনের ভিত্তিতে গড় মূলধন-উৎপাদন অনুপাত নির্ধারণ করা হয়। সমগ্র দেশের পক্ষে মূলধন-উৎপাদন স্থির থাকলেও দেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ক্ষেত্রভিত্তিক মূলধন-উৎপাদন ভিন্ন হতে পারে।

কৃষি-উৎপাদন কোনো স্বল্পোন্নত দেশেই স্থির থাকে না; স্বল্পোন্নত দেশের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ (অনেক দেশে বৃহৎ অংশ) আসে কৃষিক্ষেত্র থেকে। দেশে সময়মত উপযুক্ত পরিমাণ বৃষ্টিপাতের অনিশ্চয়তা থাকলে কৃষিক্ষেত্রের উৎপাদনেও অনিশ্চয়তা থাকে। এজন্য দেখা যায়, স্বল্পোন্নত দেশে মূলধন-উৎপাদন অনুপাত স্থিতিশীল থাকে না। তাছাড়া স্বল্পোন্নত দেশগুলিতে মূলধন-উৎপাদনের অনুপাতও অপেক্ষাকৃত বেশি থাকে। বিগত একশত বছরেরও অধিককাল ব্রিটেনে মূলধন-উৎপাদন অনুপাত মোটামুটিভাবে স্থিতিশীল ছিল। ১৮৭০ সালে এই অনুপাত ছিল ৩.৭; ১৮৯০ সালে তা কমে দাঁড়ায় ৩.৩ এবং ১৯১২ সালে আবার বেড়ে দাঁড়ায় ৩.৯। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর এটা দাঁড়ায় ৩.৬। অনুরূপভাবে জার্মানিতেও এটা ৩.৫ থেকে ৩.৬-এর মধ্যে ছিল। অপরদিকে ভারতে বর্ধিত মূলধন-উৎপাদন অনুপাত (Incremental Capital-Output Ratio) তৃতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় ছিল ৪.৫৮; ১৯৭৩-৭৪ সালে এবং ১৯৮০-৮১ থেকে ১৯৮৩-৮৪ সালে ছিল ৪.৪৫; অষ্টম পাঁচসালা পরিকল্পনায় বর্ধিত মূলধন-উৎপাদন অনুপাত হয়েছিল ৪.২৪ এবং নবম পাঁচসালা পরিকল্পনায় এটা ধরা হয়েছে ৪.০৮। শুধু ভারতবর্ষই নয়, অন্যান্য উন্নতিকামী দেশগুলিতেও মূলধন-উৎপাদন অনুপাত যথেষ্ট বেশি এবং পরিবর্তনশীল। এজন্য স্বল্পোন্নত দেশগুলির ক্ষেত্রে মূলধন-উৎপাদন অনুপাত পরিকল্পনার অন্যতম পদ্ধতি হিসাবে সর্বদা গ্রহণযোগ্য নয়।যদি মূলধন-উৎপাদন অনুপাত স্থির থাকে এবং যদি এই অনুপাত কম থাকে তবেই পরিকল্পনার অন্যতম পদ্ধতি এবং বিনিয়োগের ভিত্তি হিসাবে মূলধন-উৎপাদন অনুপাত গ্রহণযোগ্য হতে পারে।

৫.৭.২ সামাজিক প্রান্তিক উৎপাদনের লক্ষণ (Social Marginal Productivity Criterion)

সামাজিক প্রান্তিক উৎপাদনের লক্ষণ অনুযায়ী কোনো প্রকল্প নির্বাচনের ক্ষেত্রে তার ব্যক্তিগত বা বেসরকারি লাভের সম্ভাবনা অথবা ব্যক্তির প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা বিবেচ্য নয়-যে জিনিসটি এক্ষেত্রে বিবেচনা করতে হবে তা হল, প্রকল্পটির সামাজিক প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা। এই যুক্তিটির অবতারণা করেছন কান (Kahn) এবং চেনেরি (Chenery)। এই তত্ত্ব অনুযায়ী যে মূলধন বিনিয়োগ করা হচ্ছে তার অনুপাত সমাজের কাছে উৎপাদনের বার্ষিক মূল্য কত এবং তার সামাজিক ব্যয়ভার কত এই দুটির পার্থক্য বিবেচনা করতে হবে। অর্থাৎ,

$$(MP=SV-C)/K$$

এক্ষেত্রে K হল মূলধন বিনিয়োগের পরিমাণ, V হল সমাজের কাছে উৎপাদনের মূল্য এবং C হল বিনিয়োগের সামাজিক ব্যয়ভার। ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে ব্যয়ভার উপাদানগুলির বাজার-দামের ওপর (যেমন-মজুরি হার, সুদের হার প্রভৃতি) নির্ভরশীল। কিন্তু সামাজিক ব্যয়ভার বলতে সমাজের পক্ষে উপাদানগুলির সুযোগ-ব্যয় বা বিকল্প-ব্যয় (opportunity cost to society) কত তা বিবেচনা করতে হবে। এই সামাজিক সুযোগ-ব্যয় অনেক সময় ‘ছায়া মূল্য’ (Shadow price) হিসাবে অভিহিত হয়। এই ছায়া মূল্য উপাদানের বাজার-দাম থেকে আলাদ, দতবে এই মূল্যে উপাদানের প্রান্তিক উৎপাদনী শক্তি প্রতিফলিত হয়।

কোনো বিনিয়োগের সামাজিক প্রভাব কী হবে তা সঠিকভাবে বিবেচনা করতে হলে প্রথমে প্রতি

ইউনিট বিনিয়োগের জন্য ব্যক্তিগত পর্যায়ে কতটা প্রতিদান পাওয়া যায় তা বিবেচনা করতে হবে। এই বিবেচনার সঙ্গে সঙ্গে প্রথমত, বাণিজ্য শুল্ক (Tariffs) ও কর (Taxes) বাবদ কত প্রদান করতে হল এবং ভরতুকি বাবদ (Subsidies) কত পাওয়া গেল তা বাদ দিতে হবে। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দ্রব্য আমদানি করার খরচের সঙ্গে অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের সামাজিক মূল্যের সমতা ধরে নিতে হবে। দ্বিতীয়ত, উৎপাদনের বাহ্যিক অর্থনৈতিক সুবিধা (external economies), অর্থাৎ অন্য উৎপাদকের কাছে দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাস্রোতের বিক্রয়-মূল্যের ওপরেও বাড়তি মূল্য বা সুবিধা কী হতে পারে তা বিবেচনা করতে হবে। তৃতীয়ত, যদি বিনিয়োগের মাধ্যমে অব্যবহৃত সম্পদগুলির ব্যবহার করা সম্ভব হয়, তবে এই সম্পদগুলি ব্যবহারের সামাজিক ব্যয়ভার বিবেচনা করতে হবে-এগুলির জন্য কত খাজনা দেওয়া হল অথবা এজন্য কত মজুরি দেওয়া হল তা বিবেচনা করতে হবে না। এই বিবেচনাগুলি গৃহীত হলে সামাজিক প্রান্তিক উৎপাদনশীলতার লক্ষণটি এভাবে বিবৃত করা যেতে পারে-

$$SMP = \frac{V'}{K} - \frac{C'}{K} + \frac{Br}{K}$$

এক্ষেত্রে K হল মূলধন বিনিয়োগ বৃদ্ধি, V' হল সমাজের কাছে অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের বাৎসরিক মূল্য, C' হল উপাদানগুলির সামাজিক ব্যয়ভার, Br হল বৈদেশিক লেনদেন ব্যালান্সের প্রভাব। চেনেরি (Chenery) মনে করেন যে, বৈদেশিক লেনদেন ব্যালান্সের (Balance of Payments) ওপর কোনো প্রকল্পের সম্ভাব্য প্রভাব সামাজিক প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা হিসাবের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত।

চেনেরির মতে সামাজিক প্রান্তিক উৎপাদনশীলতার ভিত্তিতে বিভিন্ন প্রকল্পের ক্রমিক মান বা গ্রহণযোগ্যতা বিবেচনা করার ক্ষেত্রে যে প্রকল্পটির সর্বোচ্চ প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা থাকবে সেটিই বিনিয়োগের জন্য গৃহীত হওয়া উচিত। প্রকৃতপক্ষে বিনিয়োগের জন্য বরাদ্দ অর্থ এমনভাবে বণ্টিত

হওয়া উচিত যাতে বিভিন্ন প্রকল্পের প্রান্তিক উৎপাদনীশক্তি সমান হয়।

চেনেরি (Chenery) প্রদত্ত তত্ত্বটির সমালোচনায় বলা যেতে পারে যে স্বল্পোন্নত দেশগুলিতে বাজারের মূল্যস্তরে সামাজিক ব্যয় এবং সামাজিক সুবিধার প্রতিফলন ঘটে না। এক্ষেত্রে উপাদানগুলির 'ছায়া মূল্য' (Shadow price) ব্যবহার করতে হয়।

দ্বিতীয়ত, যদি শ্রমের বা অন্য কোনো উপাদানের সামাজিক সুযোগ-ব্যয় শূন্য থাকে তবে সামাজিক উৎপাদনশীলতার লক্ষণটি মূলধন প্রতিদানের লক্ষণের (capital turnover criterion) অনুরূপ হয়। তৃতীয়ত, সামাজিক প্রান্তিক উৎপাদনশীলতার লক্ষণটি স্থিতিশীল বিশ্লেষণের ওপর ভিত্তিশীল। বিনিয়োগের প্রভাবে আয়ের গঠন, বণ্টন ও প্রবাহের ওপর যে দীর্ঘকালীন পরিবর্তন হয়, এই তত্ত্বে তা বিবেচিত হয়নি।

চতুর্থত, এই তত্ত্বে অর্থনীতির কাঠামোগত পারস্পরিক নির্ভরশীলতা এবং বাহ্যিক অর্থনৈতিক সুবিধার স্বরূপ ও মূল্য বিবেচিত হয়নি।

পঞ্চমত, এই তত্ত্ব স্বল্পোন্নত দেশগুলির লক্ষ্য হিসাবে বর্তমান সামাজিক কল্যাণ সর্বাধিক করার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে-ভবিষ্যতে সামাজিক কল্যাণ কতটা হবে বা হওয়া উচিত সেই সম্পর্কে এই তত্ত্বে কিছু বলা হয়নি। বর্তমানে অনেকে মনে করেন যে স্বল্পোন্নত দেশগুলির উচিত এমনভাবে সমৃদ্ধির হার বাড়ানো যাতে ভবিষ্যৎ কল্যাণ সর্বাধিক হয়।*

৫.৭.৩ গ্যালেনসন ও লিবেনষ্টিন প্রদত্ত প্রান্তিক মাথাপিছু পুনর্বিনিয়োগের সহগ সর্বাধিক করার লক্ষণ (Galenson-Leibenstein Criterion of Maximising Marginal Per Capita Reéôéinvestment Quotie)

গ্যালেনসন (Galenson) লিবেনষ্টিন (Leibenstein) মনে করেন, বিনিয়োগের জন্য নির্ধারিত সম্পদ এমনভাবে বণ্টিত হওয়া উচিত যাতে ভবিষ্যতে উৎপাদন এবং ভোগ উভয়ের পরিমাণই সর্বাধিক হয়। এজন্য প্রয়োজন হল, জনসমষ্টির যারা বর্তমানে কাজে নিযুক্ত আছে তাদের বর্তমান মাথাপিছু উৎপাদন সর্বাধিক করা যাতে ভবিষ্যতে পুনর্বিনিয়োগের জন্য সর্বাধিক পরিমাণ সঞ্চয় সংগৃহীত হয়। গ্যালেনসন এবং লিবেনষ্টিন মাথাপিছু পুনর্বিনিয়োগের সহগ সর্বাধিক করার জন্য যে তত্ত্বটি আলোচনা করেছেন তাতে উৎপাদনের প্রয়োগ-কৌশল কী হওয়া উচিত সে সম্পর্কেও কিছু বক্তব্য আছে। তাঁদের মতে উৎপাদন পদ্ধতি মূলধন-নিবিড় হওয়া উচিত।

গ্যালেনসন ও লিবেনষ্টিনের মতে মূলধনের প্রতি ইউনিটের বর্তমান বিনিয়োগের ক্ষেত্রে পুনর্বিনিয়োগের হার (rate of reinvestment) নিম্নোক্ত সমীকরণের সাহায্যে বোঝানো যেতে পারে,

r = SP-ewV/K

এক্ষেত্রে r হল পুনর্বিনিয়োগের হার, P হল মেশিনপ্রতি নীট উৎপাদন, e হল মেশিনপ্রতি শ্রমিকের সংখ্যা, K হল মেশিনপ্রতি ব্যয় এবং ন্ত্র হল প্রকৃত মজুরি হার। যদি মজুরিপ্রাপ্ত অর্থ পুরোটাই ভোগের জন্য ব্যয়িত হয় এবং মুনাফার সবটাই যদি পুনর্বিনিয়োগ করা হয়, তবে পুনর্বিনিয়োগের হার সমৃদ্ধির হারের সমার্থক হয়।

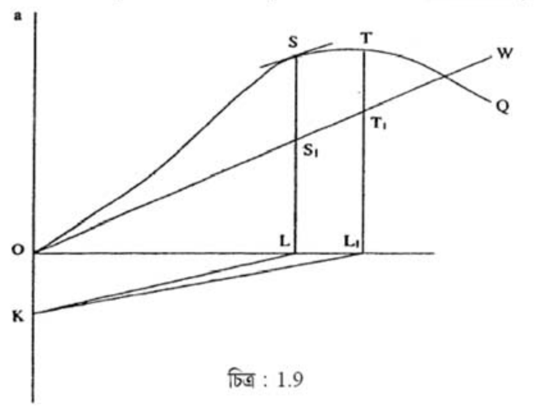

চিত্র : 1.9

মেশিন-প্রতি নীট উৎপাদন থেকে শ্রমিকদের মোট মজুরি দিয়ে যে উদ্বৃত্ত থাকে তার সঙ্গে মেশিন-প্রতি ব্যয়ের যে অনুপাত তার উপরই পুনর্বিনিয়োগের হার নির্ভরশীল। মূলধন-নিবিড় প্রকল্পে যদি উদ্বৃত্তের সৃষ্টি বেশি হয়, তবে সেই উদ্বৃত্ত পুনর্বিনিয়োগের হার বাড়িয়ে দেয়। মূলধন-নিবিড় প্রকল্পের প্রান্তিক মাথাপিছু পুনর্বিনিয়োগের সহগ (marginal per capita reinvestment quotient) শ্রম-নিবিড় প্রকল্পের অনুরূপ অনুপাত অপেক্ষা বেশি থাকে। এজন্য বিনিয়োগের হার বাড়ালে ভবিষ্যতে পুনর্বিনিয়োগের হার বেড়ে যেতে পারে এবং ভবিষ্যতে ভোগ ও কর্মসংস্থানের পরিমাণ বেড়ে যেতে পারে। ১.৯ চিত্রের সাহায্যে এটা বোঝানো হয়েছে।

১.৯ চিত্রে উল্লম্ব অক্ষের উর্ধ্ব অংশ (Oa) উৎপাদন এবং নিম্ন অংশ (OK) মূলধন পরিমাপ করছে। অনুভূমিক অক্ষে শ্রমের পরিমাপ করা হয়েছে। OQ হল উৎপাদন রেখা (output curve) এবং OW রেখাটি হল মজুরি রেখা। এই মজুরি রেখা দেখাচ্ছে যে নিযুক্ত শ্রমের জোগান বেড়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে মজুরিও সমান হারে বাড়ছে। যখন মূলধনের পরিমাণ হল ঞ্জজ্ঞএবং কর্মে নিযুক্ত শ্রমের জোগান হল OL1, তখন উৎপাদন সর্বাধিক হয়েছে। তবে এক্ষেত্রে ভোগের ওপর উৎপাদনে উদ্বৃত্তের পরিমাণ হয়েছে TT, কারণ এক্ষেত্রে মজুরি পুরোটাই ভোগের কাজে ব্যবহৃত হয়ে গেছে। কিন্তু একই পরিমাণ মূলধন (OK) এবং আরও কম পরিমাণ শ্রমে (OL), অর্থাৎ, অধিকতর মূলধন-শ্রম অনুপাতে (higher capitaléôélabour ratio) অথবা অধিকতর মূলধন-নিবিড় উৎপাদনে, উদ্বৃত্তের পরিমাণ (SS) সর্বাধিক হয়েছে, যদিও এক্ষেত্রে উৎপাদনের পরিমাণ সর্বাধিক নয়। এক্ষেত্রে এটাই প্রতিভাত হয় যে, মূলধন-নিবিড় উৎপাদন পদ্ধতি প্রয়োগ করা হলে ভোগের ওপর উৎপাদনের উদ্বৃত্ত সর্বাধিক হতে পারে এবং তার ফলে পুনর্বিনিয়োগও সর্বাধিক হতে পারে এবং তাতে দীর্ঘকালীন সমৃদ্ধির হার সর্বাধিক হতে পারে। সুতরাং দেশের অর্থনীতি যদি ভবিষ্যতে সর্বাধিক উৎপাদন ও সর্বাধিক কল্যাণের অনুকূলে বর্তমান ভোগ ও কর্মসংস্থানের নীতি পরিত্যাগ করে তবে মূলধন-নিবিড় উৎপাদন পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে। গ্যালেনসন ও লিবেনষ্টিনের মতে ভবিষ্যতে মাথাপিছু উৎপাদনের সম্ভাবনাকে সর্বাধিক করাই বিনিয়োগ নীতির উদ্দেশ্য হওয়া উচিত এবং এই উদ্দেশ্য পূরণের জন্য প্রান্তিক মাথাপিছু পুনর্বিনিয়োগের সহগ (marginal per capita reinvestment quotient) সর্বাধিক করার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা উচিত। এই তত্ত্ব অনুযায়ী যদি মুনাফার অধিকাংশ পরিমাণ পুনর্বিনিয়োগের জন্য সঞ্চিত হয়, তখন মজুরির সবটা ভোগের জন্য ব্যয় করা হলেও এবং মূলধনের স্বল্পতা থাকা সত্ত্বেও ভবিষ্যতের সর্বাধিক কল্যাণের জন্য মূলধন-নিবিড় উৎপাদন পদ্ধতি অনুসরণ করা উচিত।

অমর্ত্য সেন এই তত্ত্বটির সমালোচনা করে বলেছেন যে মুনাফার পরিমাণ এবং উদ্বৃত্তের পরিমাণ সর্বাধিক হওয়ার অর্থ এই নয় যে পুরোটাই পুনর্বিনিয়োগ করা হবে। জনসাধারণের ভোগের প্রবণতা বেড়ে গেলে বিনিয়োগযোগ্য উদ্বৃত্তের পরিমাণও কমে যাবে। তাছাড়া স্বল্পোন্নত দেশে যখন উদ্বৃত্ত শ্রমশক্তির জন্য বেকার সমস্যা তীব্র রূপ ধারণ করে, তখন বেকার সমস্যার আশু সমাধানের জন্য শ্রম-নিবিড় উৎপাদন পদ্ধতি গ্রহণ করা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। সমাজের কাছে বর্তমান আর ভবিষ্যতের আয় থেকে বেশি বিবেচ্য হতে পারে।

গ্যালেনসন ও লিবেনষ্টিনের তত্ত্বে বিদেশি দ্রব্য, বিশেষ করে যন্ত্রপাতি ক্রয় করা ও মূলধন গ্রহণ করার

ফলে বৈদেশিক লেনদেন ব্যালান্সের ওপর কী প্রতিক্রিয়া হবে তা বিবেচিত হয়নি।

৫.৭ সারাংশ

স্বল্পোন্নত অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা দেখেছি এদের মাথাপিছু প্রকৃত আয় কম হয়, এরা কৃষিক্ষেত্রের উপর ভীষণভাবে নির্ভরশীল, এদের মূলধনের স্বল্পতায় এরা খুবই জর্জরিত। শিল্পে অনগ্রসরতা এদের প্রধান বৈশিষ্ট্য, তার উপর আছে জনসংখ্যার চাপ ফলে বেকারত্বের বোঝা অপরিসীম। এরা কোনো উন্নত দেশের হয়তো উপনিবেশ মানব, মূলধনও খুব নিম্নমানের। এই অর্থনীতির এক প্রধান বৈশিষ্ট্য হল এখানে দ্বৈত অর্থনীতি দেখা যায় অর্থাৎ একদিকে কিছুটা উন্নত ক্ষেত্র আর অপরদিকে খুবই অনুন্নত ক্ষেত্র বিরাজমান। আয় ও সম্পদ বণ্টনে অত্যন্ত বৈষম্য বিদ্যমান। প্রাকৃতিক সম্পদের অপূর্ণ ব্যবহারের ফলে অনুন্নতির প্রাবল্য দেখা যায়। স্বল্পোন্নত অর্থনীতিগুলি দারিদ্র্যের দুষ্টচক্রের মধ্যে আবর্তিত হয়। অর্থাৎ কম আয়ের জন্য কম সঞ্চয়, কম সঞ্চয়ের জন্য কম মূলধন গঠন, কম মূলধনের জন্য কম উৎপাদনশীলতা, কম উৎপাদনশীলতার জন্য কম আয়। এই দুষ্টচক্র কীভাবে অতিক্রম করা যায় সেই সমস্ত তত্ত্ব আমরা আলোচনা করেছি।

উন্নয়নের জন্য জোর ধাক্কা দেওয়ার তত্ত্ব (Theory of Big Push)

শিল্পোন্নয়ের ক্ষেত্রে পিছিয়ে আছে এমন দেশগুলিতে বেশি পরিমাণে বিনিয়োগ করে জোর ধাক্কা দেওয়ার তত্ত্বটির প্রবক্তা হলেন রোজেনস্টিন-রোডান (Rosenstein-Rodan)। তাঁর মতে শিল্পোন্নয়নের ক্ষেত্রে স্বল্পোন্নত দেশগুলির প্রথম প্রয়োজন হল কৃষকদের উপযুক্ত কারিগরি দক্ষতা বাড়িয়ে পুরো সময়ের জন্য অথবা আংশিক সময়ের জন্য শিল্প-কর্মীতে পরিণত করা। এজন্য কৃষকদের ও শ্রমিকদের উৎপাদনী শক্তি বাড়াবার জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়া দরকার। শিল্পোন্নয়ন এবং সেই সঙ্গে পরিবহন ব্যবস্থা ও আবাসন ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য প্রচুর অর্থ বিনিয়োগ করা দরকার এবং সেটাই হচ্ছে বিনিয়োগে জোর ধাক্কা দেওয়ার তত্ত্বের মূল কথা। বিনিয়োগের ক্ষেত্রে জোর ধাক্কা দিলে বৃহদায়তনে উৎপাদন সম্ভব হবে এবং বৃহদায়তন উৎপাদনের সব সুবিধা, অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক ভোগ করা সম্ভব হবে। সামাজিক স্থির মূলধনের অবিভাজ্যতাগুলির (indivisibilities) ঠিকমতো ব্যবহার করতে পারলে দেশের উন্নয়ন হার বাড়তে পারে এবং সেটা সম্ভব হতে পারে যদি বেশি করে মূলধন বিনিয়োগ করা সম্ভব হয় বা বিনিয়োগের ক্ষেত্রে জোরে ধাক্কা দেওয়া যায়।

সুষম বৃদ্ধি (Balanced Growth)

মূলধনের জোগান যদি নির্দিষ্ট থাকে, তবে কোনো অনুপাতে মূলধনের জোগান বাড়লে সমান অনুপাতে উৎপাদন বাড়ছে কিনা, আবার একটি পর্যায়ে উৎপাদন যে হারে বাড়ল পরবর্তী পর্যায়ে মূলধনের জোগান সেই হারে বাড়ল কিনা তার ভিত্তিতে সুষম সমৃদ্ধির ব্যাখ্যা দেওয়া যেতে পারে। আবার অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে যদি সুসমঞ্জস উন্নয়ন হয় এবং পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত শিল্পগুলির উন্নয়ন যদি সমানভাবে হয় তবে তাকে সুষম উন্নয়ন বলা যেতে পারে।

সুষম সমৃদ্ধির প্রবক্তাদের মতে সুষম উন্নয়ন স্বল্পোন্নত দেশকে দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র থেকে বেরিয়ে আসতে সাহায্য করে। পরস্পর নির্ভরশীল শিল্পগুলির উন্নয়নে বিভিন্ন শিল্প পরস্পরের জন্য বাজারের সম্প্রসারণ করতে পারে। সুষম সমৃদ্ধির তিনটি ভাষ্য আছে-যথা, (১) বাজারের ক্ষুদ্র গণ্ডী দূর করার অন্যতম উপায় হল বিভিন্ন পরস্পর-সংযুক্ত ভোগ-সামগ্রী শিল্পগুলির যুগপৎ উন্নয়ন। (২) একদিকে দেশের ভোগসামগ্রী শিল্প এবং অপরদিকে সামাজিক স্থির মূলধনের মধ্যে সামঞ্জস্য বজায় রাখা; এবং (৩) ভোগসামগ্রী শিল্প, মূলধন-সামগ্রী শিল্প এবং সামাজিক স্থির মূলধন অনুভূমিক এবং উল্লম্ব ভারসাম্যের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। এই তত্ত্ব অনুযায়ী দারিদ্র্যের কবল থেকে বেরিয়ে আসতে হলে কৃষি, ভোগসামগ্রী শিল্প, মূলধন-সামগ্রী শিল্প, সামাজিক স্থির মূলধন সর্বত্র বিনিয়োগ বাড়াতে হবে।

অসম বৃদ্ধি (Unbalanced Growth)

হ্যান্স সিঙ্গারের (Hans Singer) মতে স্বল্পোন্নত দেশগুলির ভোগসামগ্রী ও মূলধন-সামগ্রী শিল্প অথবা কৃষি সবগুলি ক্ষেত্রে একই সঙ্গে বিনিয়োগ বাড়াবার মতো আর্থিক সম্পদের প্রাচুর্য নেই। তাঁর মতে প্রত্যক্ষ উৎপাদনশীল ক্রিয়াকলাপ এবং সামাজিক স্থির মূলধনের সঙ্গে কৃষিক্ষেত্রের কাম্য উন্নয়ন দরকার এজন্য এক্ষেত্রে অগ্রাধিকারের (priority) ভিত্তিতে বিনিয়োগ হওয়া দরকার। এভাবে এই ধরনের উন্নয়ন প্রচেষ্টাকে অসম উন্নয়ন-প্রচেষ্টা বলা হয়। হার্শম্যানের (Hirschman) মতে, সমৃদ্ধিকে ইচ্ছাপূর্বক অসম (deliberate unbalancing of growth) করা স্বল্পোন্নত দেশের পক্ষে প্রয়োজন হয়। হার্শম্যানের মতে যে শিল্পগুলি বিনিয়োগের জন্য নির্বাচিত হবে সেগুলির অগ্রবর্তী যোগসূত্র (Forward Linkage) এবং পশ্চাদবর্তী যোগসূত্র (Backward Linkage) থাকতে পারে। যে শিল্পগুলির ক্ষেত্রে উভয় প্রকার যোগসূত্রই যথেষ্ট জোরদার, সেই শিল্পগুলিই বিনিয়োগ বৃদ্ধির মাধ্যমে সমৃদ্ধির গতি দ্রুত বাড়াতে পারে। উন্নয়নশীল দেশগুলি কীভাবে উন্নয়নের পথে এগোবে অর্থাৎ উন্নয়নের জন্য কী পদ্ধতি নির্বাচন করবে সে বিষয়ে বিতর্কের অবকাশ আছে। স্বল্পোন্নত দেশগুলিতে মূলধনের অভাব এবং শ্রমশক্তির উদ্বৃত্ত দেখা যায়। প্রশ্ন হল, এক্ষেত্রে কি মূলধন-নিবিড় উৎপাদন পদ্ধতি (Capital-Intensive Production Technique) অনুসৃত হবেও অথবা বিকল্পভাবে, শ্রম-নিবিড় উৎপাদন পদ্ধতি (LabouréôéIntensive Production Technique) অনুসরণ করে কি উন্নয়নের পথে এগোতে হবে? আমরা প্রথমে শ্রম-নিবিড় এবং মূলধন-নিবিড় উৎপাদন পদ্ধতির নির্বাচন নিয়ে বিভিন্ন যুক্তি বিচার করব।

৫.৮ অনুশীলনী

নীচের প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন। (প্রতিটির মান ২.৫)

(১) উন্নয়নের সূত্রপাত কীভাবে হতে পারে?

(২) জোর ধাক্কা দেওয়ার তত্ত্বটি কে চালু করেছিলেন?

(৩) সামাজিক স্থির মূলধনের অবিভাজ্যতা কী কী?

(৪) প্রসারণ প্রভাব কাকে বলে?

(৫) অগ্রবর্তী সংযোগ প্রভাব এবং পশ্চাদবর্তী সংযোগ প্রভাব বলতে কী বোঝায়? (

(৬) ইচ্ছাপূর্বক অসমতার ভিত্তিতে সম্প্রসারণ তত্ত্বটির প্রবক্তা কে?

(৭) সুষম সমৃদ্ধির অর্থ কী?

(৮) সুষম সমৃদ্ধির যে কোনো একটি ভাষ্য সম্পর্কে একটি টীকা লিখুন।

(৯) অসম সমৃদ্ধি কথাটির অর্থ কী?

(১০) জোর ধাক্কা দেওয়ার তত্ত্বটির তাৎপর্য কী?

(১১) সামাজিক মূলধন কাকে বলে?

নীচের প্রশ্নগুলি মাঝারি দৈর্ঘ্যের (প্রতিটির মান ৫)

(১২ প্রয়োগ-কৌশল নির্বাচনের বিষয় টি ?

(১৩) প্রয়োগ-কৌশল নির্বাচনের বিষয়ে অমর্ত্য সেনের বিশ্লেষণ টি সংক্ষেপে বলুন।

(১৪) মূলধন-উৎপাদন অনুপাতের লক্ষণ এর ধারনাটি পরিষ্কার করুন।

বড় প্রশ্ন (প্রতিটির মান ১০)

(১) সুষম সমৃদ্ধি কথাটির অর্থ কী? সুষম সমৃদ্ধির বিভিন্ন ভাষ্য আলোচনা করুন।

(২) সুষম সমৃদ্ধির পথে কয়েকটি বাধার উল্লেখ করে সমৃদ্ধির ইচ্ছাপূর্বক অসমতার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করুন।

(৩) অগ্রবর্তী যোগসূত্র এবং পশ্চাদবর্তী যোগসূত্রের সঙ্গে অসম সমৃদ্ধির সম্পর্ক ব্যাখ্যা করুন।

(৪) অসম সমৃদ্ধি সম্পর্কে সিঙ্গার হাশচম্যান ভাষ্য ব্যাখ্যা করুন।

(৫) সুষম সমৃদ্ধি কাকে বলে? সুষম সমৃদ্ধি ও অসম সমৃদ্ধির মধ্যে পার্থক্য ব্যাখ্যা করুন।

(৬) সমৃদ্ধির ইচ্ছাপূর্বক অসমতা বজায় রাখা সম্পর্কে হার্শম্যানের তত্ত্ব ব্যাখ্যা করুন।

(৭) কোনো উন্নয়নশীল দেশে সুষম সমৃদ্ধির নীতি গ্রহণের সীমাবদ্ধতাগুলি আলোচনা করুন।

৫.৯ গ্রন্থপঞ্জী

1. Myint–. The Economics of The Developing Countries SIndian Edition– B.Publications– New Delhi– 1981V
2. Thirlwall A. P. Growth and Development with Special Reference to Developing Economics SELBS/MacMillan 1983V

3. Meier G. M.éôéLeading Issues in Economic Development SNew York– 1976V
4. Hirschman A. O. The Strategy of Economic Development SNew Haven– 1958V
5. Kindleberger C. P.éôéEconomic Development SMcGrawéôéHill– New York– 1958V Or Higgins B. Economic DevelopmentéôéPrinciples– Problems and Policies SIndian Edition– Central Book Depot– Allahabad– 1963V

Unit 6 Concept of Surplus Labour

গঠন

৬.১ উদ্দেশ্য
৬.২ প্রস্তাবনা
৬.৩ জনসংখ্যার উপর অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রভাব
৬.৪ জনসংখ্যা বিষয়ক রূপান্তরের তত্ত্ব
৬.৫ অর্থনৈতিক দ্বিক্ষেত্রের স্বরূপ
৬.৬ লুইস্ মডেল
৬.৭ শ্রমিকদের গ্রাম থেকে শহরে স্থানান্তর সম্পর্কে (ক) টোডারো মডেল এবং (খ) হ্যারিস-টোডারো মডেল
৬.৮ সারাংশ
৬.৯ অনুশীলনী
৬.১০ গ্রন্থপঞ্জী

৬.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে জানা যাবে উন্নয়নের অন্যতম উপাদান জনসংখ্যা বৃদ্ধি কেমন করে একটি দেশের সমস্ত সূচককে প্রভাবিত করে। জনবিস্ফোরণ কখন ঘটে এবং তার পরিণাম কী? স্বল্পোন্নত দেশগুলির অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হল দ্বিক্ষেত্র বিশিষ্ট অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। অর্থনৈতিক দ্বিক্ষেত্র (Economic Dualism) কাকে বলে সেটাই বিস্তারিত আলোচনা করব।

৬.২ প্রস্তাবনা

অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম উপাদান হল দেশের জনসংখ্যা বা মানব সম্পদ (Human Resources) জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং বর্ধিত জনসংখ্যার উপযুক্ত ব্যবহার অর্থনৈতিক উন্নয়নের সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত। জনসংখ্যা বৃদ্ধির ইতিবাচক প্রভাব (Positive Effects) থাকতে পারে এবং সেটা অর্থনৈতিক উন্নয়নের পক্ষে সহায়ক হতে পারে।

প্রথমত, যদি দেশে বর্ধিত জনসংখ্যা অনুপাতে জনসংখ্যা বহন করার ক্ষমতা (carrying capacity) বেশি থাকে, তবে সেই বর্ধিত জনসমষ্টিকে উপযুক্তভাবে কাজে লাগানোর সম্ভাবনা থাকে- সেক্ষেত্রে যদি

সেই বর্ধিত জনসমষ্টিকে দেশের উৎপাদন বৃদ্ধিতে অথবা উৎপাদনমূলক উপজীবিকায় যথাযথ ব্যবহার করা হয় তবে সেটা অর্থনৈতিক উন্নয়নের পক্ষে সহায়ক হয়। যদি কোনো দেশে শ্রমের অভাব থাকে এবং দেশের জনসংখ্যা কাম্য জনসংখ্যা (optimum population) অপেক্ষা কম থাকে, তবে জনসংখ্যার বৃদ্ধি সেদেশের শ্রমের জোগান বাড়িয়ে দেয় এবং সেটা অর্থনৈতিক উন্নয়নের পক্ষে সহায়ক হয়।

দ্বিতীয়ত, জনসংখ্যার হার বৃদ্ধি পেলে ভোগ-সামগ্রীর জন্য জনসাধারণের চাহিদা বেড়ে যায়; তাতে এই জিনিসগুলির উৎপাদন বেড়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমে গেলে উন্নত দেশগুলিতে দীর্ঘমেয়াদী কর্মসংকোচন এবং বিনিয়োগের অভাব (Secular stagnation) পরিলক্ষিত হবার নজির আছে। উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য শ্রমিক সরবরাহ নিয়মিত থাকা দরকার; বিশেষ করে কর্মকুশল শ্রমিকের সরবরাহও থাকা দরকার। যদি দেশের মানব সম্পদকে আধুনিক প্রযুক্তির সঙ্গে পরিচিত করা সম্ভব হয় তবে সেটা অর্থনৈতিক উন্নয়নের উপর অনুকূল প্রভাব বিস্তার করে। দেশের শ্রমশক্তির উৎপাদনী শক্তি (Productivity of Labour) বেড়ে গেলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়।

কিন্তু উন্নয়নশীল দেশগুলিতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বেশি হলে তার কয়েকটি নেতিবাচক প্রভাব (Negative Effects) পরিলক্ষিত হয়।

প্রথমত, উন্নয়নশীল দেশে যদি বেকার সমস্যা তীব্র থাকে এবং দেশটি যদি ইতিমধ্যেই শ্রম-উদ্বৃত্ত (Labour-Surplus) হয়ে থাকে, তবে জনসংখ্যা বৃদ্ধি দেশের বেকার সমস্যার তীব্রতা বাড়িয়ে দেয় এবং সেই সঙ্গে দারিদ্র্যের তীব্রতাও বাড়িয়ে দেয়। অধিকাংশ স্বল্পোন্নত দেশে আমরা প্রচ্ছন্ন বা ছদ্মবেশী বেকার অবস্থা (Disguised Unemployment) দেখতে পাই। জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রভাবে এই দেশগুলিতে গ্রামাঞ্চলের উদ্বৃত্ত শ্রমিকরা কাজের আশায় শহরাঞ্চলে এসে ভিড় করে। গ্রামাঞ্চল থেকে শহরাঞ্চলে শ্রম নির্গমন (Ruraléôéurban Migration) শহরাঞ্চলে চাপের সৃষ্টি করে; তাতে নাগরিক জীবনের অনেক সমস্যার সৃষ্টি হয় এবং বেকার সমস্যার তীব্রতা বাড়ে। ভারতের মতো উন্নয়নশীল দেশে দেখা যায় যে, জনসংখ্যার বৃদ্ধির সঙ্গে শহরাঞ্চলের অধিবাসীর অনুপাত গ্রামাঞ্চলের অধিবাসীর তুলনায় বেড়েছে। এটা থেকে ধারণা করা যায়, শিল্পের উন্নতি এবং নাগরিক জীবনযাত্রার উন্নতি বহুল পরিমাণে দেশের জনসংখ্যার উপর নির্ভরশীল।

দ্বিতীয়ত, জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে খাদ্যসামগ্রীর জন্য সামাগ্রিক চাহিদা বেড়ে যায়। উদ্বৃত্ত জনসমষ্টির জন্য খাদ্যের সংস্থান করতে হলে খাদ্যসামগ্রীর উৎপাদন সেই অনুপাতে বাড়ানো দরকার। স্বল্পোন্নত দেশের পক্ষে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে খাদ্যশস্যের উৎপাদন সেই অনুপাতে বাড়ানো সবসময় সম্ভব হয় না। এজন্য বিদেশ থেকে খাদ্যশস্য আমদানি করতে হয়। দেশের দুর্লভ বৈদেশিক মুদ্রা খাদ্যশস্য আমদানির জন্য ব্যয় করতে হয়। খাদ্যশস্য আমদানি করতে না হলে এই বৈদেশিক মুদ্রা দেশের শিল্পোন্নয়ন ও অর্থনৈতিক পরিকাঠামোর উন্নয়নে ব্যবহার করা যেত। তাছাড়া আমদানিকৃত খাদ্যের সুষ্ঠু বণ্টন ব্যবস্থা চালু রাখতে হলে সরকারকে অপেক্ষাকৃত কম দামে সাধারণ মানুষের কাছে খাদ্য পৌঁছে দিতে হয় এবং সেক্ষেত্রে ভরতুকি (subsidy) প্রদান করতে হয়। এই ভরতুকি প্রদান সরকারের বাজেটের উপর চাপ সৃষ্টি করে। তৃতীয়ত, জনসংখ্যা বৃদ্ধির

সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় আয় না বাড়লে মাথাপিছু আয় কমে যায়। স্বল্পোন্নত দেশগুলিতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির চাপ শুধু যে খাদ্যাভাব বা বেকার সমস্যার সৃষ্টি করে তা-ই নয়। সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা জনসংখ্যা সমস্যার ফলে দারুণভাবে প্রভাবিত হয়। গরিব পরিবারগুলি বর্ধিত পরিবারের ভরণপোষণের জন্য খরচ নির্বাহ করতে পারে না বলে স্বল্পোন্নত দেশগুলিতে শিশু শ্রমিকের প্রাবল্য, শিক্ষার অভাব, অপুষ্টি ও স্বাস্থ্যহীনতার সমস্যা বিশেষভাবে প্রকট হয়। এই সমস্যাগুলি পরোক্ষভাবে জনসংখ্যা সমস্যার সঙ্গে জড়িত। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সামগ্রিকভাবে দেশের সঞ্চয় কমে যেতে পারে। একটি প্রশ্ন উঠতে পারে-জনসংখ্যা বৃদ্ধি কি দারিদ্র্যের জন্য দায়ী? অথবা দারিদ্র্য জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য দায়ী? ঠিকভাবে বলতে গেলে উভয় প্রশ্নের উত্তরই ইতিবাচক হবে।

৬.৩ জনসংখ্যার উপর অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রভাব (Effects of Economic Development on Population)

উন্নয়নশীল দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নও বিভিন্নভাবে জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে প্রভাবিত করে। স্বল্পোন্নত দেশগুলি যখন উন্নয়নের পথে অগ্রসর হতে থাকে, তখন জন-বিস্ফোরণ (Population Explosion) দেখা যায়। তবে এই জন-বিস্ফোরণ অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রথম পর্যায়ে পরিলক্ষিত হয়। প্রাথমিক পর্যায় অতিক্রান্ত হলে জীবনযাত্রার মান উন্নত হতে থাকে এবং তখন জীবনযাত্রার মানের উন্নতি হেতু জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমে যাবার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়। কারণ, শিক্ষার সম্প্রসারণ হেতু এবং সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য পুরোপুরি ভোগ করার তাগিদে পরিবার পরিকল্পনার নীতি অনুসৃত হয় ও জন্মহার কমে যায়। কিন্তু অপরদিকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রভাবে খাদ্যশস্যের উৎপাদন বাড়ে, জনসাধারণের অপুষ্টি দূর হতে থাকে, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসাশাস্ত্রেরও উন্নতি হয় এবং আধুনিক চিকিৎসা-প্রযুক্তির (Medical Technology) প্রভাবে মৃত্যুহারও কমে যায়। সেক্ষেত্রে জনসংখ্যা বাড়বে কিনা অথবা জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার স্থিতিশীল থাকবে কিনা সেটা নির্ভর করে জন্মহার ও মৃত্যুহারের মধ্যে ফাঁক (Gap) কতটা তার উপর।

অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রভাবে শ্রমিকদের কর্মকুশলতাও বাড়ে। তাছাড়া জনসংখ্যার উপজীবিকা ধারায় (Occupation Pattern) পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রভাবে প্রাথমিক উপজীবিকার (Primary Occupation) তুলনায় মাধ্যমিক উপজীবিকা (Secondary Occupation) এবং পরিষেবা ক্ষেত্র বা তৃতীয় শ্রেণির উপজীবিকার (Tertiary Occupation or Service (ector) গুরুত্ব আপেক্ষিকভাবে বাড়ে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রক্রিয়ায় মানবসম্পদে বিনিয়োগ (Investment in human capital) খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যদি এই বিনিয়োগ উপযুক্ত পরিমাণে হয় ও সফল হয় তবে দেশের জনসমষ্টির শিক্ষার সম্প্রসারণ হয়। সাধারণ শিক্ষা ও কারিগরি শিক্ষার সম্প্রসারণের মাধ্যমে এবং জনসাধারণের সামাজিক নিরাপত্তা ও সামাজিক সুযোগ (social opportunities) সুনিশ্চিত করলে শ্রমিকদের মাথাপিছু উৎপাদনী শক্তি বাড়ে।

অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রভাবে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার ধারা পরিবর্তিত হয়। জনসাধারণের মাথাপিছু প্রকৃত আয় (Per capita real income) বেড়ে গেলে এবং সেই বর্ধিত আয়ের ঠিকমতো বণ্টন হলে

জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়। ক্ষুধা থেকে নিবৃত্তি, প্রয়োজনীয় ভোগসামগ্রী ক্রয় করার ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং শিক্ষার সম্প্রসারণ মানবসম্পদ উন্নয়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে।

৬.৪ জনসংখ্যাবিষয়ক রূপান্তরের তত্ত্ব (Theory of Demographic Transition)

জনসংখ্যাবিষয়ক রূপান্তরের তত্ত্ব বিভিন্ন দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির ইতিহাসকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। এই তত্ত্বে জনসংখ্যা বৃদ্ধির তিনটি স্তরের কথা বলা হয়েছে। বর্তমানকালের উন্নত দেশগুলি প্রায় সবাই এই তিনটি স্তর পেরিয়ে এসেছে বলে এই তত্ত্বে বলা হয়ে থাকে। অর্থনৈতিক উন্নয়ন অর্জিত হবার আগে অথবা আধুনিক জীবনযাত্রা শুরু হবার আগে বহু শতাব্দী ধরে এই দেশগুলির মোটামুটিভাবে একটি স্থিতিশীল জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল; এবং তার কারণ ছিল, একদিকে উঁচু জন্মহার এবং অপরদিকে উঁচু মৃত্যুহার। একদিকে জন্মহার বেশি থাকায় এবং অপরদিকে অনুরূপভাবে মৃত্যুহার সমান বেশি থাকায় জনসংখ্যাবৃদ্ধির হার স্থিতিশীল ছিল। এটাকে জনসংখ্যাবিষয়ক রূপান্তরের প্রথম স্তর (Stage-I) বলা হয়। দ্বিতীয় স্তর (Stage-II) শুরু হয় যখন জীবনযাত্রা আধুনিক হতে থাকে এবং সেই সঙ্গে উন্নত ধরনের জনস্বাস্থ্য, ভালো খাবার, বর্ধিত আয় প্রভৃতির ফলে মৃত্যুহার অনেক কমে যেতে থাকে। এর ফলে জনসাধারণের প্রত্যাশিত আয়ু ৪০ বছর থেকে ৬০ বছর পর্যন্ত বেড়ে গিয়েছিল। অথচ মৃত্যুহার কমে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই যে জন্মহার কমে গিয়েছিল তা নয়। এর পরিণতি হিসাবে উচ্চ জন্মহার এবং হ্রাসমান মৃত্যুহারের মধ্যে ফাঁক বেড়ে যেতে থাকে এবং জনসংখ্যাও বেড়ে গিয়েছিল। জনসংখ্যাবিষয়ক রূপান্তরের তৃতীয় স্তর আরম্ভ হয় যখন অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রভাবে এবং জীবনযাত্রার মানের উন্নতির প্রভাবে জন্মহারও কমে যেতে আরম্ভ করেছিল, মৃত্যুহারও কম ছিল। তৃতীয় স্তরে হ্রাসমান জন্মহার এবং হ্রাসমান মৃত্যুহার উভয়ের প্রভাবে প্রকৃতপক্ষে জনসংখ্যা বৃদ্ধি খুবই কম ছিল এবং অনেকক্ষেত্রে জনসংখ্যা স্থিতিশীল ছিল। নীচের চিত্রে পশ্চিম ইউরোপে জনসংখ্যা বিষয়ক রূপান্তরের তিনটি স্তর দেখানো হয়েছে।

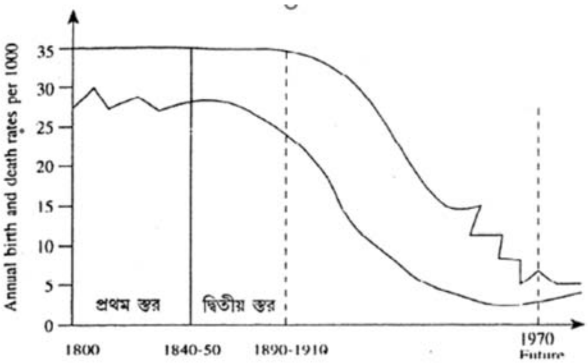

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে পশ্চিম ইউরোপে প্রতি হাজারে জন্মহার ছিল ৩৫: এর ফলে প্রতি হাজারে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল ৫-এর মতো, অথবা ১ শতাংশের অর্ধেক (অর্থাৎ 5/1000=0.005)

দ্বিতীয় স্তরে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম চল্লিশ বছর পেরিয়ে শিল্পবিপ্লবের প্রভাবে আধুনিক জীবনযাত্রা শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুহার কমতে থাকে-অথচ জন্মহার তখনও কমেনি। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশক থেকে জন্মহারও কমতে থাকে, মৃত্যুহারও কমতে থাকে।

তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে জনসংখ্যাবিষয়ক রূপান্তর কীভাবে হয়েছে তা নীচের চিত্রে দেখানো হয়েছে।

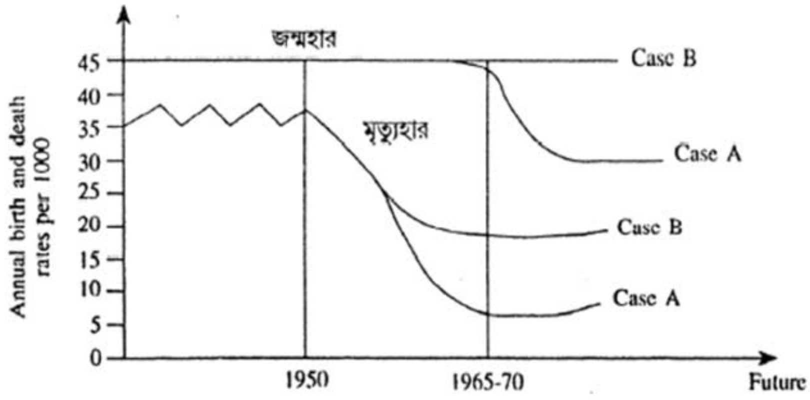

শিল্পোন্নত হবার আগে পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলিতে যা জন্মহার ছিল, বর্তমানকালের স্বল্পোন্নত দেশগুলিতে জন্মহার তার চেয়েও বেশি। স্বল্পোন্নত দেশগুলিতে জন্মহার বেশি হবার কারণ হল, এই দেশগুলিতে মেয়েদের খুবই অল্প বয়সে বিবাহ হয়-এত অল্প বয়সে মেয়েদের বিবাহ শিল্পোন্নত হবার আগে পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলিতেও দেখা যেত না। তাছাড়া বর্তমানে স্বল্পোন্নত দেশগুলিতে শিক্ষার সম্প্রসারণ আশানুরূপভাবে না হওয়া এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে উন্নয়নের প্রভাবে জনবিস্ফোরণ (Population Explosion) হওয়া জন্মহার বেশি হবার অন্যতম কারণ।

স্বল্পোন্নত দেশগুলিতে জনসংখ্যাবিষয়ক রূপান্তরের ব্যাখ্যায় এই দেশগুলিকে দুভাগে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথম ক্ষেত্রে (Case A) মৃত্যুহার নিয়ন্ত্রণের আধুনিক পদ্ধতি প্রয়োগের ফলে এবং জীবনযাত্রার মান অপেক্ষাকৃত উন্নত হওয়ায় ও স্বাস্থ্য সুরক্ষার ব্যবস্থা থাকায় মৃত্যুহার ১৯৬৫-৭০ সালে প্রতি হাজারে ১০-এর কম হয়ে গিয়েছিল এবং ১৯৭০ সালের পর তা আরও কমেছে। এই দেশগুলিতে জন্মহারও প্রতি হাজারে ২৫ থেকে ৩০ পর্যন্ত কমে গিয়েছিল। এই দেশগুলির মধ্যে তাইওয়ান, দক্ষিণ কোরিয়া, কোস্টারিকা, চিলি এবং শ্রীলঙ্কা জনসংখ্যাবিষয়ক রূপান্তরের তৃতীয় পর্যায়ে চলে গেছে। সত্তরের দশকের শেষে আরও কয়েকটি দেশে যেমন চিন, কলম্বিয়া, ইন্দোনেশিয়া, ডোমিনিকান রিপাবলিক, থাইল্যান্ড এবং ফিলিপিনস্ প্রভৃতিতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ক্রমেই হ্রাসমান হয়েছে।

অপরদিকে দ্বিতীয় ক্ষেত্রে (Case B) তৃতীয় বিশ্বের অধিকাংশ দেশই অন্তর্ভুক্ত। ভারত দ্বিতীয় ক্ষেত্রের

অন্তর্ভুক্ত। দক্ষিণ এশিয়া, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, মধ্যপ্রাচ্য এবং আফ্রিকার অনেক দেশ এখন জনসংখ্যাবিষয়ক রূপান্তরের দ্বিতীয় স্তরের অন্তর্ভুক্ত।

৬.৫ অর্থনৈতিক দ্বিক্ষেত্রের স্বরূপ (Nature of Economic Dualism)

যদিও অধিকাংশ স্বল্পোন্নত দেশ অর্থনৈতিক উন্নয়নের উত্তরণ স্তরে (Take-off stage) এখনও পৌঁছতে পারেনি তবুও এই দেশগুলিতে কোনো কোনো ক্ষেত্রে অনেকটা শিল্পোন্নয়ন হয়েছে এবং আধুনিক উৎপাদন পদ্ধতি প্রবর্তিত হয়েছে। অনেক স্বল্পোন্নত দেশেই কোনো কোনো ক্ষেত্রে অর্থব্যবস্থা অনেক উন্নত। একদিকে উৎপাদন ক্ষেত্রে আধুনিকতার ছোঁয়া, অপরদিকে একটি অনগ্রসর অর্থব্যবস্থা-এই ধরনের অর্থনীতিতে দুটি ক্ষেত্র দেখা যায় বলেই এটাকে বলা হয় অর্থনৈতিক দ্বিক্ষেত্র (Economic Dualism) ঊ গ্রামাঞ্চলে কৃষিক্ষেত্রে দেখা যায় যে কৃষক ততটাই তারা মজুরি হিসাবে অর্জন করে। এটাকে বলা হয় ভরণপোষণভিত্তিক মজুরির ক্ষেত্র (Subsistence Sector)। আবার এমনও দেখা যায় জমির মালিক জমি থেকে যথেষ্ট উদ্বৃত্ত (Surplus) পেয়ে থাকে-অর্থাৎ, সে উৎপাদিত দ্রব্য বাজারে বিক্রি করতে পারে এবং বিপণনযোগ্য উদ্বৃত্ত উৎপাদনের জন্য মজুরির ভিত্তিতে শ্রমিক নিয়োগ করে থাকে। এই ধরনের ক্ষেত্রকে বলা হয় পুঁজিবাদী ক্ষেত্র (Capitalist (ector)। যখন ভরণপোষণের জন্য প্রয়োজনীয় উৎপাদনের জন্য বিভিন্ন সম্পদ নিয়োজিত না রেখে বিক্রয়যোগ্য উৎপাদনে সেই সম্পদ নিয়োগ করা হয়, তখন দ্বিক্ষেত্র বিশিষ্ট অর্থনীতি উন্নয়নের দিকে অগ্রসর হয়। নিছক ভরণপোষণের জন্য উৎপাদন প্রক্রিয়া চলতে থাকলে কোনো অর্থনৈতিক ব্যবস্থার তিনটি বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে প্রতিভাত হয়, যথা (১) উৎপাদনের বিশেষীকরণের (Specialisation) অভাব, (২) বিক্রয়যোগ্য উদ্বৃত্ত উৎপাদনের অভাব এবং (৩) অগতিশীল প্রযুক্তি। এই তিনটি বৈশিষ্ট্য পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কিত। বাজারের বিস্তৃতির অভাব এবং বিক্রয়যোগ্য উদ্বৃত্তের অভাব থেকেই ভরণপোষণ ভিত্তিক উৎপাদনের ক্ষেত্র গড়ে ওঠে। বোয়েকে (স্কদ্রত্রদ্ধত্র) মনে করেন, সামাজিক চেতনার স্তর, সংগঠনের রূপ এবং উৎপাদন পদ্ধতির সাহায্যে একটি সমাজের অর্থনৈতিক চেহারার পরিচয় পাওয়া যায়। সামাজিক ব্যবস্থায় দ্বিক্ষেত্র, আঞ্চলিক ভিত্তিতে অথবা ভৌগোলিক ভিত্তিতে দ্বিক্ষেত্র এবং প্রযুক্তি প্রয়োগের ক্ষেত্রে অথবা কলাকৌশলের ক্ষেত্রে দ্বিক্ষেত্র-এগুলি সবই দ্বিক্ষেত্র বিশিষ্ট অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অঙ্গ।

দ্বিক্ষেত্র বিশিষ্ট অর্থনীতিকে বোয়েকে (স্কত্রদ্রত্রদ্ধত্র) ক্ষ্মপূর্বদেশীয়ক্ষ্ম (ক্লথন্স্ঠত্রন্দ্ব) হিসাবে অভিহিত করেছেন। এর একটি কারণ হয়তো এই যে বোয়েকে ইন্দোনেশিয়ার অর্থনীতিকে ভিত্তি করে এক্ষেত্রে তাঁর নিজস্ব যুক্তি দাঁড় করিয়েছিলেন। তাঁর মতে দ্বিক্ষেত্র বিশিষ্ট অর্থনীতি হল অসংহতির (ত্মহ্ন ঠত্রস্থাহ্রদ্র) একটি রূপ যা এসেছিল প্রাক্-পুঁজিবাদী দেশগুলিতে পুঁজিবাদ দেখা যাবার সঙ্গে সঙ্গে।'

১. বোয়েকে তাঁর "Economic and Economic Policy of Dual Societies" (১৯৫৩) বইয়ে বলেছেন 'Dualism is a form of disintegration, (which) came into existence with the appearance of capitalism in pre-capitalistic countries'.

দ্বিক্ষেত্র বিশিষ্ট অর্থনীতির কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আছে। একটি বৈশিষ্ট্য হল, এই জাতীয় অর্থনীতির 'সীমিত

প্রয়োজন' (limited needs); পশ্চিমী পুঁজিবাদী দেশগুলিতে দেখা যায় 'সীমাহীন প্রয়োজন' (unlimited needs)। প্রাক্-পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে উন্নত পশ্চিমী দেশগুলি থেকে পুঁজিবাদের আমদানি হয় এবং সেটা অর্থনৈতিক জীবনে অনুপ্রবেশ করে। এই দেশগুলিতে গ্রামাঞ্চলে ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্প্রসারণ দেখা যায় না। অর্থনৈতিক সংগঠনও খুব দুর্বল। আবার শহর অঞ্চলে ব্যবসা-বাণিজ্য ও বাজারের সম্প্রসারণ দেখা যায়। অর্থনৈতিক সংগঠনও যথেষ্ট মজবুত থাকে।

দ্বিক্ষেত্র বিশিষ্ট অর্থনীতিতে দু'ধরনের নীতিগত সিদ্ধান্ত বিবেচনা করা যেতে পারে। প্রথমত, সমগ্র দেশের ক্ষেত্রে একই নীতি প্রয়োগ করা সম্ভব হয় না। বিভিন্ন ক্ষেত্রে অগ্রাধিকারভিত্তিক নীতি প্রণয়ন করার প্রয়োজন হয়। দ্বিতীয়ত, একটি ক্ষেত্রের পক্ষে প্রযোজ্য নীতি অন্য একটি ক্ষেত্রের পক্ষে প্রতিকূল হতে পারে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, উন্নত শহর অঞ্চলে মূলধন-নিবিড় শিল্পস্থাপন দেশের শিল্পোন্নয়নের পক্ষে সহায়ক হতে পারে। কিন্তু উদ্বৃত্ত শ্রমশক্তিসম্পন্ন গ্রামাঞ্চলে মূলধন-নিবিড় শিল্প স্থাপন বেকার সমস্যার তীব্রতা বাড়িয়ে দিতে পারে এবং গ্রামীণ অর্থনীতির পক্ষে সঙ্কটের সৃষ্টি করতে পারে। গ্রামাঞ্চলে ও শহরাঞ্চলে শ্রমিকদের কারিগরি দক্ষতার রূপও ভিন্ন। আবার শহরাঞ্চলে যেখানে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে বেকার সমস্যার সংকট বেশি তীব্র, গ্রামাঞ্চলে সেক্ষেত্রে দেখা যায় কর্মহীন কৃষিশ্রমিকের সংখ্যাধিক্য ও প্রচ্ছন্ন বেকার সমস্যা। এ ছাড়াও একদিকে ক্ষুদ্র ও গ্রামীণ শিল্প অপরদিকে বৃহৎ শিল্প ও মূলধনী শিল্প অর্থনৈতিক দ্বিক্ষেত্রের আরেকটি রূপ। দ্বিক্ষেত্র বিশিষ্ট অর্থনীতিতে যখন গ্রামাঞ্চলে কৃষকরা খাদ্যশস্য (নিজেদের ভোগের জন্য) উৎপাদন কমিয়ে অথবা না কমিয়ে নগদ শস্যের (Cash Crop) উৎপাদন বাড়াতে সক্ষম হয় তখন কৃষির বাণিজ্যিক সম্প্রসারণ হয়। অপেক্ষাকৃত উন্নতক্ষেত্রে, অর্থাৎ, শহর অঞ্চলের শিল্প-বাণিজ্যের সম্প্রসারণের জন্য বৈদেশিক সাহায্য ও বিনিয়োগের প্রয়োজন হয়। বিনিময়-অর্থনীতি (Exchange Economy) বৈদেশিক মূলধনের ওপর নির্ভরশীল। দ্বিক্ষেত্র বিশিষ্ট অর্থনীতিতে আয় উপার্জনের আশায় গ্রামাঞ্চলের উদ্বৃত্ত শ্রমিক শহরাঞ্চলে চলে আসতে চায়। গ্রাম থেকে শহরে শ্রমিকদের স্থানান্তর (migration) দ্বিক্ষেত্র বিশিষ্ট অর্থনীতির একটি বৈশিষ্ট্য।

বোয়েকে (Boeke) মনে করেন, প্রাক্-পুঁজিবাদী কৃষিসমাজে পশ্চিমী পুঁজিবাদের অনুপ্রবেশ হলে একটি সামাজিক সংঘাতের সৃষ্টি হয়। পশ্চিমী পুঁজিবাদ ছাড়াও সমাজতন্ত্র অথবা সাম্যবাদের আমদানি থেকেও চিরাচরিত অনগ্রসর দেশের জীবনযাত্রায় সংঘাতের সৃষ্টি হতে পারে। অধ্যাপক হিগিনস্ (Higgins) মনে করেন, বোয়েকের এই মতবাদ পশ্চিমী প্রভাবে যা একটি অনুন্নত দেশেরও উন্নতি হতে পারে এবং তার ফলে পুঁজিবাদী ক্ষেত্র (Capitalist Sector) ও ন্যূনতম মজুরিভিত্তিক ভরণপোষণের ক্ষেত্রের (Subsistence Sector) মধ্যে পার্থক্য অনেক কমিয়ে আনতে পারে, সেই ঘটনার সঙ্গে খাপ খায় না। কিন্তু বোয়েকে মনে করেন, পশ্চিমী দেশগুলির কলাকৌশল পূর্বদেশীয় অনগ্রসর দেশগুলিতে ঠিকভাবে কার্যকর হয় না। কিন্তু অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর ক্ষেত্রকে কী পদ্ধতিতে উন্নতক্ষেত্রের পর্যায়ে তুলে আনা যায় সে বিষয়ে বোয়েকে নির্দিষ্ট কোনো নীতি অনুসরণ করার কথা বলেননি। যদিও তিনি মনে করেন যে অনগ্রসর দেশগুলির জন্য আলাদা একটি উন্নয়ন তত্ত্ব থাকা দরকার।

আর্থার লুইস (Arthur Lewis) অনগ্রসর দেশে শ্রমের সীমাহীন জোগানের পরিপ্রেক্ষিতে অর্থনৈতিক উন্নয়নের যে মডেল তৈরি করেছেন তাতে দ্বিক্ষেত্র বিশিষ্ট অর্থনীতির অস্তিত্ব স্বীকৃত হয়েছে। টোডারো (Todaro) এবং হ্যারিস ও টোডারো (Harris-Todaro) শ্রমিকদের গ্রাম থেকে শহরে কাজের আশায় ও অতিরিক্ত আয়ের প্রত্যাশায় চলে আসা সম্পর্কে যে মডেল তৈরি করেছেন তাতেও দ্বিক্ষেত্র বিশিষ্ট অর্থনৈতিক ব্যবস্থার গুরুত্ব স্বীকৃত হয়েছে।

অর্থনৈতিক দ্বিক্ষেত্রের সঙ্গে কলাকৌশলগত দ্বিক্ষেত্র এবং সামাজিক দ্বিক্ষেত্র অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। সামাজিক দ্বিক্ষেত্রের ওপর অর্থনৈতিক পরিবর্তন এবং উন্নয়নের প্রয়াস গভীর প্রভাব বিস্তার করে। অপরদিকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রচেষ্টায় চিরাচরিত উৎপাদন পদ্ধতির পরিবর্তে আধুনিক উৎপাদন পদ্ধতি ও প্রযুক্তি কলাকৌশলগত দ্বিক্ষেত্রকে গুরুত্বপূর্ণ করে তোলে।

৬.৬ লুইস মডেল

৬.৬.১ উন্নয়নশীল দেশগুলিতে উদ্বৃত্ত শ্রমশক্তির অস্তিত্ব মেনে নিয়ে কীভাবে অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রচেষ্টা চালানো সম্ভব সে সম্পর্কে অধ্যাপক আর্থার লুইসের "Economic Development with Unlimited Supply of Labour" নামক বিখ্যাত প্রবন্ধে আলোচনা করা হয়েছে।

লুইসের মতে, অনগ্রসর দেশগুলিতে উদ্বৃত্ত শ্রমশক্তি পরিলক্ষিত হয়-অর্থাৎ, কর্মনিয়োগের অনুপাতে শ্রমিক সরবরাহ বেশি। অনেক সময় শ্রমিকরা খামারের কাজে নিযুক্ত থাকলেও তাদের প্রান্তিক উৎপাদনী শক্তি শূন্য থাকে-অর্থাৎ, খামার থেকে অতিরিক্ত শ্রমশক্তি তুলে নিলেও কৃষি-উৎপাদন কমে না। এক্ষেত্রে ছদ্মবেশী বেকারত্ব (Disguised Unemployment) পরিলক্ষিত হয়। লুইসের মতে, গ্রামীণ অর্থনীতি হল দুটি ক্ষেত্রবিশিষ্ট অর্থনীতি (Dual Economy)-একটি ক্ষেত্র হল এমন অর্থব্যবস্থা যেখানে শ্রমিকরা ন্যূনতম মজুরি পেয়ে কোনোরকমে জীবনধারণ করে, এটাকে বলা হয় Subsistence Sector অর্থাৎ জীবনধারণের জন্য ন্যূনতম মজুরির ক্ষেত্র। আরেকটি ক্ষেত্র হল যেখানে জমির মালিক ও মূলধনের মালিক নিজের জমিতে মূলধন বিনিয়োগ করে এবং ন্যূনতম মজুরি দিয়ে শ্রমিকদের মাধ্যমে কাজ করিয়ে মুনাফা অর্জন করে। এই স্তরকে বলা হয় পুঁজিবাদী ক্ষেত্র বা Capitalist Sector

লুইসের মতে অনগ্রসর দেশগুলিতে একটি স্থির মজুরি হারে (constant wage rate) যত খুশি শ্রমিক নিয়োগ করা যেতে পারে। অর্থাৎ স্থির মজুরিতে শ্রমের সরবরাহ হল অসীম। তবে এই স্থির মজুরি জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় ন্যূনতম মজুরি (wage in the subsistence sector) থেকে একটু বেশি থাকে, যাতে শ্রমিকের স্থানান্তরের প্রকৃত খরচ (real cost of transfer of labour) মজুরির অন্তর্ভুক্ত থাকে। মূলধনের মালিক বা পুঁজিপতি সেই মাত্রা পর্যন্ত শ্রমিক নিয়োগ করবে যেখানে স্থির মজুরি হার শ্রমিকের

প্রান্তিক উৎপাদনী শক্তির সমান হয়। এক্ষেত্রে যতটা শ্রমের নিয়োগ হবে তাতেই মালিকের মুনাফা সর্বাধিক হবে।

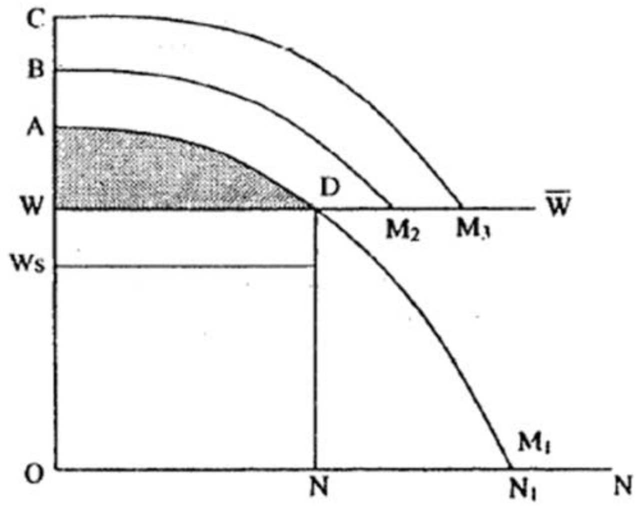

ওপরের ৬.৩ চিত্রে এটা দেখানো হয়েছে। এই চিত্রে অনুভূমিক অক্ষটি হল শ্রম সরবরাহ, উল্লম্ব অক্ষ হল মজুরি হার এবং এতে উৎপাদন বোঝাচ্ছে। OWs হল জীবনধারণের জন্য সর্বনিম্ন মজুরি। OW হল স্থির মজুরি হার; এই OW মজুরি হার OWS অপেক্ষা বেশি। OW মজুরি হার D বিন্দুতে শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদনী শক্তির সমান। M1 রেখা হল প্রান্তিক উৎপাদন রেখা। ON1 হল শ্রমিকদের উৎপাদনমূলক নিয়োগ। এক্ষেত্রে যখন OW হল মজুরি হার এবং ON, হল শ্রমিকদের উৎপাদনমূলক নিয়োগ তখন মুনাফাও সর্বাধিক হচ্ছে। এক্ষেত্রে মোট উৎপাদন হল OADN1; তার মধ্যে OWDN1 পরিমাণ মোট মজুরি প্রদান করার জন্য ব্যয়িত হচ্ছে এবং WAD হল মালিকের মোট উদ্বৃত্ত।

অর্থাৎ, WAD = OADN1, OWDN1

লুইসের মতে যদি পুঁজিপতি বা মূলধনের মালিক এই WAD উদ্বৃত্ত পুনর্বিনিয়োগ করে তবে দেশের সামগ্রিক উৎপাদন বাড়বে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের হারও বাড়বে। তবে এই উদ্বৃত্ত পুনর্বিনিয়োগ হবে কিনা তা অনেকগুলি উপাদানের উপর নির্ভরশীল। পুনর্বিনিয়োগের ক্ষেত্রে লাভের আশা এবং উৎপাদন বাড়াবার জন্য প্রয়োজনীয় উপাদানের সরবরাহ এবং শ্রমিকদের কারিগরি দক্ষতা বিনিয়োগের পক্ষে অনুকূল হলেই পুঁজিপতিদের উদ্বৃত্তের পুনর্বিনিয়োগ হতে পারে এবং মূলধন গঠনের কাজ চলতে পারে। লুইসের তত্ত্বে স্থির মজুরি হারের যুক্তিটি সর্বদা গ্রহণযোগ্য নয়। পুঁজিপতি বা মূলধনের মালিক যে তার উদ্বৃত্ত পুনর্বিনিয়োগ করবে তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। তাছাড়া যে উদ্বৃত্ত শ্রমিক কৃষিক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয় তার সবটাই যে শহর অঞ্চলে কর্মসংস্থানের আশায় চলে আসবে তারও নিশ্চয়তা নেই। লুইস মডেলের একটি দিক হল, যেহেতু শহর অঞ্চলে মজুরির হার বেশি (লুইসের মতে প্রায় ৩০ শতাংশ বেশি) সেজন্য গ্রামাঞ্চল থেকে শহরাঞ্চলে শ্রমের আগমন (ruraléôéurban migration) হতে পারে। প্রকৃতপক্ষে শহরাঞ্চলে মজুরির হার গ্রামাঞ্চলের অনুপাতে ৩০ শতাংশেরও বেশি হতে পারে; কিন্তু এজন্যই যে শ্রমিকরা গ্রাম ছেড়ে শহরে চলে আসতে চায়, তা নয়। আসল কারণ হল, গ্রামাঞ্চলে বেকার সমস্যা খুবই তীব্র। যে হারে গ্রামীণ শ্রমিক

সংখ্যা বাড়ছে সে হারে অধিক পরিমাণ জমিতে চাষও হচ্ছে না অথবা একই জমিতে চাষও সেভাবে বাড়ছে না। এই উদ্বৃত্ত শ্রমিকরা কাজের আশায় শহরাঞ্চলে চলে আসতে চায়। তাছাড়া গ্রামে ঋতুগত বেকার অবস্থা (seasonal unemployment) দেখা যায়। শহরে এই ধরনের বেকারত্বের তীব্রতা আপেক্ষিকভাবে কম। এটাও শ্রমিকদের গ্রাম ছেড়ে শহরে চলে আসার একটি কারণ। এক্ষেত্রে ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থায় লুইস মডেলের কিছুটা প্রাসঙ্গিকতা আছে। ভারতের গ্রামাঞ্চলে বর্তমানে মজুরি হার স্থির না থাকলেও একটি সর্বনিম্ন মজুরি হার আছে, শহরাঞ্চলেও মজুরি হার যথেষ্ট বেশি। এজন্য গ্রামের শ্রমিকদের কাছে শহরে চলে আসার একটি আকর্ষণ আছে। তাছাড়া ভারতের ক্ষেত্রে গ্রামীণ ছদ্মবেশী বেকারত্ব শহরের খোলা বেকারত্বে (Open unemployment) পরিণত হয়। কারণ শহরাঞ্চলে শ্রমিকের সংখ্যা বেড়ে গেলে সবার জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় না।

৬.৭ শ্রমিকদের গ্রাম থেকে শহরে স্থানান্তর সম্পর্কে (ক) টোডারো মডেল এবং (খ) হ্যারিস-টোডারো মডেল [(a) Todaro Model and (b) Harris- Todaro Model regarding Rural-Urban Migration]

লুইসের মডেল এবং স্বল্পোন্নত দেশগুলির দ্বিক্ষেত্র বিশিষ্ট অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য আলোচনাকালে আমরা দেখেছি যে জীবিকা অর্জনের জন্য চিরাচরিত কৃষিক্ষেত্র থেকে আধুনিক ক্ষেত্রে শ্রমিকদের স্থানান্তর হয়ে থাকে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে আমরা দেখতে পাই দেশের শিল্পায়ন, নগরায়ণ (urbanisation), বাণিজ্যিকীকরণ ও আধুনিকীকরণ। সেই সঙ্গে পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়ন ও উৎপাদন-কৌশলেরও উন্নয়ন হয়ে থাকে। এই পরিপ্রেক্ষিতে কেন শ্রমিকেরা গ্রাম থেকে শহরে চলে আসতে চায় সে সম্পর্কে মাইকেল টোডারো একটি মডেল তৈরি করেছেন।

৬.৭.১ (ক) টোডারো মডেল (Todaro Model): টোডারোর মতে শহর এবং গ্রামের মধ্যে শ্রমিকদের প্রত্যাশিত আয়ের (expected earnings) যে পার্থক্য থাকে (প্রকৃত পার্থক্য নয়)- সেটাই গ্রামের শ্রমিকদের শহরে চলে আসতে উদ্বুদ্ধ করে। গ্রাম থেকে শহরে শ্রমের বাজারের সুযোগ-সুবিধা অনেক বেশি, এজন্য এই স্থানান্তর থেকে শ্রমিকদের প্রত্যাশিত লাভ সর্বাধিক করার প্রেরণাই শ্রমিকদের এই স্থানান্তরের পেছনে বড় কারণ। এক্ষেত্রে প্রত্যাশিত লাভ পরিমাপ করার উপায় হল (১) গ্রামীণ চাকুরি এবং শহরাঞ্চলের চাকুরির মধ্যে প্রকৃত আয়ের পার্থক্য এবং (২) শহরাঞ্চলে চাকুরি পাবার সম্ভাবনা। একটি নির্দিষ্ট সময়ের ভিত্তিতে গ্রামাঞ্চলে চাকুরি থেকে গড় প্রকৃত আয় এবং শহরাঞ্চলের চাকুরি থেকে প্রত্যাশিত আয়ের মধ্যে তুলনা করে শ্রমিক যদি দেখে যে গ্রাম থেকে শহরে চলে যাওয়া তার পক্ষে লাভজনক তবে সে গ্রাম থেকে শহরে চলে আসতে চায়। টোডারো মডেলটিকে এভাবে ব্যাখ্যা করা যায়

$$S = f(d) \quad \ldots \quad \ldots \quad (1)$$

এবং $$d = w\rho - r \quad \ldots \quad \ldots \quad (2)$$

যেখানে $$\rho = \frac{\alpha N}{W - N} = \frac{\alpha N}{U} \quad \ldots \quad \ldots \quad (3)$$

অথবা $$d = \frac{W\alpha N}{U} - r \quad \ldots \quad \ldots \quad (4)$$

[এক্ষেত্রে S হল শহরাঞ্চলে শ্রমিক সরবরাহ। d হল শহর এবং গ্রামের মধ্যে প্রত্যাশিত মজুরি পার্থক্য। w হল শহরে প্রকৃত মজুরি। ρ হল শহর অঞ্চলে চাকুরি পাবার সম্ভাবনা। r হল গড় গ্রামীণ মজুরি। α হল শহর অঞ্চলে নতুন চাকুরি সৃষ্টির হার। N হল শহরাঞ্চলে কর্মসংস্থানের মাত্রা। W হল শহর অঞ্চলের মোট মজুর এবং U হল শহর অঞ্চলে বেকারত্বের মাত্রা।]

তাহলে দেখা যাচ্ছে, শহরাঞ্চলে শ্রমিক সরবরাহ (S) শহর এবং গ্রামের মধ্যে প্রত্যাশিত মজুরি-পার্থক্যের (d) ওপর নির্ভরশীল। শহর এবং গ্রামের মধ্যে প্রত্যাশিত মজুরি-পার্থক্য শহর অঞ্চলে প্রকৃত মজুরি হার (w) এবং সেই সঙ্গে শহরে চাকুরি পাবার সম্ভাবনার (p) সঙ্গে গ্রামাঞ্চলে গড় মজুরি হারের পার্থক্যের সমান। শহর অঞ্চলে চাকুরি পাবার সম্ভাবনা (p) নির্ভর করে, শহরাঞ্চলে নতুন চাকুরি সৃষ্টির হার (a) ও শহর অঞ্চলে কর্ম-সংস্থানের মাত্রার (N) সঙ্গে শহর অঞ্চলে মোট মজুরি এবং শহর অঞ্চলের বেকারত্বের মাত্রার মধ্যে যে যে পার্থক্য তার অনুপাতের ওপর।

যদি গ্রাম ও শহর অঞ্চলের মধ্যে প্রত্যাশিত মজুরি-পার্থক্য না থাকে তবে গ্রাম থেকে শহরে শ্রমিকদের স্থানান্তর হবে না। শহরাঞ্চলে মজুরি বেড়ে গেলে অথচ সেই সঙ্গে গ্রামে শ্রমিকদের মজুরি না বাড়লে গ্রাম থেকে শ্রমিকরা শহরে চলে আসতে চাইবে এবং তাতে শহরাঞ্চলে বেকার সমস্যা বেড়ে যাবে। টোডারো মডেলের চারটি মূল বৈশিষ্ট্য হল (১) শ্রমিকরা যে গ্রাম থেকে শহরে চলে আসতে চায় তার পিছনে আপেক্ষিক সুবিধা ও ব্যয়ের (relative benefits and costs) বিবেচনা যুক্তিসঙ্গতভাবে কাজ করে। এই স্থানান্তরের আসল কারণ হল আর্থিক, যদিও শহর অঞ্চলের জীবনযাত্রার সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেলার একটি মনস্তাত্ত্বিক কারণও শ্রমিককে প্রভাবিত করতে পারে।

(২) গ্রাম থেকে শহরে চলে আসার যে আকাঙ্ক্ষা শ্রমিকের মধ্যে দেখা যায় তার মূল কারণ হল, শহর অঞ্চলে মজুরি-প্রাপ্তি এবং গ্রামাঞ্চলে মজুরি-প্রাপ্তির মধ্যে প্রত্যাশিত পার্থক্য প্রকৃত পার্থক্য নয়। এক্ষেত্রে শহরে এবং গ্রামে প্রকৃত মজুরি-পার্থক্য (real wage differential) কত এবং শহরে চলে এলেই চাকুরি পাবার সম্ভাবনা কত এই বিবেচনাগুলিই প্রত্যাশিত মজুরি পার্থক্যের পিছনে কাজ করে।

(৩) শহর অঞ্চলে চাকুরি পাবার সম্ভাবনা এবং শহর অঞ্চলে বেকারত্বের হারের মধ্যে একটি বিপরীতমুখী সম্পর্ক পরিলক্ষিত হয়। শহর অঞ্চলে মজুরি-হার বাড়লেই গ্রামের শ্রমিকরা (নিজেদের স্বল্প গড় মজুরি থাকার দরুন) শহরে এসে ভিড় করে এবং তাতে শহরাঞ্চলে বেকারত্বের হার বেড়ে যায়।

(৪) শহর অঞ্চলে চাকুরি সৃষ্টির হারের চেয়ে গ্রাম থেকে শহরে শ্রমিকদের স্থানান্তরের হার বেশি হওয়াই স্বাভাবিক। গ্রামে এবং শহরে চাকুরি সৃষ্টির ক্ষেত্রে যদি ভারসাম্যের অভাব থাকে এবং শহরে যদি প্রত্যাশিত মজুরি হার বেশি থাকে তবে শহরাঞ্চলে বেকার সমস্যার সৃষ্টি হবেই।

শহর অঞ্চলে উৎপাদন বাড়িয়ে এবং বিভিন্ন কর্মসংস্থান প্রকল্প চালু করেও সমস্যার সমাধান হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত গড় গ্রামীণ মজুরি থেকে শহর অঞ্চলের মজুরির হার অনেক বেশি থাকে। কারণ, এক্ষেত্রে গ্রাম থেকে শহরে আরও বেশি করে শ্রমিকের স্থানান্তর হবে। এই সমস্যার সমাধানের জন্য বিবেচ্য বিষয়গুলি হল, (ক) জনসংখ্যা বৃদ্ধি প্রতিরোধ করা এবং (খ) গ্রামাঞ্চলের জীবনযাত্রা যাতে আরও উন্নত হয়, গ্রামাঞ্চলেই যাতে আরও কাজের সুযোগ সৃষ্টি হয়, গ্রামীণ শিল্পগুলি যাতে উন্নত হয় এবং নাগরিক জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য যাতে গ্রামবাসীদের মধ্যেও বিস্তৃত করা যায় তার ব্যবস্থা করা। সেক্ষেত্রে গ্রাম থেকে শহরে শ্রমিকদের চলে আসার চাপ কমবে।

৬.৭.২ (খ) হ্যারিস-টোডারো মডেল (Harris-Todaro Model): টোডারো মডেলের কাঠামো বজায় রেখেই এই মডেলটি একটু পরিবর্ধিত হয়েছে হ্যারিস-টোডারো মডেলে (Harris-Todaro Model) হ্যারিস-টোডারো মডেলে ধরা হয়েছে-শহর অঞ্চলের নির্দিষ্ট মজুরি (W) গ্রামাঞ্চলে নির্দিষ্ট মজুরির (W.) চেয়ে বেশি হওয়া, গ্রামাঞ্চলের মজুরি হার এবং গ্রামীণ শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদনের সমতা (গ্রামাঞ্চলে শ্রমিকদের প্রান্তিক উৎপাদন খুবই কম) শহরাঞ্চলে বাহ্যিক কারণ দ্বারা কর্ম-নিয়োগের মাত্রা প্রভাবিত হওয়া এবং প্রত্যাশিত আয় (exogenously determined urban employment, Lm) গ্রাম-শহর শ্রমিক স্থানান্তরকে প্রভাবিত করে। এক্ষেত্রে L হল অর্থনীতির মোট শ্রমিক সমষ্টি, LA হল গ্রামীণ বেকারত্ব এবং UU শহরাঞ্চলের সামগ্রিক বেকারত্ব।

এক্ষেত্রে $U^U = (L - L_A) - Lm$

এবং $L = L_A + Lm + U^U \quad \ldots \quad (5)$

আবার $W > W_A = \frac{dY}{dL_A} \quad \ldots \quad (6)$

সমীকরণ (6) দেখাচ্ছে যে, গ্রামীণ মজুরি (WA) প্রান্তিক উৎপাদনের সমান (Y হল মোট উৎপাদন), এবং এই মজুরি হার শহরাঞ্চলের মজুরি হার (W) অপেক্ষা কম। শহর অঞ্চলে শ্রমিক সরবরাহ (S’) গ্রামীণ মজুরি (WA) অপেক্ষা শহর অঞ্চলের প্রত্যাশিত উদ্বৃত্ত আয়ের (YU) ওপর ক্রমবর্ধমান হারে নির্ভরশীল। সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত শহর অঞ্চলে মজুরি হার গ্রামীণ মজুরি হারের চেয়ে বেশি থাকবে এবং শহর অঞ্চলে চাকুরি পাবার সম্ভাবনা বেশি থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত গ্রাম থেকে শহরে শ্রমিক স্থানান্তর চলতে থাকবে। এক্ষেত্রে শহর অঞ্চলে চাকুরি পাবার সম্ভাবনা (P) এবং শহর অঞ্চলে কর্মনিয়োগের হার সমার্থক। অর্থাৎ,

$P = \frac{Lm}{(L - L_A)}$; এক্ষেত্রে $\frac{Lm}{L - L_A}$ হল শহর অঞ্চলে কর্মনিয়োগের হার।

যতক্ষণ পর্যন্ত $W\frac{Lm}{(L - L_A)}$ অর্থাৎ শহর অঞ্চলে কর্মনিয়োগের হার এবং গ্রামীণ মজুরি হার W_A থেকে বেশি, অর্থাৎ যতক্ষণ পর্যন্ত $W\frac{Lm}{(L - L_A)} > W_A$ ততক্ষণ পর্যন্ত গ্রাম থেকে শহরে স্থানান্তর চলবে।

ভারসাম্য পর্যায়ে $W\frac{Lm}{(L - L_A)} = W_A$

স্বল্পোন্নত দেশগুলির ক্ষেত্রে হ্যারিস-টোডারো মডেলের গুরুত্ব অপরিসীম। গ্রামাঞ্চলে কৃষির ওপর জনসমষ্টির অতিরিক্ত চাপের দরুন উদ্বৃত্ত শ্রমশক্তির সৃষ্টি এবং শহর অঞ্চলে অতিরিক্ত আয়ের প্রত্যাশাই প্রধানত গ্রাম থেকে শহরে শ্রমিকদের স্থানান্তরের জন্য দায়ী। এই ব্যবস্থায় শহর অঞ্চলে বেকার সমস্যার তীব্রতা বাড়ে। এর প্রতিকারকল্পে গ্রামীণ অর্থনীতিতে অধিক মাত্রায় কর্মনিয়োগের সৃষ্টি, মজুরি হার বৃদ্ধি এবং গ্রামের উদ্বৃত্ত শ্রম-শক্তিকে গ্রামীণ শিল্পের সম্প্রসারণকল্পে যাতে যথাযথভাবে ব্যবহার করা যায় সেজন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা প্রভৃতির ওপর গুরুত্ব আরোপ করা উচিত।

নিম্নের ৪.৪ চিত্রে হ্যারিস-টোডারো মডেলটি বোঝানো হয়েছে। অনুভূমিক অক্ষটি অর্থব্যবস্থায় পুরো শ্রমশক্তি বোঝাচ্ছে। এক্ষেত্রে শ্রমশক্তি কৃষিক্ষেত্র (A) এবং সংগঠিত শহর ক্ষেত্র (F) এই দুটি ক্ষেত্রে বিভক্ত। চিত্রটির বাঁদিকের অক্ষে শহরক্ষেত্রে বিভিন্ন সংগঠিত মজুরি বোঝাচ্ছে এবং ডানদিকের অক্ষ কৃষিগত মজুরি বোঝাচ্ছে। ঙ্ক রেখাকে শহরের সংগঠিত ক্ষেত্রে (urban formal sector) শ্রমের জন্য চাহিদারেখা হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে। এই রেখা নিম্নাভিমুখী, কারণ মজুরি কমিয়ে দিলে অধিক সংখ্যক শ্রমিক নিয়োগ করা সম্ভব হয়। অনুরূপভাবে এই রেখা কৃষিক্ষেত্রে নিযুক্ত শ্রমের পরিমাণ বোঝাচ্ছে।

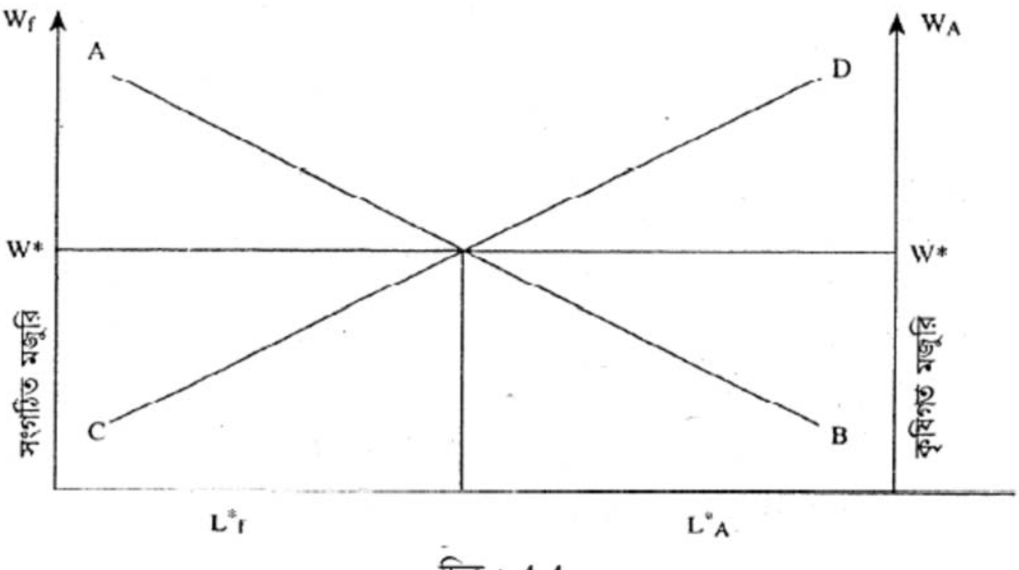

চিত্র : 4.4

এক্ষেত্রেও দেখা যাচ্ছে অপেক্ষাকৃত কম মজুরিতে অধিক সংখ্যক কৃষিশ্রমিক নিয়োগ করা সম্ভব। এই অর্থব্যবস্থায় ভারসাম্য আসবে যখন AB এবং CD রেখা পরস্পরকে ছেদ করবে। একটি ক্ষেত্র থেকে অপর একটি ক্ষেত্রে শ্রমিকদের অনবরত চলে আসা বন্ধ করা যায় যখন সংগঠিত শহর ক্ষেত্রের মজুরি এবং কৃষিক্ষেত্রের মজুরি সমান হয়। AB রেখা এবং CD রেখার ছেদবিন্দু থেকে আমরা ভারসাম্য পর্যায় মজুরি এবং আন্তঃক্ষেত্র শ্রমবন্টন দেখতে পাই। W মজুরি হারে সংগঠিত শহর ক্ষেত্রে নিযুক্ত শ্রমের পরিমাণ L, দ্বারা এবং কৃষিক্ষেত্রে নিযুক্ত শ্রমের পরিমাণ L দ্বারা দেখানো হয়েছে।

কিন্তু যদি সংগঠিত শহরের ক্ষেত্রে শ্রমিকদের মজুরি একটি নির্দিষ্ট হারে বেঁধে দেওয়া হয় এবং যদি সেই মজুরি হার ভারসাম্য পর্যায়ের মজুরি হারের চেয়ে বেশি হয়, তবে তার প্রভাব কী হবে? এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে নিম্নের ৪.৫ চিত্রে।

এই চিত্রে দেখা যাচ্ছে সংগঠিত শহর ক্ষেত্রে শ্রমিকদের মজুরি হার W1বেঁধে দেওয়া হয়েছে।

এই মজুরি হারে সংগঠিত শহর ক্ষেত্রে নিযুক্ত শ্রমের পরিমাণ হল জ্রচ তাহলে অবশিষ্ট শ্রমিকদের

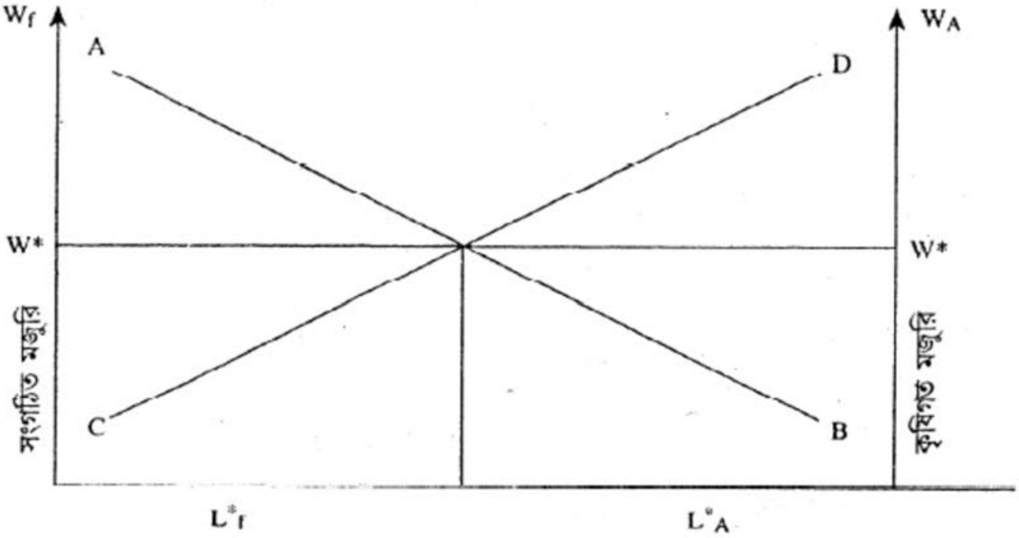

চিত্র : 4.4

অবস্থা কী দাঁড়াবে? এই চিত্রে দেখানো হয়েছে কৃষিক্ষেত্রে মজুরি হার W1 পর্যন্ত কমে যাবে, এই মজুরি হারে কৃষিক্ষেত্রে নিযুক্ত শ্রমের পরিমাণ হবে LA। এক্ষেত্রে মজুরি হারে ভারসাম্য নির্ধারিত হচ্ছে না। যদি শ্রমিক নিযুক্তির জন্য দেশে এই দুটি মাত্র ক্ষেত্র থাকে তবে অল্পমজুরির ক্ষেত্র থেকে (এক্ষেত্রে কৃষিক্ষেত্র) বেশি মজুরির ক্ষেত্রে শ্রমিকদের স্থানান্তর বাড়বে। কিন্তু যেহেতু সংগঠিত শহর ক্ষেত্রে মজুরি হার বেশি সেজন্য সেক্ষেত্রে শ্রমের জন্য চাহিদা বেশি থাকবে না। এজন্য ওপরের চিত্র অনুযায়ী দেশে পরিমাণ কর্মহীন বা বেকার শ্রমশক্তি সৃষ্টি হবে। এভাবে বেকার হওয়া শ্রমিকরা শহর অঞ্চলেই অসংগঠিত ক্ষেত্রে (Informal Sector) নিজেদের নিয়োগ করতে পারে তবে সেক্ষেত্রে মজুরি হার কম থাকবে। তাহলে গ্রামাঞ্চল থেকে শহরাঞ্চলে শ্রমিকের চলে আসা অব্যাহত থাকলে ভারসাম্য কীভাবে অর্জিত হবে। এক্ষেত্রে শ্রমের স্থানান্তর থেকে প্রত্যাশিত আয় এবং কৃষিক্ষেত্র প্রাপ্ত প্রকৃত আয়ের মধ্যে তুলনা করতে হবে। যদি দেখা যায় যে উভয় ক্ষেত্রে মজুরি হার সমান পর্যায়ে এসেছে তবে ভারসাম্য অর্জিত হবে এবং শ্রম স্থানান্তর বন্ধ হবে।

৬.৮ সারাংশ

১। জনসংখ্যা ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের উপর জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রভাব

অর্থনৈতিক উন্নয়নের উপর জনসংখ্যার প্রভাব ইতিবাচক (Positive) এবং নেতিবাচক (Negative) উভয়ই হতে পারে। যদি দেশে শ্রমের জোগান কম থাকে তবে জনসংখ্যা বৃদ্ধি শ্রমের জোগান বাড়িয়ে দেয় এবং সেটা অর্থনৈতিক উন্নয়নের পক্ষে সহায়ক হয়। দ্বিতীয়ত, জনসংখ্যা বাড়লে ভোগসামগ্রীর জন্য চাহিদা বাড়ে এবং এই দ্রব্যগুলির উৎপাদন বেড়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে। যদি দেশে বর্ধিত জনসংখ্যা অনুপাতে জনসংখ্যা বহন করার ক্ষমতা থাকে তবে সেই বর্ধিত জনসমষ্টিকে উপযুক্তভাবে কাজে লাগানোর সম্ভাবনা থাকে। অপরদিকে জনসংখ্যাবৃদ্ধির নেতিবাচক দিকও আছে। দেশে যদি ইতিমধ্যেই উদ্বৃত্ত শ্রমশক্তি ও বেকার সমস্যা থাকে তবে জনসংখ্যা বৃদ্ধি বেকার সমস্যার তীব্রতা বাড়িয়ে দেয়। জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে খাদ্যশস্যের জন্য চাহিদাও বাড়ে এবং যদি দেশে খাদ্যশস্যের উৎপাদন জনসংখ্যা বৃদ্ধির অনুপাতে না বাড়ে তবে দেশে খাদ্যসংকটের সৃষ্টি হয় এবং দুর্লভ বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়ে বিদেশ থেকে খাদ্যশস্য আমদানি করতে হয়। এক্ষেত্রে জনসংখ্যা বৃদ্ধি অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রতিবন্ধক হয়।

২। জনসংখ্যার উপর অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রভাব

স্বল্পোন্নত দেশগুলির উপর অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রভাবে প্রথম পর্যায়ে জনবিস্ফোরণ (Population Explosion) দেখা যায়। প্রথম পর্যায় অতিক্রান্ত হলে অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রভাবে জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়। শিক্ষার সম্প্রসারণ ও জনস্বাস্থ্যের উন্নতির প্রভাবে একদিকে যেমন জন্মহার

কমতে থাকে অপরদিকে সেই প্রকার মৃত্যুহারও কমতে থাকে। তবে অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রভাবে জনসংখ্যা কতটা বাড়বে সেটা নির্ভর করে জন্মহার ও মৃত্যুহারের হ্রাসের মধ্যে কতটা ফাঁক থাকে তার উপর। অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রভাবে উপজীবিকার বণ্টন প্রভাবিত হয়, এবং প্রাথমিক উপজীবিকার তুলনায় মাধ্যমিক উপজীবিকা এবং বিশেষ করে পরিষেবামূলক উপজীবিকা বেশি গুরুত্ব অর্জন করে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের ফলে মানবসম্পদে বিনিয়োগ বাড়ে এবং তাতে জনগণের সামাজিক সুরক্ষা বাড়ে ও মাথাপিছু উৎপাদনী শক্তি বাড়ে।

২. অর্থনৈতিক দ্বিক্ষেত্রের স্বরূপ

অর্থনৈতিক দ্বিক্ষেত্রে দেখা যায়, কোনো অর্থব্যবস্থায় একদিকে হয়তো শিল্পোন্নয়নের প্রয়াস চলছে, অপরদিকে হয়তো চিরাচরিত উৎপাদন পদ্ধতির ভিত্তিতে কৃষি উৎপাদন চলছে। কৃষিক্ষেত্রে জীবনধারণের জন্য কৃষকরা যখন উৎপাদন কাজে নিযুক্ত থাকে এবং যখন সেই উৎপাদন থেকে বিপণনযোগ্য উদ্বৃত্ত থাকে না, তখন তাকে বলা হয় ভরণপোষণভিত্তিক আবাদ। অপরদিকে পুঁজিবাদী আবাদ দেখা যায় যখন বড় বড় জোতদাররা কৃষি-উৎপাদন থেকে উদ্বৃত্ত আহরণ করে বাজারে বিক্রি করে এবং তা থেকে মুনাফা অর্জন করে। দ্বিক্ষেত্র বিশিষ্ট অর্থনীতিতে দেখা যায় সীমিত প্রয়োজন-পশ্চিমী দেশগুলির মতো সীমাহীন প্রয়োজন নয়। তবে অপেক্ষাকৃত অগ্রসর দেশগুলিতে যে অর্থনৈতিক দ্বিক্ষেত্র দেখা যায়, যেখানে পশ্চিমী পুঁজিবাদের

আমদানিও পরিলক্ষিত হয়। এই দেশগুলিতে অপেক্ষাকৃত উন্নত ক্ষেত্রে শিল্প-বাণিজ্য সম্প্রসারণের জন্য বৈদেশিক সাহায্য ও বিনিয়োগের প্রয়োজন হয়।

দ্বিক্ষেত্র বিশিষ্ট অর্থনীতিতে গ্রামাঞ্চলে প্রচ্ছন্ন বেকারত্ব দেখা যায় এবং এটা হয় উদ্বৃত্ত শ্রমশক্তি থাকায়। তাছাড়া অধিকতর আয়ের প্রত্যাশা এবং কর্মসংস্থানের আশায় গ্রাম থেকে শহরে শ্রমিকের স্থানান্তরও পরিলক্ষিত হয়। অর্থনৈতিক দ্বিক্ষেত্রের সঙ্গে উৎপাদনের কলাকৌশল জড়িত। অপেক্ষাকৃত উন্নত ক্ষেত্রে আধুনিক উৎপাদন পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়। আবার অনগ্রসর ক্ষেত্রে চিরাচরিত উৎপাদন পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়। আঞ্চলিক অর্থনৈতিক বৈষম্য এই দ্বিক্ষেত্রের অন্যতম অঙ্গ। আর্থিক ক্ষেত্রে যে দ্বিক্ষেত্র পরিলক্ষিত হয় সেটাও অর্থনৈতিক দ্বিক্ষেত্রেরই একটি রূপ। সামাজিক ক্ষেত্রে শিক্ষা, সামাজিক রীতিনীতি ও চেতনা এবং অর্থনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন-এগুলিও অর্থনৈতিক দ্বিক্ষেত্রের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।

৩. লুইস মডেল

আর্থার লুইস অনগ্রসর দেশে উদ্বৃত্ত শ্রমের পরিপ্রেক্ষিতে যে উন্নয়ন তত্ত্ব আলোচনা করেছেন তাতে গ্রামীণ অর্থনীতিতে দুটি ক্ষেত্র ধরা হয়েছে-একটি হল জীবনধারণের জন্য ন্যূনতম মজুরির ক্ষেত্র (Subsistence sector) অথবা ভরণপোষণভিত্তিক প্রয়োজনীয় উৎপাদনের ক্ষেত্র, এবং অপরটি হল পুঁজিবাদী ক্ষেত্র। লুইসের মতে স্বল্পোন্নত দেশগুলিতে শ্রমের জোগান অসীম; এই দেশগুলিতে একটি স্থির মজুরি হার থাকে এবং এই মজুরি হারে যত খুশি শ্রমিক নিয়োগ করা যেতে পারে। তবে এই মজুরি জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় ন্যূনতম মজুরি (wage in the subsistence sector) থেকে একটু বেশি থাকে, যাতে শ্রমিকের স্থানান্তরের প্রকৃত খরচ (real cost of transfer) মজুরির অন্তর্ভুক্ত থাকে। মূলধনের মালিক সেই মাত্রা পর্যন্ত শ্রমিক নিয়োগ করবে যেখানে স্থির মজুরি হার প্রান্তিক উৎপাদনী শক্তির চেয়ে কম। এক্ষেত্রে যতটা শ্রম নিয়োগ হবে, তাতেই মালিকের মুনাফা সর্বাধিক হবে। লুইসের মতে যদি পুঁজিপতি এই উদ্বৃত্ত মুনাফা পুনর্বিনিয়োগ করে তবে দেশের সামগ্রিক উৎপাদন বাড়বে। শহরাঞ্চলে এই বিনিয়োগ হলে শিল্পক্ষেত্রে উৎপাদন বাড়বে এবং কর্মসংস্থানের আশায় গ্রাম থেকে শহরে শ্রমিকদের স্থানান্তর হবে।

৪. টোডারো এবং হ্যারিস-টোডারো মডেল

শহরে এবং গ্রামের মধ্যে শ্রমিকদের প্রত্যাশিত আয়ের পার্থক্য গ্রামের শ্রমিকদের শহরে চলে আসতে অনুপ্রাণিত করে। টোডারো মডেলে এই শ্রমিক স্থানান্তরের কারণ বিশ্লেষিত হয়েছে। শ্রমিকরা যে গ্রাম থেকে শহরে চলে আসতে চায় তার পেছনে আপেক্ষিক সুবিধা ও ব্যয়ের বিবেচনা কাজ করে। শহর অঞ্চলে কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা এবং শহর অঞ্চলে কর্মসংস্থান সৃষ্টির হার অপেক্ষা গ্রাম থেকে কর্মপ্রার্থীদের স্থানান্তরের হার বেশি হওয়া স্বাভাবিক। যতক্ষণ পর্যন্ত শহর অঞ্চলের মজুরি হার গ্রামাঞ্চলের মজুরি হার অপেক্ষা বেশি থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত সমস্যার সমাধান হবে না। শ্রমিক স্থানান্তরের এই সমস্যার সমাধানের অন্যতম উপায় হল জনসংখ্যা বৃদ্ধি প্রতিরোধ করা, শহরে মজুরি হার এবং একই কাজের জন্য গ্রামে মজুরি হারের পার্থক্য যতটা সম্ভব কমিয়ে আনা।

হ্যারিস-টোডারো মডেলে ধরা হয়েছে যে শহর অঞ্চলে নির্দিষ্ট মজুরি গ্রামাঞ্চলে নির্দিষ্ট মজুরি অপেক্ষা বেশি হওয়া শ্রমিক স্থানান্তরকে প্রভাবিত করে। তাছাড়া আরও যেসব কারণে শ্রমিক স্থানান্তর প্রভাবিত হয় সেগুলি হল গ্রামাঞ্চলের মজুরি হার এবং গ্রামীণ শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদনের সমতা (গ্রামাঞ্চলে শ্রমিকদের প্রান্তিক উৎপাদন খুবই কম), শহরাঞ্চলে বাহ্যিক কারণ দ্বারা কর্মনিয়োগের মাত্রা প্রভাবিত হওয়া এবং প্রত্যাশিত আয়। গ্রাম থেকে শহরে শ্রমিকদের স্থানান্তর শহরাঞ্চলে বেকার সমস্যার সৃষ্টি করে। শহরের সংগঠিত ক্ষেত্রে বেকারত্বের তীব্রতা বেড়ে গেলে উদ্বৃত্ত শ্রমিকরা অসংগঠিত ক্ষেত্রে কর্মপ্রার্থী হয়। তবে সেক্ষেত্রেও মজুরির হার কম থাকে। শ্রমের স্থানান্তর থেকে প্রত্যাশিত আয় কৃষিক্ষেত্রে প্রাপ্ত প্রকৃত আয়ের হার যদি একই পর্যায়ে থাকে তবে শ্রমিক স্থানান্তর বিশেষ হবে না।

৬.৯ অনুশীলনী

নীচের সংক্ষিপ্ত প্রশ্নগুলির উত্তর দিন। (প্রতিটির মান ২.৫)

(১) অর্থনৈতিক উন্নয়নের উপর জনসংখ্যা বৃদ্ধির ইতিবাচক প্রভাব কী?

(২) অর্থনৈতিক উন্নয়নের উপর জনসংখ্যা বৃদ্ধির নেতিবাচক প্রভাব কী?

(৩) অর্থনৈতিক উন্নয়ন জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে কীভাবে প্রভাবিত করে?

(৪) উন্নয়নশীল দেশগুলিতে জনসংখ্যা বিষয়ক রূপান্তর কীভাবে হচ্ছে?

নীচের মাঝারি দৈর্ঘ্যের প্রশ্নগুলির উত্তর দিন (প্রতিটির মান ৫)

(৫) জনসংখ্যা বৃদ্ধি কি অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হয়?

(৬) দ্বিক্ষেত্র বিশিষ্ট অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বলতে কী বোঝায়?

(৭) লুইস মডেলে কোন্ ধরনের দ্বিক্ষেত্র আলোচিত হয়েছে?

(৮) টোডারো মডেলের বৈশিষ্ট্যগুলি কী কী?

(৯) হ্যারিস-টোডারো মডেল অনুযায়ী গ্রাম থেকে শহরে শ্রমের স্থানান্তর কখন বন্ধ হতে পারে?

নীচের বড় প্রশ্নগুলির উত্তর দিন (প্রতিটির মান ১০)

(১০) উদ্বৃত্ত শ্রম-সম্পন্ন অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় মূলধন গঠন সম্পর্কে লুইস মডেলটি আলোচনা করুন।

(১১) হ্যারিস-টোডারো মডেল, টোডারো মডেলের একটি বর্ধিত রূপ-আলোচনা করুন।

(১২) শ্রমের সীমাহীন জোগানের পরিপ্রেক্ষিতে লুইসের উন্নয়ন তত্ত্বটি আলোচনা করুন।

৬.১০ গ্রন্থপঞ্জী

1. Higgins– B.-Economic Development-Principles– Problems and Policies– Central Book Depot– Allahabad– 1963
2. Boeke– J. H.éôéEconomics and Economic Policy of Dual Societies– New York– 1953
3. Lewis– W. A. Economic Development with Unlimited Supply of Labour– Manchester School– 1954
4. Todaro– M.-A Model of Labour Migration and Urban Unemployment in Less Developed Countries– American Economic Review– 1969
5. Harris– J. and Todaro– M.-Migration– Unemployment and Development- A two sector Analysis– American Economic Review– 1970
6. Basu– Kaushik Analytical Development Economics OUP

৭. অর্থনৈতিক উন্নয়নের বিভিন্ন স্তর গুলি

৭.১ গঠন

৭.২ উদ্দেশ্য

৭.৩ প্রস্তাবনা

৭.৪ কলিন , ক্লার্ক এর তত্ব

৭.৫ মার্কস এর তত্ব

৭.৫.১ আদিম সাম্যবাদী সমাজ

৭.৫.২ দাস ব্যবস্থা

৭.৫.৩ সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থা

৭.৫.৪ পুঁজিবাদ বা ধনতন্ত্র

৭.৫.৫ পুঁজিবাদের সঙ্কট ও সমাজতন্ত্র

৭.৫.৬ মার্কসের উন্নয়নের স্তর ত্বত্তের একটি মূল্যায়ন

৭.৬ রস্ট্রো এর উন্নয়নের স্তর

৭.৬.১ রস্টোর ‘অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির স্তর’ তত্ত্ব ও উন্নয়নের পথ পরিক্রমা

৭.৬.২ তাত্ত্বিক ও তত্ত্বের পটভূমি, **Background of Theory & Theorist**

৭.৬.৩ ‘অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির স্তর’ তত্ত্ব, **Stages of Economic Growthó Theory**

৭.৬.৩.১ সনাতন সমাজ, **Traditional Society**

৭.৬.৩.২ উড্ডয়নের পূর্বাবস্থা, **Preconditions for Take-Off**

৭.৬.৩.৩ উড্ডয়ন, **Take-Off**

৭.৬.৩.৪ পরিপূর্ণতা লাভের প্রচেষ্টা, **Drive to Maturity**

৭.৬.৩.৫ উচ্চ গণভোগের কাল, **Age of High MasséôéConsumption**

৭.৬.৪ তত্ত্বের সমালোচনা, **Criticism of Theory**

৭.৭ সারাংশ

৭.৮ অনুশীলনী

৭.৯ গ্রন্থপঞ্জী

৭.১ গঠন

৭.২ উদ্দেশ্য

অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বা সমাজ ব্যবস্থার আজকের অবস্থা একদিনে হয়নি, তার রূপান্তর হয়েছে বহু পথ পরিবর্তন হয়ে, কলিন ক্লার্ক ও এ জি বি ফিশার এর তত্ত্ব অনুসারে শ্রমের গতিময়তার পুনর্বন্টনের মাধ্যমে আর্থিক উন্নয়নের দিক নির্নয় হয়। উন্নয়নের প্রথম ধাপে শ্রমশক্তি প্রথমিক ক্ষেত্র (Primary sector) থেকে মাধ্যমিক ক্ষেত্রে (Secondary Sector) ধাবিত হয়, এবং এরপর তা তৃতীয় ক্ষেত্রে (Tertiary Sector) এর দিকে ধাবিত হয়।

দ্বন্ধমূলক বস্তুবাদের মাধ্যমে মার্কস উন্নয়নের বিভিন্ন স্তরগুলির এবং তার বিবর্তন এর ব্যাখ্যা করেন। এটি ইতিহাসের বস্তুবাদী বিশ্লেষণ নামেও পরিচিত। পাঁচটি স্তরের মাধ্যমে এই সামাজিক বিবর্তন এর ব্যাখ্যা দেওয়া হয়। স্তর গুলি হোল , (১) আদিম সাম্যবাদী সমাজ (২) দাশ , সমাজ (৩) সামন্ত্রতন্ত্র (৪) ধনতন্ত্র বা পুঁজি বাদী সমাজ (৫) সমাজতান্ত্রিক সমাজ। ১৯৬০ সালে প্রকাশিত রস্টোর সর্বাধিক আলোচিত গ্রন্থ “The Stages of Economic Growth- A Non, Communist Manifesto”- ‘অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির স্তর’ তত্ত্ব উপস্থাপন করা হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সদ্য স্বাধীন রাষ্ট্রগুলো যখন রুশ সমাজতন্ত্রের দিকে ঝুঁকে পড়ছিল, তখন অর্থনৈতিক সাহায্যের মাধ্যমে সেই রাষ্ট্রগুলোকে পুঁজিবাদী যুক্তরাষ্ট্রের বলয়ে নিয়ে আসার পরিকল্পনা থেকেই রস্টোর এই তত্ত্ব প্রদান করেন।

৭.৩ প্রস্তাবনা

অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে এগোনোর জন্য স্বল্পোন্নত দেশগুলির অর্থ বিনিয়োগের পরিমাণ বাড়ানো দরকার। স্বল্পোন্নত দেশে বিনিয়োগ ঠিকভাবে হলে সমৃদ্ধির সম্ভাবনা উন্মুক্ত হয়। সেক্ষেত্রে আমাদের বিবেচনা করতে হবে সমৃদ্ধির কোন স্তরে দেশটি পৌঁছালো। ক্লার্ক-ফিশার উন্নয়ন তত্ত্ব অনুসারে শ্রমের গতিময়তার পুনর্বন্টনের মাধ্যমে আর্থিক উন্নয়নের দিক নির্নয় হয়। এই তত্ত্বের মাধ্যমে দেখানো হয়েছে কি ভাবে উন্নয়নের প্রথম ধাপে শ্রমশক্তি প্রথমিক ক্ষেত্র (Primary sector) থেকে মাধ্যমিক ক্ষেত্রে (Secondary Sector) ধাবিত হয়, এবং এরপর তা তৃতীয় ক্ষেত্রে (Tertiary Sector) এর দিকে ধাবিত হয়। কার্ল মার্ক্স অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্তর এর সাথে কিভাবে সমাজের পরিবর্তন হচ্ছে তা নিয়ে আলোচনা করেছেন। কার্ল মার্ক্সের ব্যাখ্যার বাইরে অন্য ব্যাখ্যাও আছে। অধ্যাপক রসটো (Rostow) অর্থনৈতিক স্তর নিয়ে আলোচনা করেছেন।

৭.৪ কলিন ক্লার্ক এর তত্ত্ব

ক্লার্ক-ফিশার উন্নয়ন তত্ত্ব

কলিন ক্লার্ক ও এ জি বি ফিশার এর তত্ত্ব অনুসারে শ্রমের গতিময়তার পুনর্বন্টনের মাধ্যমে আর্থিক উন্নয়নের দিক নির্নয় হয়। উন্নয়নের প্রথম ধাপে শ্রমশক্তি প্রথমিক ক্ষেত্র (Primary sector) থেকে মাধ্যমিক ক্ষেত্রে (Secondary Sector) ধাবিত হয়, এবং এরপর তা তৃতীয় ক্ষেত্রে (Tertiary Sector) এর দিকে ধাবিত হয়। ১৯৩৫ সালের প্রথম দিকে, অ্যালেন ফিশার পরামর্শ দিয়েছিলেন যে অর্থনৈতিক অগ্রগতি একটি বৃহৎ পরিষেবা খাতের উত্থানের দিকে পরিচালিত হবে যা প্রাথমিক ও মাধ্যমিক খাতের বিকাশ অনুসরণ করেই এই পরিষেবা খাতের দিকে ধাবিত হবে । পরবর্তীতে, ১৯৪০ সালে, কলিন ক্লার্ক ক্লার্ক-ফিশার উন্নয়ন তত্ত্ব তৈরি করতে এই ধারনাটি কাজে লাগিয়ে ছিলেন এই ফিশার-ক্লার্ক মডেল নির্মানে।

প্রাথমিক অবস্থায় দেশগুলি প্রাথমিক দ্রব্য উৎপাদনে নিজেদের নিবেশ করে তাদের আবশ্যকীয় পণ্যসামগ্রীর চাহিদা পূরণ করে, এরপর দেশের সম্পদ ধাবিত হয় শিল্প বা মাধ্যমিক ক্ষেত্রে, যা শিল্পোৎপাদন এবং উৎপাদনশীলতা বাড়িয়ে, মানুষের অবসর সময় বাড়িয়ে দেবে যা শেষ পর্যায়ে পুঁজি ও শ্রমশক্তির অভিমুখ পালটে নিয়ে যাবে তৃতীয় ক্ষেত্রে বা পরিষেবা ক্ষেত্রে। ক্লার্ক-ফিশার এর এই মডেলকে এঙ্গেলস সূত্রও তাত্ত্বিক সমর্থন প্রদান করে। এই সূত্র অনুসারে খাদ্য দ্রব্যের আয় - স্থিতিস্থাপকতার মান এক এর চেয়ে কম, অর্থাৎ আয় বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে খাদ্য দ্রব্যের চাহিদা সমানুপাতে বাড়েনা অন্যদিকে অন্যান্য শিল্পদ্রব্যের চাহিদা বাড়তে থাকে অধিক হারে পরবর্তী পর্যায়ে আয় বৃদ্ধির সাথে পাল্লাদিয়ে বৃদ্ধি পায় স্বাস্থ্য, শিক্ষা, ও অন্যান্য বিনোদন দ্রব্য। এর থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রথম ধাপে শিল্প এবং পরের ধাপে পরিষেবার চাহিদা বাড়ে, এইভাবে ক্লার্ক-ফিশার এর মডেলকে এঙ্গেলস সূত্র তাত্ত্বিক সমর্থন প্রদান করছে যা চাহিদার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে প্রতীয়মান হচ্ছে।

যোগানের দৃষ্টিকোণ থেকেও ক্লার্ক-ফিশার এর মডেল এর তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। আর্থিক উন্নয়নের শুরুতে কৃষি-ক্ষেত্রে পুঁজি নিয়োগের সাথে সাথে কৃষি উৎপাদন বাড়তে থাকবে, উন্নত কারিগরি জ্ঞানের কল্যাণে আর বেশি বেশি জমি আবাদের আওতায় আসবে, শুধু তাই নয় শ্রমিকের গড় উৎপাদনশীলতাও বৃদ্ধি পাবে এবং এই বৃদ্ধির চেয়ে কম হারে বাড়বে কৃষি-পন্যের (খাদ্য দ্রব্যের) চাহিদা, ফলে কৃষির সংগে যুক্ত শ্রমিক আয় বৃদ্ধির সংগে সামঞ্জস্য রেখে বাড়বেনা এবং শিল্পক্ষেত্রে শ্রমিকের যোগান চলে আসবে কৃষি ক্ষেত্র থেকে।

অর্থনৈতিক বাস্তবের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা ক্লার্ক-ফিশার মডেলের গ্রহনযোগ্যতার স্বপক্ষে যুক্তি খুঁজে পাই - মধ্য আয়ের এবং শিল্পোন্নত দেশগুলির উন্নয়নের বৈশিষ্ঠ্য ক্লার্ক-ফিশারের মডেলকে সমর্থন করে। মধ্য আয়ের এবং শিল্পোন্নত দেশগুলির যেমন আলজেরিয়া, চিলি, ব্রাজিলঙ্ক, পর্তুগাল এবং গ্রিস প্রভৃতি দেশগুলির আয় ও উৎপাদন কাঠামোর বিন্যাস পর্য্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পায় যে ১৯৬০ -৮০ সালের মধ্যে এই দেশগুলির কৃষি আয় ও জিডিপি এর অনুপাত উল্লেখযোগ্য ভাবে কমেছে, অন্যদিকে আলজেরিয়া ও চিলি কে বাদ দিলে অন্যান্য দেশগুলির শিল্প-আয় জিডিপির অনুপাত এবং পরিষেবা ক্ষেত্র জাত আয় ও জিডিপির অনুপাত ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়েছে, যা পক্ষান্তরে ক্লার্ক-ফিশারের তত্ত্ব কে প্রতিষ্ঠিত করে। ক্ষেত্রগত নিয়োগের পরিসংখ্যান এর আনুপাতিক পরিবর্তনও সাযুজ্যপূর্ন, একই সময়ের

(১৯৬০-৮০) মধ্যে শিল্প ক্ষেত্রে ও পরিষেবা ক্ষেত্রে নিয়োগের আনুপাতিক মান বৃদ্ধি পেয়েছে একমাত্র চিলির ক্ষেত্রে শিল্প ক্ষেত্রে নিয়োগের আনুপাতিক মাত্রা অপরিবর্তিত থেকেছে (২০ᴟ এর মধ্যে তা ঘোরাঘুরি করেছে)।

উচ্চ আয়ের উন্নত দেশগুলি যেমন ব্রিটেন, আমেরিকা, কানাডা, অস্ট্রিয়া, ফ্রান্স, বেলজিয়াম এবং সুইডেন প্রভৃতি দেশগুলিতে ঐ একি সময়ে (১৯৬০-৮০) আমরা দেখতে পাই যে কৃষি-আয় ও জিডিপি র অনুপাত এবং শিল্পজাত- আয় ও জিডিপি র অনুপাত উভয়ই কমেছে, অন্যদিকে পরিষেবা ক্ষেত্র জাত আয় ও জিডিপির অনুপাত বৃদ্ধি পেয়েছে। নিয়োগের ক্ষেত্রগত কাঠামোর ক্ষেত্রেও এই সাযুজ্যপূর্ন ফলাফল পরিলক্ষিত হয়।

অবশ্য স্বল্পোন্নত দেশগুলির ক্ষেত্রে ক্লার্ক-ফিশারের তত্ত্বের জোরালো সমর্থন পাওয়া যায়নি। এই সমস্ত দেশগুলিতে জিডিপি এর পরিবর্তনের সাথে সাথে ক্লার্ক- ফিশার তত্ত্ব অনুযায়ী জিডিপির ক্ষেত্রগত বিন্যাস পরিবর্তন হলেও তার গতি অত্যন্ত শ্লথ, নিয়োগের ক্ষেত্রগত পরিবর্তন প্রায়ই অনুপস্থিত। অর্থাৎ আমরা বলতে পারি যে ক্লার্ক-ফিশার এর তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা উন্নত বা উন্নয়নশীল উচ্চ ও মধ্য আয়ের দেশগুলির জন্য যতোটা প্রযোজ্য স্বল্পোন্নত দেশগুলির জন্য তা প্রতিফলিত হতে দেখা যায়নি।

ক্লার্ক , ফিশারের তত্ত্বের বাস্তব সত্যতা যাচাই করার জন্য সাইমন কুজনেট একটি অনুসন্ধান চালান। এই অনুসন্ধানে প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে তিনি ক্লার্ক-ফিশার তত্ত্বের কিছু গুরুত্বপুর্ন পরিমার্জন ঘটান। স্বাভাবিক ভাবে তিনি একটি অর্থনীতিকে তিনটি ক্ষেত্রে বিভাজিত করেন , (১) কৃষি, মৎস্য চাষ, এবং বনজ সম্পদ কে নিয়ে গঠন করেন A ক্ষেত্রও, (২) শিল্প ও খনিজ উৎপাদন কে নিয়ে ঞক্ষেত্র এবং (৩) পরিষেবা কে S ক্ষেত্র হিসেবে বিভাজিত করেন। বিভিন্ন আয় স্তরের অসংখ্য দেশ থেকে উনি আয় ও শ্রমের ক্ষেত্রগত বণ্টন সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করে এদের আন্তঃসম্পর্ক সম্বন্ধে অনুসন্ধান চালান। তিনি দেশগুলিকে সাতটি ভাগে ভাগ করেন, জ্জ থেকে VII যে সমস্ত দেশগুলির আয় সেগুলিকে I ক্রমহ্রাসমান ভাবে সবচেয়ে কম আয়ের দেশগুলিকে VII নম্বর গ্রুপে রাখেন। তার ফলাফলের সারমর্ম হোল ,

উচ্চ আয়ের দেশগুলিতে A ক্ষেত্রে নিয়োগের আনুপাতিক উপস্থিতির মধ্যে যথেষ্ট তারতম্য লক্ষ্য করা যায়।

১৯৫০ সালে ব্রিটেনে সমগ্র শ্রম শক্তির মাত্র ৫ শতাংশ ছিল A ক্ষেত্রে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যা ছিল ১২ শতাংশ, আর সুইডেন ও নিউজিল্যান্ডে তা ছিল প্রায় ২০ শতাংশ এর মতো।

এইসব তারতম্য থাকলেও একটি সাধারণ প্রবণতা থেকে যায় যা আমাদের প্রত্যাশার সংগে সাযুজ্যপুর্ন। A ক্ষেত্রের শ্রমের (যার মধ্যে বিনা মজুরির পারিবারিক শ্রম আছে) আনুপাতিক মান ১৫% SI গ্রুপের দেশগুলিতে) থেকে ৮০% SVII গ্রুপের দেশগুলিতে) । M ক্ষেত্রের শ্রমের S যার মধ্যে বিনা মজুরির পারিবারিক শ্রম আছে) আনুপাতিক মান ৪০ থেকে ৭ শতাংশের মধ্যে পড়ে যখন আমরা I থেকে VII নম্বর গ্রুপের দিকে অগ্রসর হই। উচ্চ আয়ের দেশগুলিতে (শিল্পোন্নত) যাদের আয়ের ভাগ গ্রুপের গড়ের থেকে বেশি এবং যে সমস্ত দেশ খাদ্যদ্রব্য আমদানি করে থাকে যেমন ব্রিটেন তাদের A ক্ষেত্রের শ্রমের

অনুপাত বেশ খানিকটা কম যখন আমরা খাদ্য দ্রব্য রপ্তানিকারী দেশগুলির সংগে তুলনা করি।

S ক্ষেত্র এর জন্য বিষয়টি আর পরিষ্কার, দেখা যাচ্ছে মাথাপিছু আয় যত কমছে এই ক্ষেত্রে নিয়োজিত শ্রমিকের S যার মধ্যে বিনা মজুরির পারিবারিক শ্রম আছে) আনুপাতিক মান ততোই কমছে। মোট শ্রমের মধ্যে S ক্ষেত্রে শ্রমের আনুপাতিক উপস্থিতি I গ্রুপের দেশগুলিতে প্রায় ৪৫.৩% অন্যদিকে VII গ্রুপের দেশগুলিতে ২৩.৭% শ্রমিক S ক্ষেত্র নিয়োজিত। এর থেকে সহজে প্রতীয়মান হয় যে উন্নত বা ধনী দেশগুলিতে A ক্ষেত্রের শ্রমের আনুপাতিক উপস্থিতি অনেক কম এবং M ও S ক্ষেত্রে শ্রমের আনুপাতিক উপস্থিতি তুলনায় বেশি।

S ক্ষেত্রের কুজনেটের ফলাফল ততোটা স্বস্তিদায়ক নয়। প্রথম চারটি আয় শ্রেণীর দেশে S ক্ষেত্রের আনুপাতিক মান মোটামুটি স্থির ছিল, যদিও ঐ গ্রুপের পরের দেশগুলিতে S ক্ষেত্রের শ্রমের আনুপাতিক মান কম।

S ক্ষেত্রের তথ্যের বিয়োজিত পরিসংখ্যান এর মাধ্যমে কুজনেট দেখলেন যে পরিবহন ও দূরসঞ্চার, S ক্ষেত্রের একটি উপক্ষেত্রে জিডিপির শতাংশিক বৃদ্ধি ঘটেছে যথেষ্ট সাথে সাথে ক্ষেত্রগত নিয়োগের অংশও বেড়েছে, যদিও ব্যাঙ্ককিং ও ইনস্যুরেন্স উপক্ষেত্রে জিডিপির মুল্যসংযোজন বাড়েনি,

ক্লার্ক-ফিশারের তত্ত্বের কিছু দূর্বলতা ঃ

ক্লার্ক-ফিশারের তত্ত্ব কিছু পরিসংখ্যানের উপর ভিত্তি করে বিবৃত, এই তত্ত্ব কিন্তু ব্যাখ্যা করেনি সমাজ কি ভাবে এক স্তর থেকে অন্য স্তরে রূপান্তরিত হচ্ছে।

Kuznets, Bauer আব Yamey মোটেই মানতে রাজি নন যে তৃতীয় ক্ষেত্রে উপস্থিতি শুধুমাত্র আর্থিক উন্নয়নের স্তরের দ্বারা নির্ধারিত, তাদের মতে প্রাকৃতিক সম্পদ ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাও ক্ষেত্রগত নিয়োগের অনুপাত কে প্রভাবিত করে।

ক্লার্ক-ফিশারের তত্ত্ব অনুসারে উন্নয়নের প্রাথমিক পর্বে, প্রথমে মাধ্যমিক ক্ষেত্রের বিস্তার ঘটবে, কিন্তু অনেক উন্নত এবং উচ্চ আয়ের দেশে এটি ঘটেনি, এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে জার্মানিতে শিল্প নয় আগে ব্যাঙ্ককিং ও ইনস্যুরেন্স ক্ষেত্রের বিকাশ ঘটেছে।

বিভিন্ন দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ, জলবায়ু প্রভৃতির বিভিন্নতা যা বিকাশের শর্ত হিসাবে কাজ করতে পারে, ক্লার্ক-ফিশারের তত্ত্ব সে বিষয়ে যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়নি বা সে সম্পর্কে উদাসীনতা দেখিয়েছেন, এটি এই মডেলের একটি দূর্বলতা।

ক্লার্ক-ফিশারের তত্ত্ব অর্থনৈতিক নীতি নির্ধারনের ক্ষেত্রে কোন পরামর্শ প্রদানে সাহায্য করেনা। কোন কোন নীতি গ্রহণের মাধ্যমে সমাজকে এক স্তর থেকে অন্য স্তরে উন্নীত করা সম্ভব সে সম্পর্কে কোন পরামর্শ এই তত্ত্বে পাওয়া যায়না।

শিল্প ক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য যে শিল্প ক্ষেত্রে শ্রমিক সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে এমন অনুমান কিন্তু একটু অতিসরলীকরন, কারণ এর ফলে পুঁজির নিবেশ বাড়তে পারে যদি পুঁজি নিবিড় উৎপাদন কৌশল গৃহীত

করা হয়, অর্থাৎ শুধুমাত্র শ্রমের পরিচলনের মাধ্যমে বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করা সবসময় যথার্থ নাও হতে পারে এটি এই তত্ত্বের একটি দুর্বলতা।

৭.৫ মার্কস এর তত্ত্ব

দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের মাধ্যমে মার্কস উন্নয়নের বিভিন্ন স্তরগুলির এবং তার বিবর্তন এর ব্যাখ্যা করেন। এটি ইতিহাসের বস্তুবাদী বিশ্লেষণ নামেও পরিচিত। পাঁচটি স্তরের মাধ্যমে এই সামাজিক বিবর্তন এর ব্যাখ্যা দেওয়া হয়। স্তর গুলি হোল , (১) আদিম সাম্যবাদী সমাজ (২) দাশ , সমাজ (৩) সামন্ত্রতন্ত্র (৪) ধনতন্ত্র বা পুঁজি বাদী সমাজ (৫) সমাজতান্ত্রিক সমাজ।

প্রতিটি স্তর একটি নির্দিষ্ট উৎপাদনের হাতিয়ার ও একটি উৎপাদন সম্পর্ক দ্বারা নির্ধারিত। উৎপাদনের হাতিয়ার (Forces of Production) ও উৎপাদন সম্পর্ক (Production Relation) হচ্ছে উৎপাদন পদ্ধতি (Mode of Production) এর দুটি অবিচ্ছেদ্য নির্নায়ক।আধুনিক পরিভাষায় উৎপাদনের হাতিয়ার (Forces of Production) হচ্ছে উৎপাদনের প্রযুক্তিগত দিকটির সংগে সংপৃক্ত অন্যদিকে উৎপাদন সম্পর্ক (Production Relation) হোল উৎপাদনের ক্ষেত্রের সংপৃক্ত সামাজিক বিষয় সমূহ। মার্কসের মতে উৎপাদনের হাতিয়ারগুলি , উৎপাদন সম্পর্কগুলির থেকে অনেক বেশি গতিশীল। এর ফলে উৎপাদনের হাতিয়ার এর পরিবর্তন সংগে তাতক্ষনিকভাবে উৎপাদন সম্পর্কের পরিবর্তন ঘটেনা, একটি সময় ব্যবধান থেকে যায়। এরফলে নতুন উন্নততর উৎপাদনের হাতিয়ারের সঙ্গে পুরাতন উৎপাদন সম্পর্কের একটি দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়। সংঘাত পূর্ন এই দ্বন্দ্বের ফলে উৎপাদন সম্পর্কের একটি পরিবর্তন ঘটে যা নতুন উৎপাদনের হাতিয়ারের সঙ্গে সাজুয্যপূর্ন বা সংগতিপূর্ন, যার ফলে এসে এক উন্নততর নতুন উৎপাদন পদ্ধতি (Mode of Production) সমাজ। অর্থাৎ থিসিস ও অ্যান্টি-থিসিস এর সংঘাতের পর এক সিন্থেথিসিস এর মাধ্যমে এক নতুন উৎপাদন পদ্ধতির সৃষ্টি একটি স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা। এটি একটি দ্বন্দ্বমূলক পদ্ধতি হিসেবে পরিচিত।

৭.৫.১ আদিম সাম্যবাদী সমাজ

আদিম সাম্যবাদী সমাজে কোন সামাজিক উৎপাদনের উপস্থিতি ছিলনা, সম্পত্তির যৌথ মালিকানা ছিল তখন, মানুষ প্রকৃতি থেকে খাদ্য আহরণ ও জীবজন্তু শিকার করে জীবনধারণ করতো, সমাজ শ্রেণী-বিভক্ত ছিলনা, ফলে উদ্বৃত্ত- শ্রমের শোষণের সমস্যাও ছিলনা। ক্রমে ক্রমে আসে কিছু জটিলতা ও সামঞ্জস্যের অভাব। সমাজের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে, খাদ্য ও বন্য পশুর অভাব ক্রমে বাড়তে থাকে যা থেকে জনগোষ্ঠীর মধ্যে সংঘাতের পরিবেশ তৈরি হতে থাকে এর ফলে জনগোষ্ঠী গুলির মধ্যে বিভাজন এর মাধ্যমে সৃষ্টি হয় একাধিক জনগোষ্ঠী যাদের মধ্যে সংঘাতপূর্ন সম্পর্ক। অন্যদিকে আদিম মানুষ জীবজন্তুর প্রজনন ও গৃহে পালনের কৌশল এবং চাষ-আবাদ এর জ্ঞান উপলব্ধ করে। জনগোষ্ঠী গুলির ক্রমবর্ধমান সংঘর্ষের ফলে বিজয়ী জনগোষ্ঠী গুলি বিজিত জনগোষ্ঠী গুলিকে দাশে পরিণত করে কৃষি কাজ ও পশু পালনের কাজে ব্যবহার করতে লাগলো। তাই বলা যায় যে উৎপাদনের উপকরনের পরিবর্তন এর সাথে সাথে চলে আসে উৎপাদন সম্পর্কের এক সংঘাত যার ফলে চলে এলো এক নতুন এবং উন্নততর উৎপাদন

পদ্ধতি বা স্তর যা দাসপ্রথা হিসেবে পরিচিত।

৭.৫.২ দাস ব্যবস্থা

দাসপ্রথা ব্যবস্থায় উৎপাদনের হাতিয়ার বা উপকরণগুলির মালিকানা আসে বিজয়ী গোষ্ঠীগুলির হাতে, গৃহপালিত পশুরমতো বিজিত দাসগুলিরও কেনা বেচা চলতো এবং পরিশেষে উৎপাদিত দ্রব্যের মালিকানা থাকতো বিজয়ী গোষ্ঠী বা দাস মালিকদের হাতে। উৎপাদন ব্যবস্থা কে চালিয়ে যাবার জন্য উৎপাদনের একটি ন্যুনতম অংশ দাসদের বাঁচিয়ে রাখার জন্য দেওয়া হোত দাস শ্রমিকদের, অন্যথায় উৎপাদন ব্যবস্থা ব্যহত হোত। এই ব্যবস্থায় উদ্বৃত্ত উৎপাদন শোষণ করা শুরু হোল, দাস মালিকেরা এই উদ্বৃত্তের মালিক হোল। অর্থাৎ মানব সমাজ শ্রেণী বিভক্ত হয়ে পড়লো, এবং উদ্বৃত্ত শ্রমেরও সৃষ্টি হোল। প্রাথমিকভাবে এই ব্যবস্থায় বাড়লো উৎপাদনশীলতা কিন্তু এই ব্যবস্থাও ক্রমে ভেঙ্গে পড়লো পরবর্তি পর্য্যায়ের সংঘাতময় পরিবেশের জন্য। কৃষি ব্যবস্থায় উৎপাদন উৎপাদনের হাতিয়ার বা উপকরণগুলির ক্রমোন্নয়ন, অন্যদিকে ক্রমবর্ধমান শোষণের জন্য দাসদের ভিতর বাড়তে থাকে অনুযোগের মাত্রা, দাস কেনা বেচার ব্যবসা আর তেমন লাভজনক হচ্ছিলনা, প্রগতিশীল মানুষেরা দাস কেনা বেচা বা দাস প্রথার বড় সমালোচক হয়ে ওঠে, ফলে উৎপাদন এর হাতিয়ার এর সংগে উৎপাদন সম্পর্কের মধ্যে সাযুজ্যের অভাব বাড়তে বাড়তে সংঘাতের পরিবেশ সৃষ্টি হয়, নতুন উন্নততর এক উৎপাদন ব্যবস্থা- সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থা, সেখানে দাস প্রথার অবলুপ্তির সাথে সাথে উৎপাদন ব্যবস্থায় দাসত্বহীন কৃষি শ্রমিকদের সৃষ্টি হয়।

৭.৫.৩ সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থা

সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থায় প্রধান আর্থিক কর্মকান্ড হয়ে দাঁড়ালো কৃষি-উতপাদন। সামন্তপ্রভুরা হয়ে উঠলো জমির মালিক, কিন্তু তারা আর দাসের মালিক থাকলোনা, কৃষি কাজের সুবিধার জন্য দাসত্বমুক্তির মাধ্যমে তারা হয়ে উঠলো বদ্ধ-কৃষি শ্রমিক, যারা মানুষ হিসেবে মুক্ত হলেও শ্রম প্রদানে বাধ্য থাকতো ভূস্বামীর কাছে, অর্থাৎ তারা আংশিক ভাবে মুক্ত হোল।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে শিল্পের আবির্ভাব এবং বিস্তারের সাথে বৃদ্ধি পেতে থাকলো এর উৎপাদনশীলতা যা ছাড়িয়ে গেলো কৃষির উৎপাদনশীলতাকে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্রম উন্নতির ফলে উৎপাদনের হাতিয়ার বা উপকরণ সমূহের প্রভূত অগ্রগতির ফলে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা আস্তে আস্তে ভেঙ্গে পড়তে থাকে, শিল্পশ্রমিকের চাহিদার সংগে সাযুজ্য রক্ষা করতে বদ্ধ-কৃষি শ্রমিকদের মুক্তির প্রয়োজন হয়ে পড়ে, অর্থাৎ উন্নততর উৎপাদনের হাতিয়ারের (Improved Forces of Production) সংগে সাযুজ্য রেখে উৎপাদন সম্পর্কের (compatiable Production Relation) বিকাশ হতে থাকে। শ্রমিক শ্রমশক্তির মালিক হওয়ার স্বীকৃতি অর্জন করে নতুন উৎপাদন ব্যবস্থায়। যা ধনতন্ত্র বা পুঁজিবাদ হিসেবে পরিচিত হয়।

৭.৫.৪ পুঁজিবাদ বা ধনতন্ত্র

পুঁজিবাদ বা ধনতন্ত্রে উৎপাদনের সমস্ত উপকরণের মালিকানা থাকে পুঁজিবাদীর মালিকানায়, শ্রমশক্তির বাদে, শ্রমিক অন্য কোন উপাদানের মালিক নয় ফলে সে মজুরির বিনিময়ে তার শ্রমশক্তির বিক্রি করতে

বাধ্য। শ্রমিক উদ্বৃত্ত মূল্য সৃষ্টি করে যা শ্রমিক দ্বারা উৎপাদিত মূল্য থেকে শ্রমিকদের মজুরি কে বাদ দিলে যা অবশিষ্ট থাকে তাই। পুঁজির মালিক এই উদ্বৃত্ত মূল্যের দখল নেই উৎপাদনের অন্যান্য উপকরণের মালিকানার কারণে। সেই উদ্বৃত্ত মূল্য বাজারে বিক্রয়ের মাধ্যমে পুঁজির মালিক মুনাফায় পরিণত করে। আর এখান থেকেই শুরু হয় সংঘাতের আবহ। মুনাফায় বৃদ্ধির স্বার্থে মালিক-শ্রেনী শ্রমিক শোষণের মাধ্যমে উদ্বৃত্ত মূল্য বৃদ্ধি করে মুনাফায় বৃদ্ধির প্রচেষ্টা জারি রাখে। ফলে, এই দুই শ্রেণির মধ্যে ক্রমাগত বাড়তে থাকে সংঘাত, যা পরিশেষে শ্রেণি সংগ্রামের পথে অগ্রসর হয়। পুঁজি কে আমরা দু ভাগে ভাগ করতে পারি , পরিবর্তনশীল পুঁজি যা মজুরি ও কাঁচামাল ক্রয়ের পেছনে ব্যয়িত হয়) এবং স্থির পুঁজি (মেশিন ইত্যাদির পেছনে ব্যয়িত পুঁজি)। এখন মুনাফায় বৃদ্ধির সাথে সাথে বাড়তে থাকে স্থির পুঁজির পরিমাণ যার ফলশ্রুতি হিসাবে আমরা দুটি পরিবর্তন দেখতে পাই , প্রথমত উৎপাদনে স্থির পুঁজির বৃদ্ধি স্বয়ংক্রিয় ভাবে উৎপাদন ব্যবস্থায় শ্রমিকদের গুরত্ব কমিয়ে আনে, তার আনুপাতিক উপস্থিতি কমতে থাকে বা বেকারত্ব বাড়তে থাকে। অন্যদিকে স্থির পুঁজির বৃদ্ধির সাথে সাথে উৎপাদন বৃদ্ধির পরিমাণ যথেষ্ট বাড়তে থাকে যা বাজারে দ্রব্যের যোগানকে বাড়িয়ে তোলে, অন্যদিকে শ্রমিকদের বেকারত্ব বৃদ্ধির ফলে উৎপাদিত দ্রব্যের চাহিদার বাজারে কমতে থাকে, ফলে বাজারে অবিক্রিত উদ্বৃত্ত মূল্য এর উপস্থিতি, যেটিকে আমরা Sales Realization Crisis বলে থাকি, এর ফলে মুনাফায় ও উদ্বৃত্ত মূল্যের মধ্যে ফারাক সৃষ্টি করে, ফলে মুনাফার হার কমতে থাকে, সৃষ্টি হয় মালিক শ্রেণির দুর্বলতা। ক্রমহ্রাসমান মুনফার হার কে রুখতে মালিক শ্রেণী তখন উদ্বৃত্তমুল্য বৃদ্ধির বা মুনাফার হার কে ধরে রাখার তাগিদে মজুরির হ্রাস এর মাধ্যমে শ্রমিক শোষণ বাড়িয়ে তুলতে থাকে।

৭.৫.৫ পুঁজিবাদের সঙ্কট ও সমাজতন্ত্র

ধনতন্ত্রের মুলমন্ত্র হোল পুঁজির সঞ্চয়, উদ্বৃত্ত মূল্য বাজারে বিক্রয়ের মধ্য দিয়ে মুনাফার মাধ্যমে তাকে প্রকৃতি পুঁজিতে রূপান্তরিত করার মাধ্যমে ধনতন্ত্র তার অস্তিত্ব রক্ষা বা বিকাশ প্রক্রিয়া কে ধরে রাখে। কিন্তু যখন উদ্বৃত্ত উৎপাদন বিক্রি করার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয় Sales Realization Crisis এর জন্য তখন মুনাফা হ্রাসের মাধ্যমে মালিকশ্রেনির শক্তি ক্ষয় হওয়া শুরু হয়, অন্যদিকে নিরন্তর শ্রমিক শোষণ, শ্রমিক শ্রেণিকে আরো সংঘবদ্ধ করে এবং শ্রেণি সংঘর্ষ এর দিকে ঠেলে দেয়, যা ধনতন্ত্রের অন্তিম লগ্নের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। বাস্তবে মুনাফা বৃদ্ধির সাথে সাথে বাড়ে উৎপাদন ব্যবস্থায় স্থির-পুঁজির আপেক্ষিক উপস্থিতি, মার্কসের ভাষায় পুঁজির জৈবিক গঠন (Organic Composition of Capital) পরিবর্তিত হয় যা মূলত উৎপাদন ব্যবস্থায় পুঁজি নির্ভরতা বাড়িয়ে শ্রমিক ছাঁটায়ের পরিস্থিতি কে উৎসাহিত করে। এই শ্রেণি সংগ্রাম বা শ্রেণি সংঘর্ষ শুরু হয়। আসলে পুঁজির জৈবিক গঠন (Organic Composition of Capital) পরিবর্তন এরফলে উন্নততর উৎপাদনের আগমন ঘটায় কিন্তু তার সংগে উৎপাদন সম্পর্কের সাযুজ্য বজায় থাকেনা, এই দ্বন্ধের নিরসন হয় তখনই যখন উৎপাদনের হাতিয়ার সমূহের মালিকানা ব্যক্তি মালিকানা থেকে সামাজিক মালিকানায় পরিবর্তিত হয়, অর্থাৎ যখন পুঁজিপতি শ্রেণি যখন শ্রমিক শ্রেণি দ্বারা উৎখাত হয়, এবং সমস্ত উপকরণের মালিকানা তখন শ্রমিক শ্রেণির হস্তগত হয়, এবং শ্রেণিহীন সমাজ উপস্থাপিত হয়। এই পরিবর্তনের ফলে উদ্ভব হয় সমাজতান্ত্রিক সমাজ। শ্রেণিহীন এই সমাজে কোন শ্রেণি দ্বন্ধ থাকেনা কারণ

উৎপাদনের সমস্ত হাতিয়ার এবং শ্রমশক্তির মালিকানা থাকে শ্রেণিহীন সমাজের হাতে, সমাজ তাই হয় দ্বন্ধহীন।

৭.৫.৬ মার্কসের উন্নয়নের স্তর ত্বত্তের একটি মূল্যায়ন

থিসিস, এন্টি-থিসিস এবং সিন্থেসিস এই আবর্তটি হচ্ছে মার্কসের বর্নিত উন্নয়নের স্তর ত্বত্তের মূল ত্বাত্তিক ভিত্তি। উৎপাদনের হাতিয়ার (Forces of Production) ও উৎপাদন সম্পর্কের (Production RelationV ঘাত-প্রতিঘাতে একটি সামাজিক স্তর (Mode of Production) নির্ধারিত হয়। গতিময় সমাজে এই বিষয়গুলি ক্রম পরিবর্তনশীল এবং তার দিকও নির্ধারিত হয় একটি নির্দিষ্ট ধারায়। একটি নির্দিষ্ট সামাজিক স্তর একটি নির্দিষ্ট উৎপাদনের হাতিয়ার (Forces of Production) ও একটি নির্দিষ্ট উৎপাদন সম্পর্কের (Production Relation) ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে, কিন্তু সামাজিক গতিময়তার কারণে এগুলি চিরস্থির থাকেনা, নতুন উন্নততর উৎপাদনের হাতিয়ার (Forces of Production) এর সংগে অসাঞ্জস্যপূর্ন হয়ে উঠে, ফলে পুরাতন সামাজিক স্তর (Mode of Production) তার সংগে সংগতিপুর্ন উৎপাদন সম্পর্ককে (Production Relation)

সমাজে জায়গা করে দেয় এবং এক উন্নততর সামাজিক স্তর (Mode of Production) কে। এই ভাবেই সমাজ এই ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যদিয়ে আদিম সাম্যবাদী সমাজ (Primitive Communism) থেকে সমাজতন্ত্র (Socialism), পাঁচটি স্তর অতিক্রম করে। এখানে মনে রাখা দরকার (১) আদিম সাম্যবাদী সমাজ (২) দাশ , সমাজ (৩) সামন্ত্রতন্ত্র (৪) ধনতন্ত্র বা পুঁজি বাদী সমাজ ব্যবস্থায় যে দ্বন্ধমুলক গতিময়তার কাজ করে , সমাজতন্ত্রের মধ্যে সেটি কার্যকর থাকেনা কারণ শ্রেণিহীন সমাজে উৎপাদন সম্পর্কের সংগে দ্বন্ধ দেখা যায়না। এইভাবে মার্কস তার গতি তত্ত্ব ও বাস্তবে কারণ সমূহের ভিত্তিতে বৈজ্ঞানিক ভাবে ব্যাখ্যা করেন সমাজ বিবর্তনের, যেটি ইতিহাসের বস্তু নির্ভর ব্যাখ্যাও বলে।

৭.৬ রস্ট্রো এর উন্নয়নের স্তর

৭.৬.১ রস্টোর 'অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির স্তর' তত্ত্ব ও উন্নয়নের পথ পরিক্রমা

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তীকালে এশিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন ইউরোপীয় উপনিবেশে স্বাধীনতা আন্দোলন তীব্রতর হয়ে ওঠে। বিশ্বজুড়ে রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং অর্থনৈতিক স্থবিরতার কারণে বিশ্বযুদ্ধ শেষে ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, স্পেন প্রভৃতি সাম্রাজ্যগুলো বিভিন্ন অঞ্চল থেকে নিজেদের গুঁটিয়ে নিতে বাধ্য হয়।

১৯৪৫ থেকে ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে অধিকাংশ ঔপনিবেশিক অঞ্চল স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। কিন্তু, দীর্ঘকাল ঔপনিবেশিক শাসকদের লুটতরাজে নিঃস্ব সদ্য-স্বাধীন রাষ্ট্রগুলোর উন্নয়ন নানাবিধ আর্থসামাজিক পরিস্থিতে থমকে ছিল।

ইতোপূর্বে অ্যাডাম স্মিথ, স্যার উইলিয়াম পেটি, কার্ল মার্ক্স প্রমুখ অর্থনীতিবিদের তত্ত্ব-মতবাদ বহুল পরিচিত ও প্রযোজ্য হলেও এসময় সেগুলোর বিকল্প ও সময়োপযোগী ধারণা-তত্ত্বের প্রয়োজনীয়তা দেখা

দেয়। 'তৃতীয় বিশ্বের দেশ' বা 'অনুন্নত দেশ' হিসেবে পরিচিত পাওয়া এই দেশগুলোর অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিয়ে পাশ্চাত্যে প্রচুর গবেষণা শুরু হয়।

যার পরিণতিতে 'উন্নয়ন অর্থনীতি' নামে অর্থনীতির একটি স্বতন্ত্র শাখার উদ্ভব ঘটে। গবেষকগণ অর্থনৈতিক উন্নয়নের নতুন অনেক ধারণা ও তত্ত্ব উপস্থাপন করেন। তেমনি একটি উল্লেখযোগ্য তত্ত্ব হচ্ছে মার্কিন অর্থনীতিবিদ ওয়াল্ট রস্টো-র 'অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি স্তর' তত্ত্ব। 'অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্তর', 'উন্নয়নের স্তর তত্ত্ব', 'Stages of Economic Growth'– 'Rostovian Take-Off Model' ইত্যাদি নামেও তত্ত্বটি পরিচিত।

৭.৬.২ তাত্ত্বিক ও তত্ত্বের পটভূমি, Background of Theory & Theorist

ওয়াল্ট হোয়াইটম্যান রস্টো (Walt Whitman Rostow, 1916, 2003) একাধারে অর্থনীতিবিদ, অধ্যাপক এবং রাজনৈতিক তাত্ত্বিক ছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন তিনি যুক্তরাষ্ট্রের একটি গোয়েন্দা সংস্থায় কর্মরত ছিলেন। পরবর্তীতে যুক্তরাষ্ট্রের একাধিক রাষ্ট্রপতির উপদেষ্টা এবং বক্তৃতা লেখক সহ রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন।

ষাটের দশকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র নীতি-বিষয়ক সকল নীতি প্রণয়নে ওয়াল্ট রস্টো মুখ্য ভূমিকা পালন করতেন। এসময় এশিয়া, আফ্রিকা এবং ল্যাটিন আমেরিকায় কমিউনিজমের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পেলে রস্টো পুঁজিবাদ এবং মুক্ত বাজার অর্থনীতি সম্পর্কে একাধিক গ্রন্থ, প্রবন্ধ ও তত্ত্ব প্রকাশ করেন।

১৯৬০ সালে প্রকাশিত রস্টোর সর্বাধিক আলোচিত গ্রন্থ "The Stages of Economic Growth- A Non-Communist Manifesto"-এ 'অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির স্তর' তত্ত্ব উপস্থাপন করা হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সদ্য স্বাধীন রাষ্ট্রগুলো যখন রুশ সমাজতন্ত্রের দিকে ঝুঁকে পড়ছিল, তখন অর্থনৈতিক সাহায্যের মাধ্যমে সেই রাষ্ট্রগুলোকে পুঁজিবাদী যুক্তরাষ্ট্রের বলয়ে নিয়ে আসার পরিকল্পনা থেকেই রস্টোর এই তত্ত্ব প্রদান করেন।

এই তত্ত্বে প্রভাবিত জন এফ. কেনেডি রস্টোকে তাঁর উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগ দেন। কেনেডির জনপ্রিয় 'New Frontier' বক্তৃতাও তিনি লিখেছিলেন। পরবর্তী প্রেসিডেন্ট লিন্ডন বি জনসনতও রস্টোকে তাঁর উপদেষ্টা এবং বক্তৃতা লেখকের পদে নিয়োজিত করেন। উভয় প্রেসিডেন্টের আমলেই যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র নীতি প্রণয়ন ও কর্মকাণ্ডে রস্টো এবং তার 'অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি স্তর' তত্ত্ব প্রভাবশালী ভূমিকা রাখে।

৭.৬.৩ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির স্তর' তত্ত্ব, 'Stages of Economic Growth' Theory

ব্রিটেন তথা যুক্তরাজ্য, স্কটল্যান্ড এবং ওয়েলসের শিল্প-বিপ্লব এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নকে কেস স্টাডি হিসেবে বিশ্লেষণ করেই মূলত ওয়াল্ট রস্টো 'অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির স্তর' তত্ত্ব প্রণয়ন করেন। কার্ল মার্ক্সের সমাজতন্ত্র ভিত্তিক 'শ্রেণি সংগ্রাম' তত্ত্বের পুঁজিবাদ বা মূলধন নির্ভর বিকল্প প্রদানেই রস্টো এই তত্ত্ব দিয়েছিলেন।

রস্টো-র মতে, একটি রাষ্ট্র বা সমাজকে আদিম বা অনুন্নত স্তর থেকে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বা উন্নতির স্তরে পৌঁছাতে পাঁচটি স্তরের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়।*নিম্নে এই পাঁচটি স্তর এবং তাদের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে

আলোকপাত করা হলো,

৭.৬.৩.১ সনাতন সমাজ, Traditional Society

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির প্রাথমিক স্তর সনাতন সমাজ কৃষি-নির্ভর হয়, যদিও প্রযুক্তিগত সীমাবদ্ধতায় উৎপাদন সীমিত এবং অপ্রতুল হয়ে থাকে। উৎপাদনের জন্য আবাদি জমি এবং সমাজের সার্বিক ক্ষমতা স্বল্প কিছু ব্যক্তির নিয়ন্ত্রণে থাকায় সমাজে শ্রেণিবিভক্তি দেখা দেয়। ফলে সেই সমাজের লক্ষণীয় পরিবর্তন এবং উন্নয়ন হয় না।

রস্টো-র ভাষায়, তসনাতন সমাজ হল এমন একটি সমাজ, যার কাঠামো প্রাক-নিউটনিয়ান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং বাস্তব জগতের প্রতি প্রাক-নিউটনিয়ান মনোভাবের উপর ভিত্তি করে সীমিত উৎপাদন কর্মকাণ্ডের মধ্যেই আবর্তিত হয়।দ

অর্থনীতিবিদ জন মেনার্ড কেইন্সের ভাষ্যমতে, তখ্রিস্টের জন্মের দু'হাজার বছর আগে থেকে আঠারো শতকের শুরু পর্যন্ত পৃথিবীর সভ্যতার কেন্দ্রসমূহে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মানের কোনো বড় পরিবর্তন হয়নি। উঠানামা হয়েছে নিশ্চয়ই। দুর্ভিক্ষ ও যুদ্ধও দেখা দিয়েছে। কখনও এসেছে সোনালি বিরতি। কিন্তু প্রগতিশীল কোনো পরিবর্তন দেখা যায়নি।দ অর্থনৈতিকভাবে স্থবির সেই যুগকেই রস্টো রূপকার্থে 'প্রাক-নিউটনিয়ান' বা বিজ্ঞানী নিউটনের পূর্বযুগ বলেছেন।

রস্টো সনাতন সমাজের সুনির্দিষ্ট কিছু বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছেন। সেগুলো হচ্ছে ,

কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি;

অনুন্নত প্রযুক্তি;

সম্ভাবনা সত্ত্বেও সীমিত উৎপাদনশীলতা;

শিল্পের স্বল্পতা ও উৎপাদনে সীমাবদ্ধতা;

শ্রেণীবিভক্ত সমাজ ও কেন্দ্রীভূত ক্ষমতা;

জমির মালিকদের অসীম প্রভাব;

যুদ্ধ ও মহামারীর কারণে জীবনের অনিশ্চয়তা;

এই স্তরে সমাজের অধিকাংশ শ্রমশক্তি কেবল খাদ্য উৎপাদনেই নিয়োজিত থাকে। উন্নত প্রযুক্তি এবং শিল্পের অভাবে পর্যাপ্ত উৎপাদন হয় না। ফলে সমাজে উদ্বৃত্ত অর্থ থাকে না এবং বিনিয়োগের মাধ্যমে বর্ধিত উৎপাদন সম্ভব হয় না। বরং, ভূমি-মালিকদের বিলাসিতা, যুদ্ধ, মহামারি ইত্যাদি প্রায়ই সেই সীমিত উৎপাদনকেও ব্যাহত করে।

৭.৬.৩.২ উড্ডয়নের পূর্বাবস্থা, Preconditions for TakeéôéOff

উড্ডয়নের পূর্বাবস্থার স্তরে বিক্ষিপ্ত সমাজগুলো মিলে জাতি-রাষ্ট্র গঠন করে এবং কল্যাণমূলক শাসন

ব্যবস্থা গড়ে উঠে। এই স্তরে সমাজগুলো অসংখ্য পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যায়। প্রথাগত সংস্কৃতি ও বিশ্বাসের চেয়ে ভিন্নধর্মী কিছু অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়ে এসময় সমাজের সদস্যরা নানান দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগে।

পরবর্তীতে, উদ্যোগী ব্যক্তিরা এগিয়ে আসে ঝুঁকি নিয়ে শিল্প প্রতিষ্ঠা করে। রাষ্ট্রীয় পৃষ্টপোষকতায় কৃষির পাশাপাশি শিক্ষা, যোগাযোগ, বাণিজ্যেও পুঁজির বিনিয়োগ ঘটে এবং এসব খাত উন্নত হয়। ফলে উৎপাদন এবং বাজার সমাজ থেকে রাষ্ট্র পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয়। ফলে, রাষ্ট্রের জাতীয় আয় ৫%-র মত বৃদ্ধি পায়।

রস্টো-র ভাষায়, ত্প্রবৃদ্ধির দ্বিতীয় স্তরে সমাজগুলো পরিবর্তনকে মেনে নেয়; এসময় উড্ডয়নের পূর্বাবস্থা বা পরিস্থিতিগুলো সৃষ্টি হয়; কারণ একটি সনাতন সমাজকে আধুনিক বিজ্ঞানের ফল ভোগ করতে, ক্রমহ্রাসমান উৎপাদনকে স্থিতিশীল করতে এবং এভাবে চক্রবৃদ্ধি মুনাফার অগ্রযাত্রার মাধ্যমে উন্মোচিত আশীর্বাদ এবং আকাঙ্ক্ষাগুলো বাস্তবায়নে যথাযথ উপায়ে রূপান্তর করতে সময় লাগে।দ

তার মতে, সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ দিকে এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর শুরুর দিকে পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলোতে এই স্তর প্রথম পরিলক্ষিত হয়। আধুনিক বিজ্ঞানের প্রভাবে সেখানকার কৃষি এবং শিল্পের উৎপাদন গতিশীলতা পায়, যা পরবর্তীতে বিশ্ব বাজার পর্যন্ত বিস্তৃত হয়।

সনাতন সমাজ থেকে উড্ডয়নের পূর্বাবস্থার স্তরে পৌঁছাতে নিম্নক্ত বৈশিষ্ট্যগুলো প্রভাবক হিসেবে কাজ করে,

আধুনিক অর্থনৈতিক ও উৎপাদনমুখী শিক্ষা;

শিল্প সৃষ্টি এবং সঞ্চয় ও বিনিয়োগের সুযোগ;

উন্নত প্রযুক্তি আবিষ্কার ও ব্যবহার;

শিল্পের বিকাশ ও বাণিজ্যের প্রসার;

এসব বৈশিষ্ট্য সামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামোয় স্থিতিশীলতা আনে। ফলে নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন হয় এবং স্বাভাবিক উৎপাদনের সঙ্গে নিত্য-নতুন উৎপাদন কার্যক্রমের মাধ্যমে শিল্পায়ন ঘটে। উদ্বৃত্ত উৎপাদন আমদানির মাধ্যমে বাজার সম্প্রসারণের সম্ভাবনাকে ত্বরান্বিত করে।

৭.৬.৩.৩ উড্ডয়ন, TakeéôéOff

উড্ডয়ন রস্টোর তত্ত্বের কেন্দ্রীয় প্রত্যয়। এই স্তরের প্রারম্ভে রাজনৈতিক বিপ্লব, প্রযুক্তিগত বিপ্লব, কিংবা অনুকূল আন্তর্জাতিক পরিবেবের কারণে জনমনে বিপুল উদ্দীপনা লক্ষ করা যায়। এসময় শিল্পায়ন এবং নগরায়ন অতি দ্রুত সম্প্রসারিত হয়।

উড্ডয়নকালে নতুন কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয় এবং কর্মীরা সঞ্চয়ে অভ্যস্ত হয়। পরবর্তীতে সঞ্চিত অর্থ দিয়ে তারা উদ্যোক্তার ভূমিকা পালন করে এবং বেসরকারি খাতে বিনিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। অব্যবহৃত প্রাকৃতিক সম্পদ এবং আধুনিক প্রযুক্তি ও কৌশলকে কাজে লাগিয়ে অর্থনীতি শক্তিশালী হয়ে উঠে।

ফলে, উন্নয়ন সমাজ বা রাষ্ট্রের একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া বলে পরিগণিত হয়। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানিক

কাঠামোতে বিনিয়োগ এবং তা থেকে মুনাফা অর্জনের ধারণা সুগঠিত হয় এবং কালক্রমে তা অভ্যাসে পরিণত হয়।

রস্টো-র ভাষায়, উড্ডয়নকালে ত্তউৎপাদনশীল অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মাত্রা একটি জটিল পর্যায়ে পৌঁছায় এবং পরিবর্তন সৃষ্টি হয়, যা অর্থনীতি এবং সেই সমাজের একটি ব্যাপক ও প্রগতিশীল কাঠামোগত পরিবর্তন ঘটায়, এই পরিবর্তনকে মাত্রার চেয়ে ধরণ দিয়ে বিবেচনা করা শ্রেয়।দ

তার মতে, উড্ডয়নের জন্য তিনটি বৈশিষ্ট্য বা আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি বিরাজমান থাকা আবশ্যক। সেগুলো হচ্ছে ,

উৎপাদনমুখী বিনিয়োগের হার জাতীয় আয় অথবা নিট জাতীয় উৎপাদনের ৫% (অথবা তার কম) থেকে ১০ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি পেতে হবে;

এক বা একাধিক গুরুত্বপূর্ণ উৎপাদন খাতে উচ্চ প্রবৃদ্ধি হার অর্জন করতে হবে;

একটি রাজনৈতিক, সামাজিক ও কাঠামোগত রূপরেখা থাকতে হবে, যা আধুনিক খাত ও সম্ভাব্য বৈদেশিক বাণিজ্যের সম্প্রসারণে সাহায্য করবে এবং উড্ডয়নকে স্থায়িত্ব প্থ্ধদান করবে;

এই স্তরে আধুনিকায়ন সূচিত হয়। উন্নয়নশীল দেশগুলো উৎপাদনমুখী বিনিয়োগের জন্য পুঁজি ও সম্পদ সংগ্রহের লক্ষ্যে করারোপ, সম্পত্তি অধিগ্রহণ করতে পারে কিংবা ব্যাংক, অর্থায়ন প্রতিষ্ঠান বা পুঁজিবাজার থেকে সহায়তা নেয়। তৃতীয় বিশ্বের অনুন্নত দেশগুলো বৈদেশিক পুঁজি বিনিয়োগ ও সহায়তা গ্রহণ অথবা ঋণ নিয়ে উৎপাদনমুখী শিল্পের প্রসার ঘটাতে পারে।

এক্ষেত্রে, কৃষি, বস্ত্র, যোগাযোগ, প্রাকৃতিক সম্পদ ইত্যাদি প্রধান উৎপাদনমুখী শিল্পের ভূমিকা রাখে। এসব শিল্পের উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন সহায়ক বা উদ্ভূত খাত (ঙব্রহ্ডত্রন্ম ঝদ্রন্দ্রঠত্র্ত্রত্বঠদ্র) গড়ে উঠে।

৭.৬.৩.৪ পরিপূর্ণতা লাভের প্রচেষ্টা, Drive to Maturity

উড্ডয়ন স্তরে সাফল্য অর্জনের পর একটি রাষ্ট্রের অর্থনীতি পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হওয়ার সক্ষমতা লাভ করে। অর্থাৎ, দেশটির শিল্প এবং অন্যান্য অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলো সময়ের সাথে সাথে পরিপক্ব হয়ে উঠে।

এই স্তরে রাষ্ট্র বা সমাজের সম্পদের প্রতিটি ক্ষেত্রে কার্যকরিভাবে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের উপর গুরুত্ব দেয়া হয়। শিল্পায়ন প্রক্রিয়া বহুমুখী হবে, নতুন নতুন খাতে বিনিয়োগ ও উৎপাদনে গতি সঞ্চারিত হবে এবং পূর্বের প্রধান শিল্পগুলোর জায়গায় নতুন শিল্পগুলো স্থান করে নিবে। শহরের সুযোগ ও সীমানা মফস্বল পর্যন্ত পৌঁছে যাবে।

রস্টো-র ভাষায়, ত্তউড্ডয়নের পর প্রবৃদ্ধি ওঠানামা করলে (শিল্পের) স্থায়িত্ব বা পরিপূর্ণতা পেতে একটি দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হতে পারে, কেননা এসময় নিয়মিতই উদীয়মান অর্থনীতি তার অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সর্বক্ষেত্রে আধুনিক প্রযুক্তির প্রয়োগ করে।দ

উড্ডয়ন স্তর থেকে পরিপক্কতা লাভের প্রচেষ্টার স্তরে পৌঁছাতে রস্টো নিম্নক্ত শর্তাবলী উল্লেখ করেছেন,

অর্থনৈতিক বিনিয়োগের মাত্রা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়ে ১০% থেকে ২০% পর্যন্ত হবে;

আধুনিক প্রযুক্তির সহায়তায় গুটিকয়েক শিল্পের পরিবর্তে নতুন এবং বৈচিত্র্যময় শিল্পের বিকাশ ঘটবে;

আমদানির পরিবর্তে উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ হবে এবং রপ্তানি খাতের পণ্য ও বাজার সম্প্রসারিত হবে;

একটি রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক পরিপূর্ণতা বা পরিপক্কতা লাভের জন্য উড্ডয়ন পরবর্তী পর্যায়ে প্রায় ৬০ বছর সময় লাগতে পারে। এসময় জাতীয় আয়ের ১০ থেকে ২০ু ধারাবাহিকভাবে বিনিয়োগকৃত হবে, যার ফলে প্রবৃদ্ধি জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে ছাড়িয়ে যাবে। রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির স্থায়িত্ব নিশ্চিত হবে।

৭.৬.৩.৫ উচ্চ গণভোগের কাল, Age of High MasséôéConsumption

অর্থনৈতিক পরিপক্কতা লাভের মাধ্যমে, রস্টো-র মতে, একটি রাষ্ট্র কল্যাণ রাষ্ট্রে (Welfare State) পরিণত হয়। এই স্তরে জনমনে ভোগ্যপণ্য ব্যবহার, সামাজিক নিরাপত্তা, বিনোদন ও অবকাশ যাপনের মানসিকতা তৈরি হয়। অর্থাৎ, পরিপক্কতা লাভের পর উচ্চ ভোগ-প্রবণতা সৃষ্টি হবে। তবে, অর্থনীতি থমকে না গিয়ে বরং ক্রমাগতভাবে চলতে থাকবে।

পরিপক্কতা লাভের প্রচেষ্টা থেকে উচ্চ গণভোগ প্রবণতার স্তর পর্যন্ত বিকাশের পর্যায়টি সব থেকে দীর্ঘতম স্তর। এসময় প্রধান বা নেতৃস্থানীয় শিল্প খাতের ভূমিকা পালন করে টেকসই ভোগ্য পণ্যের শিল্প ও সেবা প্রতিষ্ঠান।

রস্টো-র মতে, এসময় অর্থনীতিতে নিম্নলিখিত পরিবর্তনগুলো দৃশ্যমান হয়ে ওঠে ,

রাষ্ট্রের অধিকাংশ নাগরিকের আয় বৃদ্ধি পেয়ে এমন পর্যায়ে পৌঁছায়, যাতে তারা মৌলিক চাহিদা মিটিয়ে অন্যান্য ভোগ্য পণ্য এবং সেবা খাতে ব্যয় করতে পারে;

শিল্পের কাঠামোগত এবং শ্রমশক্তির গুণগত পরিবর্তন আসে, নগরকেন্দ্রিক শিল্প গড়ে ওঠে এবং দক্ষ শ্রমিকের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়;

রাষ্ট্র বা সমাজগুলো নাগরিকদের কল্যাণ এবং সামাজিক নিরাপত্তার দিকে অধিক গুরুত্ব আরোপ করে;

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উচ্চ ভোগ-প্রবণতা স্তরে পৌঁছায় ১৯২০ সালে, জাপান এবং পশ্চিম ইউরোপের বিভিন্ন দেশ ১৯৫০-র দশকের মধ্যে এই স্তরে পৌঁছায়। রস্টো-র মতে, সোভিয়েত ইউনিয়ন (রাশিয়া)-র আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতিও এই স্তরে পৌঁছানোর জন্য প্রস্তুত ছিল এবং সেখানকার নাগরিকরাও তা চেয়েছিল। কিন্তু কমিউনিস্ট শাসনের কারণে সেসময় তা হয়ে ওঠেনি।

৭.৬.৪ তত্ত্বের সমালোচনা, Criticism of Theory

রস্টোর 'অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির স্তর' তত্ত্ব বিভিন্ন কারণে বেশ সমালোচিত হয়েছে। বিশেষত, অনুন্নত দেশগুলোকে উন্নত করার উদ্দেশ্যে মডেলটি প্রদান করা হলেও মডেলটি তৈরি হয়েছে তুলনামূলক উন্নত দেশগুলোকে গবেষণার নিরিখে।*

যেমনঃ ব্রিটেন সহ ইউরোপের উপনিবেশিক রাষ্ট্রগুলো উপনিবেশের সম্পদ দখলের মাধ্যমে শিল্পায়ন বা উড্ডয়নের পূর্বাবস্থার আগে থেকেই সমৃদ্ধশালী ছিল। তাই উড্ডয়নের জন্য তাদের বিনিয়োগ বা উৎপাদন নিয়ে বেগ পেতে হয়নি।

অপরদিকে, উপনিবেশগুলো স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেলেও তাদের বিনিয়োগ বা উৎপাদনের জন্য পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা বা পরিস্থিতি ছিল না। একারণে অনেকে রস্তোর তত্ত্বকে 'উন্নয়ন অর্থনীতি'-র অন্তর্ভুক্ত মানতে নারাজ।

তাছাড়া, চীন, জাপান প্রভৃতি রাষ্ট্রগুলো বিশেষ কোনো শিল্পের উপর নির্ভর না করেই উড্ডয়ন এবং পরিপূর্ণতা লাভের স্তরে পৌঁছে গেছে। সেসব রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে এই তত্ত্বের প্রয়োগ ঘটে না।

এই তত্ত্বের আরেকটি সমালোচনা হল, যেসব দেশকে নমুনা হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে, সেগুলো আয়তন এবং জনসংখ্যা বিবেচনায় তুলনামূলক বড়। তাদের পক্ষে পর্যাপ্ত শ্রমশক্তি কিংবা প্রাকৃতিক সম্পদ অর্জন সহজ। পক্ষান্তরে, আয়তনে ছোট কিংবা আফ্রিকার মরু অঞ্চল এবং কম জনসংখ্যার দেশগুলোর পক্ষে বড় দেশগুলোর মত একই গতিতে উন্নয়ন সম্ভব নয়।

প্রকৃতপক্ষে মার্কসীয় তত্ত্বের বিকল্প হিসেবে রস্টো তার স্তর তত্ত্ব প্রদান করেছেন বলে মনে করা হয়। উভয় তত্ত্বেই আর্থ-সামাজিক বিবর্তনের পথ পরিক্রমা গুরুত্ব পেয়েছে। স্তর তত্ত্ব পুঁজিবাদী মতবাদের ধারক হলেও রস্টো আর্ক্সের স্তরসমূহের যৌক্তিকতা, অনিবার্যতা বা সীমাবদ্ধতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে নিজের তত্ত্ব নির্মাণের ক্ষেত্রে কোনোরূপ সংস্কার প্রয়াসী হননি।দ

৭.৭ সারাংশ

প্রাথমিক অবস্থায় দেশগুলি প্রাথমিক দ্রব্য উৎপাদনে নিজেদের নিবেশ করে তাদের আবশ্যকীয় পণ্যসামগ্রীর চাহিদা পূরণ করে, এরপর দেশের সম্পদ ধাবিত হয় শিল্প বা মাধ্যমিক ক্ষেত্রে, যা শিল্পোৎপাদন এবং উৎপাদনশীলতা বাড়িয়ে, মানুষের অবসর সময় বাড়িয়ে দেবে যা শেষ পর্যায়ে পুঁজি ও শ্রমশক্তির অভিমুখ পালটে নিয়ে যাবে তৃতীয় ক্ষেত্রে বা পরিষেবা ক্ষেত্রে। এই ছিল ক্লার্ক-ফিশার এর মডেল, এই মডেলকে এঙ্গেলস সূত্রও তাত্ত্বিক সমর্থন প্রদান করে। পরবর্তী ধাপে বিশিষ্ট জার্মান দার্শনিক কার্ল মার্কস এর কম্যুনিস্ট ম্যানিফেস্টো প্রকাশের মাধ্যমে দেখান কি ভাবে আদিম সমাজ থেকে ধাপে ধাপে সমাজতান্ত্রিক সমাজের পরিবর্তন আসে। হয়। মার্কস বর্নিত স্তর গুলি হোল, (১) আদিম সাম্যবাদী সমাজ (২) দাশ , সমাজ (৩) সামন্ত্রতন্ত্র (৪) ধনতন্ত্র বা পুঁজি বাদী সমাজ (৫) সমাজতান্ত্রিক সমাজ।

প্রতিটি স্তর একটি নির্দিষ্ট উৎপাদনের হাতিয়ার ও একটি উৎপাদন সম্পর্ক দ্বারা নির্ধারিত। উৎপাদনের হাতিয়ার (Forces of Production) ও উৎপাদন সম্পর্ক হচ্ছে উৎপাদন পদ্ধতি (Mode of Production) এর দুটি অবিচ্ছেদ্য নির্নায়ক।আধুনিক পরিভাষায় উৎপাদনের হাতিয়ার (Forces of Production) হচ্ছে উৎপাদনের প্রযুক্তিগত দিকটির সংগে সংপৃক্ত অন্যদিকে উৎপাদন সম্পর্ক (Production Relation) হোল উৎপাদনের ক্ষেত্রের সংপৃক্ত সামাজিক বিষয় সমূহ। মার্কসের মতে উৎপাদনের হাতিয়ারগুলি ,

উৎপাদন সম্পর্কগুলির থেকে অনেক বেশি গতিশীল। এর ফলে উৎপাদনের হাতিয়ার এর পরিবর্তন সংগে তাতক্ষনিকভাবে উৎপাদন সম্পর্কের পরিবর্তন ঘটেনা, একটি সময় ব্যবধান থেকে যায়। এরফলে নতুন উন্নততর উৎপাদনের হাতিয়ারের সঙ্গে পুরাতন উৎপাদন সম্পর্কের একটি দ্বন্ধ সৃষ্টি হয়। সংঘাত পূর্ন এই দ্বন্ধের ফলে উৎপাদন সম্পর্কের একটি পরিবর্তন ঘটে যা নতুন উৎপাদনের হাতিয়ারের সঙ্গে সাজুয্যপূর্ন বা সংগতিপূর্ন, যার ফলে এসে এক উন্নততর নতুন উৎপাদন পদ্ধতি (Mode of Production) সমাজ। অর্থাৎ থিসিস ও অ্যান্টি-থিসিস এর সংঘাতের পর এক সিন্থেথিসিস এর মাধ্যমে এক নতুন উৎপাদন পদ্ধতির সৃষ্টি একটি স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা। এটি একটি দ্বন্ধমূলক পদ্ধতি হিসেবে পরিচিত।

ব্রিটেন তথা যুক্তরাজ্য, স্কটল্যান্ড এবং ওয়েলসের শিল্প-বিপ্লব এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নকে কেস স্টাডি হিসেবে বিশ্লেষণ করেই মূলত ওয়াল্ট রস্টো 'অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির স্তর' তত্ত্ব প্রণয়ন করেন। কার্ল মার্ক্সের সমাজতন্ত্র ভিত্তিক 'শ্রেণি সংগ্রাম' তত্ত্বের পুঁজিবাদ বা মূলধন নির্ভর বিকল্প প্রদানেই রস্টো এই তত্ত্ব দিয়েছিলেন।*

রস্টো-র মতে, একটি রাষ্ট্র বা সমাজকে আদিম বা অনুন্নত স্তর থেকে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বা উন্নতির স্তরে পৌঁছাতে পাঁচটি স্তরের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়।*নিম্নে এই পাঁচটি স্তর এবং তাদের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো ,

উড্ডয়নের পূর্বাবস্থার স্তরে বিক্ষিপ্ত সমাজগুলো মিলে জাতি-রাষ্ট্র গঠন করে এবং কল্যাণমূলক শাসন ব্যবস্থা গড়ে উঠে। এই স্তরে সমাজগুলো অসংখ্য পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যায়। প্রথাগত সংস্কৃতি ও বিশ্বাসের চেয়ে ভিন্নধর্মী কিছু অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়ে এসময় সমাজের সদস্যরা নানান দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগে।

পরবর্তীতে, উদ্যোগী ব্যক্তিরা এগিয়ে আসে ঝুঁকি নিয়ে শিল্প প্রতিষ্ঠা করে। রাষ্ট্রীয় পৃষ্টপোষকতায় কৃষির পাশাপাশি শিক্ষা, যোগাযোগ, বাণিজ্যেও পুঁজির বিনিয়োগ ঘটে এবং এসব খাত উন্নত হয়। ফলে উৎপাদন এবং বাজার সমাজ থেকে রাষ্ট্র পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয়। ফলে, রাষ্ট্রের জাতীয় আয় ৫-র মত বৃদ্ধি পায়।

রস্টো-র ভাষায়, অপ্রবৃদ্ধির দ্বিতীয় স্তরে সমাজগুলো পরিবর্তনকে মেনে নেয়; এসময় উড্ডয়নের পূর্বাবস্থা বা পরিস্থিতিগুলো সৃষ্টি হয়; কারণ একটি সনাতন সমাজকে আধুনিক বিজ্ঞানের ফল ভোগ করতে, ক্রমহ্রাসমান উৎপাদনকে স্থিতিশীল করতে এবং এভাবে চক্রবৃদ্ধি মুনাফার অগ্রযাত্রার মাধ্যমে উন্মোচিত আশীর্বাদ এবং আকাঙ্ক্ষাগুলো বাস্তবায়নে যথাযথ উপায়ে রূপান্তর করতে সময় লাগে।দ

তার মতে, সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ দিকে এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর শুরুর দিকে পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলোতে এই স্তর প্রথম পরিলক্ষিত হয়। আধুনিক বিজ্ঞানের প্রভাবে সেখানকার কৃষি এবং শিল্পের উৎপাদন গতিশীলতা পায়, যা পরবর্তীতে বিশ্ব বাজার পর্যন্ত বিস্তৃত হয়।

এই পর্যায়ে এই তত্ত্বগুলির বিশ্লেষণের মাধ্যমে সমাজের উত্তরণের ব্যাখ্যা করেছেন, যা সমালোচকের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে এখানে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

৭.৮ অনুশীলনী

নীচের সংক্ষিপ্ত প্রশ্নগুলির উত্তর দিন। (প্রতিটির মান ২.৫)

প্রাথমিক উপজীবিকা কাকে বলে?

মাধ্যমিক উপজীবিকা কাকে বলে?

তৃতীয় ক্ষেত্র বলতে কি বোঝায়?

রস্ট্রো বর্নিত সমৃদ্ধির স্তরগুলির উল্লেখ করুন।

উড্ডয়ন পর্ব বলতে কি বোঝায়?

স্বয়ংচালিত উন্নয়ন বলতে কি বোঝায়?

সমৃদ্ধির স্তর বোঝাবার জন্য মার্কস বর্নিত বিভিন্ন স্তরের উল্লেখ করুন।

মার্কসের মতবাদ অনুযায়ী উদ্বৃত্ত মূল্য বলতে কি বোঝায়?

মার্কসীয় মতবাদ অনুযায়ী উন্নয়নের চূড়ান্ত স্তর কি?

স্বয়ংচালিত উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় শর্তগুলি উল্লেখ করুন।

মাঝারি দৈর্ঘ্যের প্রশ্ন (প্রতিটির মান ৫)

ক্লার্ক , ফিশারের তত্ত্বের দূর্বলতাগুলি বিবৃত করুন।

মার্কস কি ভাবে পুঁজিবাদ বা ধনতন্ত্রের সংকট টি ব্যাখ্যা করেন?

মার্কসের বর্নিত Sales Realization Crisis বলতে কি বোঝেন?

নীচের সংক্ষিপ্ত প্রশ্নগুলির উত্তর দিন। (প্রতিটির মান ১০)

অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির বিভিন্ন স্তর সম্পর্কে রস্ট্রোর মতবাদ আলোচনা করুন।

অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি সম্পর্কে মার্কসীয় তত্ত্বটি সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির স্তর বিশ্লেষণে রস্ট্রো ও মার্কসের মৌলিক পার্থক্য উল্লেখ করুন।

স্বয়ংচালিত উন্নয়ন বলতে কি বোঝায়? স্বয়ংচালিত উন্নয়নের প্রাথমিক শর্তগুলি আলোচনা করুন।

৭.৯ গ্রন্থপঞ্জী

Rostow W.W. “The Stages of Economic Growth” Cambridge– New York 1960

Rostow W.W.” The Take Off into Self sustained Growth” Economic Journal– March

1956.Reprinted in Economics of Under Development– Agarwala and Sing SEditedV OUP New York –1963.

Colin Clark "The Condition of Economic Progress" MacMillan– 1957–3rd edition 1957.Lon

Kuznets Simons "Economic Growth and Structure" London Heinemann 1965.

Bhattacharya Debesh "Political Economy of Development SAcademic Publishers– Calcutta– 1990V

একক ৮ অর্থনৈতিক অসাম্য সংজ্ঞা, পরিমাপ ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন

গঠন

৮.১ উদ্দেশ্য

৮.২ প্রস্তাবনা

৮.৩ আয় বণ্টনে অসমতা

৮.৪ আয়ের পরিমাণগত বণ্টন

৮.৫ লোরেঞ্জ রেখা

৮.৬ গিনি সহগ

৮.৭ আয়ের কর্মগত বা বৃত্তিগত বণ্টন

৮.৮ উন্নয়ন ও বৈষম্য কুজনেৎসের প্রকল্প

৮.৯ লিঙ্গ বৈষম্য

৮.১০ নারী ও উন্নয়ন

৮.১১ নারী উন্নয়নের পরিমাপ

৮.১২ সারাংশ

৮.১৩ অনুশীলনী

৮.১৪ গ্রন্থপঞ্জী

৮.১ উদ্দেশ্য

এই এককে অসমতা বলতে আমরা কী বুঝি তা আলোচনা করব। আয়ের পরিমাণগত বণ্টন কীভাবে হয় এবং তার মাধ্যমে আয়-বৈষম্য কীভাবে বোঝা যায় সেটাও জানব। আয়-বৈষম্য কীভাবে পরিমাপ করা হয় সেটা বিশদভাবে আলোচিত হবে। এরপর আমরা কুজনেৎসের তত্ত্বের মাধ্যমে বোঝার চেষ্টা করব মাথাপিছু আয় পরিবর্তনের সঙ্গে আয়-বৈষম্যের কী সম্পর্ক আছে।

৮.২ প্রস্তাবনা

অসাম্য বা বৈষম্য অনুন্নতির হাত ধরাধরি করে চলে। একক ২-এ আমরা দেখেছি কীভাবে অসম বিনিময়ের মাধ্যমে উন্নত দেশ স্বল্পোন্নত দেশকে শোষণ করে এবং তার অবশ্যম্ভাবী ফল হল অনুন্নতি। ঠিক একইভাবে একই দেশের মধ্যে এক শ্রেণীর মানুষ বিত্তশালী অপর দিকে বেশির ভাগ মানুষ অসম আয়

বণ্টনের শিকার। দেশের প্রকৃত আয় বৃদ্ধি পেলেও যদি বেশির ভাগ লোক দারিদ্র্যের মধ্যে দিন কাটায় তবে তাকে অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলা যাবে না।

৮.৩ আয় বণ্টনে অসমতা (Distributional Inequality of Income)

পৃথিবীর সর্বত্রই আয় বণ্টনে কম বেশি অসমতা দেখা যায়। এই অসমতা যেমন এক দেশ থেকে আরেক দেশে দেখা যায়, তেমনই দেখা যায় একই দেশের এক অংশ থেকে অন্য অংশে। উদাহরণস্বরূপ, প্রতি বছর সারা পৃথিবী জুড়ে যে উৎপাদন হয় তার একটা বড় অংশ যেমন আমেরিকার, তেমনই খুব কমই ভারতের। একইভাবে ভারতে মহারাষ্ট্রের ভাগ্যে মোট জাতীয় আয়ের যে পরিমাণ জোটে, সমপরিমাণ আসামের ভাগ্যে জোটে না। আয় বণ্টনে এই অসমতা দারিদ্র্যের একটি অন্যতম প্রধান কারণ। এক সময় পৃথিবীর মোট আয়ের তীব্র অসম বণ্টনের ফলে যেমন কিছু কিছু দেশ উন্নত আর কিছু দেশ অনুন্নত হয়ে পড়েছিল, ঠিক তেমনই একটি দেশের বিভিন্ন অংশে আয় বণ্টনে বৈষম্যের ফলে প্রতিদিনই কিছু না কিছু মানুষ দারিদ্র্যের কবলে গিয়ে পড়ছে। অর্থনৈতিক বিকাশ সংক্রান্ত আলোচনায় আয় বৈষম্য তাই সর্বদাই একটি প্রাণবন্ত বিষয়। অর্থনীতিবিদরাও ফলত সর্বদাই বণ্টন-পরিমাপ এবং বিকাশ ও বৈষম্যের পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে আলোচনার আগ্রহ প্রকাশ করে থাকেন।

আয়ের বণ্টন বৈষম্যকে সাধারণত দু'ভাবে পরিমাপ করা হয়। একটি পরিমাণগত বণ্টন, অন্যটি কর্মগত বা বৃত্তিগত বণ্টন। পরিমাণগত বণ্টনের ক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তির আয়ের পরিমাণটুকুকেই বিবেচনা করা হয়। এই আয় কোত্থেকে এল তা বিবেচনা করা হয় না, দেখা হয় না আদৌ উৎপাদন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের ফলে এই অর্থ উপার্জিত হয়েছে কিনা সেটুকুও। অন্যদিকে কর্মগত বা বৃত্তিগত বণ্টনের ক্ষেত্রে কেবলমাত্র উৎপাদন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের দরুন উপার্জিত আয়কেই হিসেবের মধ্যে ধরা হয়। কোনটি আয় আর কোনটি আয় নয়, তা এইভাবে ঠিক করে নেওয়ার পরই বণ্টন-বৈষম্যের হিসাব নেওয়া হয়।

৮.৪ আয়ের পরিমাণগত বণ্টন (Size Distribution of Income)

আয়ের পরিমাণগত বণ্টন বলতে বোঝায় কোনো দেশের মোট জনসংখ্যার ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণির মধ্যে দেশটির মোট আয়ের বণ্টন। জনসংখ্যার এই শ্রেণিবিভাগ আবার করা হয় আয়ের পরিমাণের ভিত্তিতেই অর্থাৎ আয় যাদের খুব বেশি তারা উচ্চবিত্ত, আয় যাদের মোটামুটি বেশি তারা হয়তো উচ্চ মধ্যবিত্ত, যাদের আয় মাঝারি তারা মধ্যবিত্ত, আরেকটু কম আয় হলে নিম্ন মধ্যবিত্ত, অতঃপর নিম্নবিত্ত, এই রকম। তবে আয়ের ভিত্তিতে মোট জনসংখ্যাকে ঠিক ক'ভাগে ভাগ করা হবে তার কোনো নির্দিষ্ট নিয়ম নেই। পাঁচও হতে পারে, দশও হতে পারে। জনসংখ্যাকে আয়ের পরিমাণের ভিত্তিতে ভাগ করে ফেলার পর দেখা হয় মোট আয়ের শতকরা কত ভাগ কোন শ্রেণির হাতে গেছে। অন্যভাবে বলতে গেলে কোনো একটি নির্দিষ্ট শ্রেণিতে কতজন মানুষ আছে তার হিসাব নেওয়া হয়। উদাহরণস্বরূপ, কোনো দেশের উচ্চবিত্ত শ্রেণি হয়তো মোট আয়ের ২০ শতাংশ নিজের দখলে রেখেছে। এখন জনসংখ্যার ঠিক ২০ শতাংশ মানুষই যদি

ঐ শ্রেণিভুক্ত হয়, মানে জনসংখ্যার ২০ শতাংশ যদি আয়ের ২০ শতাংশ ভোগ করে তবে বলা যায় দেশটিতে আয়-বৈষম্য একেবারেই নেই। তবে বাস্তব চিত্রটা ঠিক এর উল্টো। একটি কাল্পনিক উদাহরণ, যে উদাহরণ বাস্তবের অনেকটা কাছাকাছি, তার সাহায্যে বিষয়টি বোঝার চেষ্টা করা যেতে পারে।

সারণি 5.1

ব্যক্তিগত আয়ের পরিমাণগত বণ্টন

ব্যক্তি	ব্যক্তিগত আয় (মোট আয়ের শতাংশ হিসাবে)	মোট আয়ে জনসংখ্যার কোন গ্রুপ বা দলের শতকরা অংশ
1	1.4	4.0
2	2.6	
3	3.7	9.0
4	5.3	
5	6.5	14.0
6	7.5	
7	9.3	21.0
8	11.7	
9	24.2	52.0
10	27.8	
মোট	100.0	100.0

কাল্পনিক এই উদাহরণে (সারণি ৫.১) প্রথম দুই ব্যক্তি, সবচেয়ে গরিব দুজন, মোট আয়ের মাত্র ৪ শতাংশ উপার্জন করে। আমাদের উদাহরণে মোট জনসংখ্যা যেহেতু দশ, সেহেতু বলা যায় জনসংখ্যার সবচেয়ে দরিদ্র ২০ শতাংশ মোট আয়ের ৪ শতাংশ পায়। উদাহরণটিতে আরও দেখা যাচ্ছে জনসংখ্যার সবচেয়ে ধনী ২০ শতাংশ মোট আয়ের ৫২ শতাংশ দখল করে নিচ্ছে। অর্থাৎ জনসংখ্যার আয়গত শ্রেণিবিভাগ এবং মোট আয়ে সেই সব শ্রেণির ভাগের হিসাব থেকে কোনো দেশে আয়-বৈষম্যের মাত্রাটি কেমন তা জানা যায়। আমাদের কাল্পনিক দেশটিতে আয়-বৈষম্যের মাত্রাটি ভয়ঙ্কর।

এই আলোচনা প্রসঙ্গে একটি অনুপাতের কথা প্রায়ই বলা হয়। অনুপাতটি কুজনেৎস্ অনুপাত হিসেবেই পরিচিত। কুজনেৎস্ অনুপাতটি জনসংখ্যার সবচেয়ে ধনী ২০ শতাংশ ও সবচেয়ে দরিদ্র ২০ শতাংশের আয়ের একটি অনুপাত। যে দেশে আয়-বৈষম্যের মাত্রা যত বেশি, সে দেশে কুজনেৎস্ অনুপাতের মান তত বেশি।

৮.৫ লোরেঞ্জ রেখা (Lorenz Curve)

লোরেঞ্জ রেখার সাহায্যে কোনো দেশের আয়-বৈষম্যের পরিমাপ করা হয়। লেখচিত্রটি একটি বর্গাকৃতি ক্ষেত্রে আবদ্ধ। এই বর্গক্ষেত্রের যেটি কর্ণ সেটিকে বলা হয় সমতা রেখা। এই রেখা থেকে বিচ্যুতিই হল অসমতা, বৈষম্য। এই বিচ্যুতিরই পরিমাপ করা হয় লোরেঞ্জ রেখার সাহায্যে।

কোনো দেশের আয় বৈষম্যকে লোরেঞ্জ রেখার সাহায্যে প্রকাশ করার জন্য আয়ের পরিমাণগত বণ্টনের ধারণাটির সাহায্য নেওয়া হয়। যে বর্গাকার ক্ষেত্রের মধ্যে এই রেখাটি আঁকা হয় তার উল্লম্ব অক্ষ বরাবর পরিমাপ করা হয় জনসংখ্যার কোন শ্রেণি আয়ের শতকরা কত অংশ পায় তার হিসাব। অন্যদিকে অনুভূমিক অক্ষ বরাবর পরিমাপ করা হয় জনসংখ্যার শতকরা অংশের হিসাবটি। অর্থাৎ বর্গাকার ক্ষেত্রের প্রতিটি বিন্দু থেকে জানা যায় জনসংখ্যার শতকরা কত অংশ আয়ের শতকরা কত অংশ পায়, সেই হিসেব। এখানে একটা কথা মনে রাখা দরকার, জনসংখ্যার শতকরা অংশের হিসাবটি, অনুভূমিক অক্ষ বরাবর যেটি পরিমাপ করা হচ্ছে, মূল বিন্দু থেকে যত এগোনো যায় ততই সেই হিসাবটির মান বাড়বে। একই নিয়ম প্রযোজ্য আয়ের শতকরা অংশের হিসাবটির ক্ষেত্রেও। যে লোরেঞ্জ রেখাটি এখানে আঁকা হয়েছে তার ঙ বিন্দুর প্রদত্ত তথ্যানুযায়ী সংশ্লিষ্ট দেশটির সবচেয়ে দরিদ্র ২০ শতাংশ মানুষ মোট আয়ের ৪ শতাংশ পায়। লোরেঞ্জ রেখা আঁকার সময় দুই অক্ষ বরাবর আয় এবং জনসংখ্যা, এই দুটি চলরাশিরই শতকরা হিসেবে পরিমাপ করা হয়। শতকরা হিসেবের ক্ষেত্রে পূর্ণমাত্রা যেহেতু ১০০, সেহেতু এক্ষেত্রে দুটি অক্ষেরই দৈর্ঘ্য সমান হবে। এই কারণেই যে চতুর্ভুজাকার ক্ষেত্রে রেখাটি আঁকা হয় তা বর্গাকার।*

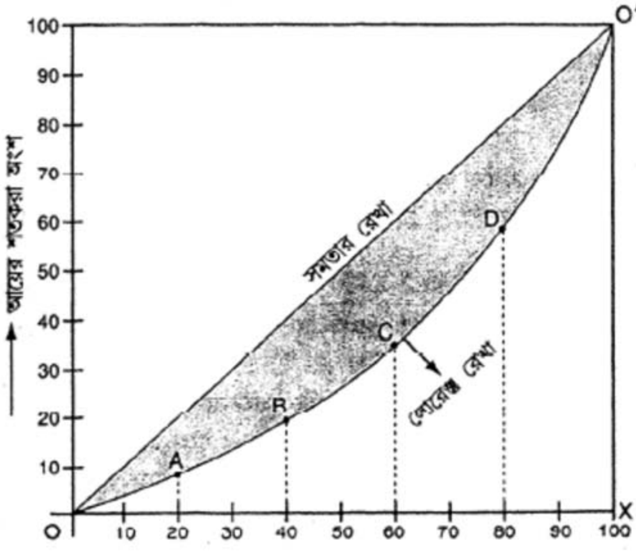

চিত্র : 5.1

সারণি ৮.১.-এ আয় বৈষম্যের যে কাল্পনিক উদাহরণটি দেখানো হয়েছে তারই চিত্ররূপ ৫.১ নং ছবির লোরেঞ্জ রেখা। এই লোরেঞ্জ রেখা OABCDO’-এর A বিন্দু থেকে জানা যাচ্ছে জনসংখ্যার সবচেয়ে দরিদ্র ২০ শতাংশ উপার্জন করছে মোট আয়ের ৪ শতাংশ, ঙ্ক বিন্দু থেকে জানা যাচ্ছে জনসংখ্যার সবচেয়ে দরিদ্র ৪০ শতাংশ উপার্জন করছে মোট আয়ের ১৩ শতাংশ ইত্যাদি। সুতরাং এই লোরেঞ্জ রেখা অনুযায়ী দেশটিতে আয় বৈষম্য চরম মাত্রায় আছে। এই বৈষম্য যত কমে আসবে লোরেঞ্জ রেখাটি তত ০০’ রেখাটির কাছে সরে আসবে এবং বৈষম্য যদি পুরোপুরি অদৃশ্য হয় তাহলে লোরেঞ্জ রেখাটি OO’ রেখাটির সঙ্গে মিশে যাবে। লোরেঞ্জ রেখাটি OO’ রেখার সঙ্গে পুরোপুরি মিশে যাবার অর্থ জনসংখ্যার, উদাহরণস্বরূপ, ১০ শতাংশ মানুষ মোট আয়ের ঠিক ১০ শতাংশই ভোগ করছে। এই কারণেই ঞ্জঞ্জ’ রেখাটিকে সমতা রেখা বলা হয়। লোরেঞ্জ রেখাটি যত এই সমতা রেখা থেকে সরে যাবে তত বাড়বে বৈষম্য। কোনো দেশে যদি এমন হয় যে দেশের জাতীয় আয়ের সবটাই পাচ্ছে একটিমাত্র মানুষ, বাকিরা কিছুই পাচ্ছে না, তাহলে তার অর্থ দেশটিতে চরম আয়-বৈষম্য আছে। এমন হলে লোরেঞ্জ রেখাটি নীচের অনুভূমিক অক্ষ এবং ডানদিকের উল্লম্ব অক্ষের সঙ্গে মিশে যাবে।

৮ .৬ গিনি সহগ (Gini Coefficient)

লোরেঞ্জ রেখার সাহায্যে আয়-বৈষম্য পরিমাপের আরেকটি মাপকাঠিতে উপনীত হওয়া যায়। ইতালিয়ান পরিসংখ্যানবিদ সি. গিনি-র নামানুসারে এই মাপকাঠিটির নামকরণ করা হয়েছে গিনি সহগ। লোরেঞ্জ রেখা ও সমতা রেখার মধ্যবর্তী ক্ষেত্র এবং সমতা রেখার ডানদিকের পুরো জায়গাটির অনুপাতটিকেই গিনি সহগ (ঝ) বলে অর্থাৎ

G = OABCDO’ক্ষেত্রের আয়তন / OXO’ ক্ষেত্রের আয়তন

কোনো দেশের আয়-বৈষম্যের মাত্রা যত বাড়ে সমতা রেখা ও লোরেঞ্জ রেখার মধ্যবর্তী জায়গাটুকুর আয়তন (OABCDO’) তত বাড়ে। ফলত আয় বৈষম্যের মাত্রা যত বাড়ে গিনি সহগের মান তত বাড়ে। গিনি সহগের মান শূন্য থেকে অসীম পর্যন্ত যে কোনো কিছুই হতে পারে। দেশটিতে একেবারেই কোনো আয় বৈষম্য না থাকলে গিনি সহগের মান শূন্য এবং আয় বৈষম্য চরম মাত্রার হলে গিনি সহগের মান অসীম হবে। তবে সাধারণত এই সহগটির মানটিকে ০.৭ (যেখানে মোটামুটি ভালো মাত্রার বৈষম্য আছে) থেকে ০.২ (যেখানে মোটামুটি সমতা বজায় আছে)-এর মধ্যেই থাকতে দেখা যায়।

৮.৭ আয়ের কর্মগত বা বৃত্তিগত বণ্টন (Functional Distribution of Income)

আয়ের বৃত্তিগত বণ্টন বলতে বোঝায় বিভিন্ন ব্যক্তি উৎপাদন প্রক্রিয়ায় যে ভূমিকা পালন করে সেই ভূমিকা অনুযায়ীই তাকে আয়ের ভাগ দেওয়া। উৎপাদনের উপাদান হিসাবে একজন ব্যক্তি নিজে কতটা আয়

করছে সেটি নয়, এখানে গুরুত্ব দেওয়া হয় একটি বিশেষ উৎপাদনী উপাদান সামগ্রিকভাবে কতটা আয় করছে সেটির উপরেই। দেখা হয় মোট জাতীয় আয়ে ঐ উপাদানটির অবদান কত। যেমন, মোট জাতীয় আয়ের শতকরা কতটা শ্রমিক শ্রেণির উপার্জন, কত শতাংশ পুঁজিপতি শ্রেণির অবদান প্রভৃতি। অর্থাৎ আয়ের বৃত্তিগত বণ্টনের সাহায্যে আমরা আসলে বিভিন্ন শ্রেণির মধ্যে আয়ের বণ্টনের বৈষম্যকে পরিমাপ করি, বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে আয়ের বণ্টন বৈষম্যকে নয়।

যে কোনো দেশেই সাধারণত দেখা যায় মোট জাতীয় আয়ের গরিষ্ঠাংশ যায় পুঁজিপতি শ্রেণির ভাগে, তুলনায় স্বল্পতর অংশ পায় শ্রমিক শ্রেণি। কিন্তু আয়ের অসমান বণ্টনের সমাপ্তি কেবলমাত্র এখানেই নয়। পুঁজিপতি শ্রেণির মধ্যে সবাই যেমন সমহারে মুনাফা অর্জন করে না, তেমনি শ্রমিক শ্রেণির মধ্যেও সবাই সমান মজুরি পায় না। কিন্তু এই আন্তঃশ্রেণি বণ্টন বৈষম্যের হিসাব আয়ের বৃত্তিগত বণ্টনের সাহায্যে করা যায় না। অথচ কোনো একটি শ্রেণির বিভিন্ন মানুষের মধ্যে আয় বণ্টনের বৈষম্যও কিন্তু অর্থনীতির আলোচনায় কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। আয় বৈষম্য পরিমাপে তাই আয়ের বৃত্তিগত বণ্টনের বিশেষ ব্যবহার নেই।

৮.৮ উন্নয়ন ও বৈষম্য কুজনেৎসের প্রকল্প (Development and Inequality-Kuznet's Hypothesis)

মাথাপিছু আয়ের অঙ্কেই সাধারণত উন্নয়নের পরিমাপ করা হয়। মাথাপিছু আয় বাড়লে যেমন অর্থনীতির উন্নয়ন ঘটছে ধরে নেওয়া হয় তেমনি উন্নয়নের মাত্রা কমলে মাথাপিছু আয় কমে। অর্থশাস্ত্রবিদ সাইমন কুজনেৎসের মতে, মাথাপিছু আয় পরিবর্তনের সঙ্গে আয় বৈষম্যেরও একটি সম্পর্ক আছে। মাথাপিছু আয় বাড়লে প্রথম দিকে বৈষম্য বাড়ে, তারপর কিন্তু তা কমতে থাকে। অর্থাৎ অর্থনৈতিক বিকাশের প্রাথমিক পর্বে আয় বৈষম্য বাড়ে। সমতা আসে বিকাশের একটি নির্দিষ্ট মাত্রা অর্জনের পর।

১৯৫৫ সালে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও বৈষম্যের সম্পর্কটি অনুধাবনের জন্য একটি সমীক্ষার কাজ করেছিলেন কুজনেৎস্। এই গবেষণায় মাথাপিছু মোট জাতীয় আয়কে অর্থনৈতিক উন্নয়নের এবং সবচেয়ে ধনী ২০ শতাংশ মানুষ ও সবচেয়ে গরিব ২০ শতাংশ মানুষের আয়ের অনুপাতকে আয় বৈষম্যের মাপকাঠি হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছিল। আসলে বিকাশ ও বৈষম্যের সম্পর্কটি সবচেয়ে ভালোভাবে বোঝা যায় যদি এই দুই মাপকাঠি সংক্রান্ত পরিসংখ্যানগুলি একেকটি দেশের ক্ষেত্রে পরপর কয়েক বছর ধরে পাওয়া যায়। কিন্তু মাথাপিছু মোট জাতীয় আয়ের হিসাবটি এভাবে পাওয়া গেলেও দ্বিতীয়টি পাওয়া যায় না। অধ্যাপক কুজনেৎস্ তাই বিভিন্ন দেশের এক বছরের হিসেব থেকেই এ ব্যাপারে একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছোবার চেষ্টা করেছিলেন। এর জন্য তিনি বেছে নিয়েছিলেন তিনটি বিকাশশীল (ভারত, শ্রীলঙ্কা ও পুয়ের্তো রিকো) এবং দুটি উন্নত দেশ (আমেরিকা ও ব্রিটেন)। অর্থাৎ তিনি Time (eries data বা কালানুসারী তথ্যের অভাবের দরুন তার পরিবর্তে Cross Section data বা একই সময়কালের বিভিন্ন শ্রেণির দেশের আয় বণ্টন ও বৈষম্য সংক্রান্ত তথ্য ব্যবহার করেছেন। এই দেশগুলির আয় বণ্টনের শতকরা হিসাব এবং তাদের অনুপাত সংক্রান্ত পরিসংখ্যানগুলি নং সারণিতে দেখানো হয়েছে। এই সারণির তথ্যগুলি থেকে দেখা যাচ্ছে আয়

বণ্টনে বৈষম্যের মাত্রাটি সাধারণভাবে উন্নত দেশগুলির চেয়ে বিকাশশীল দেশগুলিতে বেশি। এই বিষয়টি লক্ষ করেই কুজনেৎস্ বলেছিলেন, কোনো অর্থনীতির বিকাশ প্রক্রিয়ার প্রথম দিকে বণ্টন বৈষম্য বাড়ে এবং পরে উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তা কমতে থাকে।*

সারণি 5.2

দেশ	মোট আয়ে শতকরা অংশের হিসাব		2 নং সাপেক্ষে
	সবচেয়ে ধনী 20 শতাংশ	সবচেয়ে গরিব 60 শতাংশ	3 নং পর্যায়ের অনুপাত
(1)	(2)	(3)	(4)
শ্রীলংকা (1950)	30	50	1.67
ভারত (1949-50)	28	55	1.96
পুয়ের্তো রিকো (1948)	24	56	2.33
আমেরিকা (1950)	34	44	1.33
ব্রিটেন (1947)	36	45	1.25

কুজনেৎসের এই প্রকল্পটিকে লেখচিত্রের সাহায্যে প্রকাশ করলে আমরা একটি রেখাচিত্র পাব যা উল্টানো ডড আকৃতির।

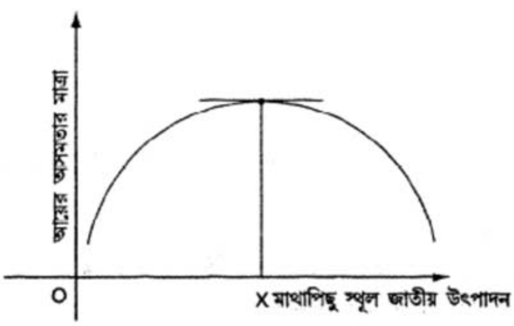

চিত্র : 5.2

যে ৮.২. নম্বর লেখচিত্রে আমরা এই রেখাটি এঁকেছি তার অনুভূমিক অক্ষ বরাবর মাথাপিছু আয় এবং উল্লম্ব অক্ষ বরাবর আয় বণ্টনে অসমতার মাত্রাটি পরিমাপ করা হয়েছে। ছবি থেকে দেখা যাচ্ছে ড় বিন্দু পর্যন্ত মাথাপিছু আয় যত বেড়েছে, বৈষম্যের মাত্রাও তত বেড়েছে, এবং তারপর মাথাপিছু আয় বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বৈষম্যের মাত্রা কমেছে। এর অর্থ কোনো দেশের মাথাপিছু আয় যতক্ষণ না একটি নির্দিষ্ট স্তর (এখানে ড়) পর্যন্ত পৌঁছোচ্ছে ততক্ষণ জাতীয় আয় বৃদ্ধির সুফলটি যাবে দেশের বিত্তশালী সম্প্রদায়ের হাতে; জাতীয় আয় বাড়বে, মাথাপিছু আয় বাড়বে, আয় বৈষম্যও বাড়বে। মাথাপিছু আয় ঐ নির্দিষ্ট স্তরটি অতিক্রম করার

অর্থ দেশটিতে অর্থনৈতিক বিকাশের মাত্রা একটি মোটামুটি স্তরে পৌঁছেছে; শিক্ষার হার বেড়েছে, সচেতনতা বেড়েছে, বিত্তশালী সম্প্রদায় আর আয়ের গরিষ্ঠাংশ নিজের দখলে রাখতে পারছে না। মাথাপিছু আয় একটি নির্দিষ্ট স্তর অতিক্রম করার পর তাই আয় বাড়লে বৈষম্য কমে আসে।

আয়-বৈষম্য রেখাটির আকৃতি কেন এমন উল্টানো । আকৃতির হল সে ব্যাপারে অবশ্য কুজেনৎস্ নিজে তেমন কোনো স্পষ্ট বা বিশদ ব্যাখ্যা দেননি। পরবর্তীকালে মন্টেক সিং আলুওয়ালিয়া এর কয়েকটি সম্ভাব্য ব্যাখ্যা উপস্থাপিত করেন। ১৯৭৬ সালে আলুওয়ালিয়া নিজেও অর্থনীতির বিকাশের স্তর এবং আয়-বৈষম্যের মাত্রার সম্পর্কটি নিরূপণের জন্য একটি সমীক্ষা করেছিলেন। সমীক্ষা থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে কুজনেৎসের মতো একই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন তিনি। এই প্রসঙ্গেই আয়-বৈষম্য রেখার উল্টানো ঙড আকৃতির কয়েকটি সম্ভাব্য ব্যাখ্যা দেন আলুওয়ালিয়া।*

প্রথমত, তাঁর মতে অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রথম পর্বে কৃষিক্ষেত্র থেকে কৃষি-বহির্ভূত ক্ষেত্রে শ্রমের স্থানান্তর ঘটে। মজুরি পার্থক্যই এই স্থানান্তরের কারণ। এর ফলে অর্থনীতির দুটি ক্ষেত্রের মধ্যে আয়ের বৈষম্য দেখা দেয় এবং তা প্রথমদিকে বাড়তে থাকে। এরপর কালক্রমে, চাহিদা-জোগানের ঘাত-প্রতিঘাতে এক সময় দুই ক্ষেত্রের মধ্যে মজুরি পার্থক্য প্রশমিত হয়ে আসে। আয় বৈষম্য তাই অর্থনৈতিক বিকাশের প্রাথমিক পর্বের ঘটনা, উত্তর পর্বের নয়।

দ্বিতীয়ত, অর্থনৈতিক উন্নয়নের গোড়ার দিকে শিক্ষিত, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শ্রমিকের জোগান বাড়ে। ফলে প্রশিক্ষিত এবং প্রশিক্ষণ-বহির্ভূত শ্রমিকের মধ্যে মজুরি-পার্থক্য বাড়তে থাকে। তারপর অর্থনীতিটি যত উন্নত হতে থাকে প্রশিক্ষিত শ্রমিকের জোগানও তত বাড়তে থাকে। ফলে পুনরায় আস্তে আস্তে কমে যেতে থাকে প্রাথমিক পর্বের এই মজুরি-পার্থক্য। মাথাপিছু আয় বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আয়-বৈষম্য প্রথমে বাড়ার এবং পরে কমার এটি একটি প্রধান কারণ।

এ সমস্ত আলোচনার ভিত্তিতে উন্নয়নের প্রথম দিকে কেন আয় বৈষম্য বাড়ে তার কয়েকটি ব্যাখ্যা আমরা দিতে পারি। প্রথমত, উন্নয়ন প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার সময় নানা কাঠামোগত পরিবর্তন অর্থনীতিতে ঘটতে থাকে। এসব পরিবর্তনের ফলে শিল্পক্ষেত্রের উৎপাদন কৃষিক্ষেত্র অপেক্ষা বেশি হারে বাড়ে। ফলে ক্ষেত্রগত বৈষম্য বাড়তে থাকে। দ্বিতীয়ত, শিল্পক্ষেত্র মূলধন-নিবিড় কৌশল ব্যবহার করে। দক্ষ ও শিক্ষিত শ্রমিক নিয়োগ করে। এদের উৎপাদনশীলতা ও আয় বেশি। ফলে আয় বৈষম্য বাড়ে। তৃতীয়ত, উন্নয়নের প্রথম দিকে গ্রাম থেকে শহরে চলে আসা লোক তেমন ভালোমানের কাজ পায় না। মুটে, জোগাড়ে, কেবিন বয় প্রকৃতির কাজ করে। কিন্তু কিছু জমিদার তাদের টাকা শহরের জমিতে খাটায়। তাদের আয় দ্রুত হারে বাড়ে। এভাবে আয় বৈষম্য বাড়ে। চতুর্থত, উন্নয়নের প্রথম দিকে জনসংখ্যা দ্রুত হারে বাড়ে। এটিও আয় বৈষম্য তৈরি করে। পঞ্চমত, উন্নয়নের প্রাথমিক স্তরে আয় খুব দ্রুত হারে বাড়ে। এর ফলেও আয় বৈষম্য বৃদ্ধি পায়। ষষ্ঠত, আর্থিক সম্পদ বণ্টনেও সরকারের শহরাঞ্চলের প্রতি পক্ষপাতিত্ব থাকে। এটিও আয় বৈষম্য বাড়ায়।

উন্নয়নের পরবর্তী স্তরে কেন আয় বৈষম্য কমে, তার দুটি কারণ উল্লেখ করেছেন কুজনেৎস্। প্রথমত,

মাথাপিছু আয় উচ্চস্তরে পৌঁছে গেলে তারপর তা বৃদ্ধির হার নানা কারণে কমতে থাকে। দ্বিতীয়ত, দেশটি যথেষ্ট উন্নত হয়ে যাবার পর সরকার কর, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সামাজিক নিরাপত্তা ইত্যাদি বিষয়ে নানা আইন প্রণয়ন করে। এর ফলেও আয় বৈষম্য কমে।

এর সঙ্গে আমরা আরও কয়েকটি বিষয় যোগ করতে পারি। তৃতীয়ত, উন্নয়নের উচ্চস্তরে কৃষিভিত্তিক পণ্য ও গ্রামের হস্তশিল্পজাত পণ্যের চাহিদা বাড়ে। এ ফলে গ্রাম ও শহরের আয় বৈষম্য কিছুটা কমে। চতুর্থত, উন্নয়ন গতি প্রাপ্ত হলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমে। ফলে আয় বৈষম্য বৃদ্ধি বাধাপ্রাপ্ত হয়। পঞ্চমত, উন্নয়নের উচ্চস্তরে শিল্পক্ষেত্রে বা বিদেশে নিযুক্ত ব্যক্তিরা তাদের আত্মীয়স্বজন ও নির্ভরশীলদের জন্য অর্থপ্রেরণ করে। এর ফলেও আয় বৈষম্য কমে।

কুজনেৎস্-এর উল্টানো ডড প্রকল্পকে সমর্থন করেছেন বিভিন্ন অর্থনীতিবিদ, যেমন মরিস, ক্রেভিস এবং আলুওয়ালিয়া। তাঁরা তাঁদের সমীক্ষাতেও অনুরূপ ফল পেয়েছেন। অবশ্য টোডারো মনে করেন যে, কুজনেৎস্-এর (ample size খুব ক্ষুদ্র। তাছাড়া, Time Series সংক্রান্ত বিষয়ের ক্ষেত্রে Cross section তথ্য ব্যবহার করা অনুচিত বলে তিনি মনে করেন। Anand এবং Kanbur-ও একই মত পোষণ করেন। তবে মোটের ওপর অর্থনীতিবিদেরা উল্টানো U প্রকল্পকে সমর্থন করেছেন অর্থাৎ উন্নয়নের প্রথমে আয় বৈষম্য বাড়ে কিন্তু পরে তা কমে।

৮.৯ লিঙ্গ বৈষম্য (Gender Discrimination)

অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্বন্ধে মানুষের ধ্যানধারণাগুলি সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আস্তে আস্তে বদলে যাচ্ছে। প্রাথমিকভাবে মনে করা হত কোনো দেশের জাতীয় আয় (বা মাথাপিছু জাতীয় আয়)-এর বৃদ্ধিই সে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সূচক। বিশ্বাস করা হত জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি ঘটলেই তার ফলে আপনাআপনি বাড়বে জীবনযাত্রার মান। কিন্তু বাস্তবিক তা হয় না। না হওয়ার কারণ আছে। প্রথমত, আয় বাড়লেই সব অভাব, দুঃখ মিটে যাবে এমনটি ভাবার কোনো কারণ নেই। উদাহরণস্বরূপ, যে গ্রামে কোনো স্বাস্থ্যকেন্দ্র নেই সে গ্রামের মানুষের আয় যতই বেশি হোক না কেন, প্রাথমিক চিকিৎসার সুযোগটুকু থেকে তারা বঞ্চিতই থাকবে। নিছক জাতীয় আয়ের হিসাব থেকে এই বঞ্চনার হিসাব সম্ভব নয়। দ্বিতীয়ত, জাতীয় আয় বাড়লেই যে দেশের সব মানুষের হাতে সেই আয়ের ভাগ গিয়ে পৌঁছোবে তারও কোনো কারণ নেই। কারণ আয় বণ্টনে বৈষম্য অল্পবিস্তর সমস্ত দেশেই আছে। এই সব কারণেই অর্থনৈতিক বিকাশের বিকল্প সূচক হিসেবে একদল অর্থনীতিবিদ মানব উন্নয়নের কথা বলতে থাকেন। অবশেষে ১৯৯০ সালে প্রথম রাষ্ট্রপুঞ্জ প্রতি বছর মানব উন্নয়নের যে প্রতিবেদন প্রকাশ করে তাতে উন্নয়নের সূচক হিসেবে জাতীয় আয়ের পরিবর্তে মানব উন্নয়নকেই স্বীকৃতি দেয়। কিন্তু তারপরেও উন্নয়নের আরও সঠিক, আরও উপযুক্ত সূচক সন্ধানের কাজ বন্ধ হয়নি। মানব উন্নয়ন সূচক সম্বন্ধে যে কথাটি বলা হতে থাকে তা এই যে এই সূচকে লিঙ্গ বৈষম্যের অস্তিত্বকে অস্বীকার করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, মানব উন্নয়ন সূচকটি তৈরির সময় কোনো দেশ শিক্ষায় কতটা উন্নতি করেছে তা বোঝার জন্য স্কুলে নাম নথিভুক্তকরণের হিসাবটি নেওয়া হয়। এক্ষেত্রে কিন্তু এই হিসেব নারী ও পুরুষের জন্য আলাদা আলাদা করে নেওয়া হয় না। ফলে দেশটিতে লিঙ্গ বৈষম্যের ক্ষেত্রে কোনো উন্নতি

হল কিনা তা বোঝা মানব উন্নয়ন সূচক থেকে সম্ভবপর হয় না। অথচ লিঙ্গ বৈষম্য এমন একটি বিষয় যাকে উপেক্ষা করলে কোনো দেশের উন্নয়নের সঠিক ছবিটি পাওয়া সম্ভবপর হয় না। এই কারণেই ১৯৯৫ সাল থেকে মানব উন্নয়ন সূচকটির পাশাপাশি রাষ্ট্রপুঞ্জ লিঙ্গ সংক্রান্ত উন্নয়ন সূচক, এই নামে লিঙ্গ বৈষম্য পরিমাপের একটি সূচক তৈরি করেছে।

৮.১০ নারী ও উন্নয়ন (Woman and Development)

অর্থনীতির উন্নয়নে নারীর ভূমিকা ও তার অবস্থান সংক্রান্ত আলোচনা ও বিতর্কগুলি জমে উঠতে শুরু করে ১৯৭০ ও ১৯৮০-এর দশক থেকে। পরে, ১৯৯৫ সালে বেজিংয়ে রাষ্ট্রসংঘের চতুর্থ ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স অফ উইমেন এবং ঐ বছরেই কোপেনহেগেনে রাষ্ট্রসংঘের সামাজিক শীর্ষ সম্মেলনের (UN's Social Conference) মধ্য দিয়ে এই সব বিষয়গুলি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে চলে আসে। ১৯৯৫ সাল থেকেই রাষ্ট্রসংঘের উন্নয়ন কার্যালয় শুরু করে লিঙ্গ সংক্রান্ত উন্নয়ন সূচকের প্রকাশও।

নারী ও উন্নয়নের পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে আলোচনার পিছনে আছে এই ধারণা যে সারা পৃথিবী জুড়ে মেয়েরা বিভিন্ন দিক দিয়ে বঞ্চিত এবং এই বঞ্চনাই অর্থনীতির সুষ্ঠু বিকাশের পথে এক ধরনের প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করছে। উনিশশো আশির দশকে নারীদের এই বঞ্চনা সংক্রান্ত একটি তথ্যভাণ্ডারও রাষ্ট্রসংঘ তৈরি করে। তথ্যভাণ্ডারে প্রয়োজনীয় তথ্যাদির জোগান দিয়েছিল বিভিন্ন সদস্য দেশের সরকার। ১৯৭০ ও ১৯৮০-র দশকের পরিসংখ্যান নিয়ে তৈরি এই ভাণ্ডারে মেয়েদের জীবনের বিভিন্ন দিকের উপর তথ্য সন্নিবেশ করা হয়েছিল। এই তথ্যভাণ্ডার থেকেই পরিষ্কার যে, ১৯৭০ ও ১৯৮০-র দশকে সারা বিশ্ব জুড়ে মেয়েরা কাজের জগতে এগিয়ে এসেছে অধিক সংখ্যায়, তাদের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটেছে আগের চেয়ে বেশি। পরিসংখ্যানগুলি আমাদের আরও জানিয়েছিল যে পৃথিবীর সর্বত্র, দেশ, মহাদেশ, সমাজ নির্বিশেষে মেয়েরা আস্তে আস্তে তাদের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও আইনি অধিকারগুলি সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠছে।

রাষ্ট্রসংঘের পাশাপাশি বিশ্বব্যাঙ্কও এ বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ ও তা প্রকাশের ব্যাপারে উদ্যোগ নিয়েছিল। ১৯৮৮ সালের বিশ্ব উন্নয়ন প্রতিবেদনে (World Development Report) একটি সারণি প্রকাশ করা হয়, যে সারণির শিরোনাম ছিল 'উইমেন ইন ডেভেলপমেন্ট'। এই সারণিটি তৈরি করা হয়েছিল মোট ১২৯টি দেশ থেকে পরিসংখ্যান নিয়ে, যার মধ্যে ১০১টি বিকাশশীল দেশ, ১৯টি শিল্পপ্রধান বাজার অর্থনীতি এবং বাকি ৭টি অন্যান্য দেশ। এই ১০১টি বিকাশশীল দেশের মধ্যে আবার ৩৯টি স্বল্প আয়ের, ৩৪টি মাঝারি আয়ের, ১৯টি উচ্চ-মাঝারি আয়ের এবং ৭টি উচ্চ আয়ের গোষ্ঠীভুক্ত। এই সারণির মধ্যে যে সমস্ত পরিসংখ্যান ছিল সেগুলি হল (১) যে কোনো বয়সগোষ্ঠীতে প্রতি ১০০ পুরুষ পিছু নারীর সংখ্যা ও ০-৪ এই বয়সগোষ্ঠীতে প্রতি ১০০ পুরুষ পিছু নারীর সংখ্যার অনুপাত, (২) পুরুষ ও নারীর প্রত্যাশিত আয়ুষ্কাল, (৩) জন্মের সময় স্বাস্থ্যকর্মীর উপস্থিতি, (৪) শিশুমৃত্যুর হার, (৫) প্রসূতি মৃত্যুর হার, (৬) প্রাথমিক শিক্ষায় মেয়েদের ভর্তির সংখ্যা ও (৭) মাধ্যমিক শিক্ষায় মেয়েদের ভর্তির সংখ্যা। ১৯৮৮ সালে বিশ্বব্যাঙ্কের এই উদ্যোগের পর

১৯৯১ সালে রাষ্ট্রসংঘ তাদের পরিসংখ্যানগুলিকে পরিমার্জিত করে 'দ্য ওয়ার্ল্ডস্ উইমেন ট্রেন্ডস্ অ্যান্ড স্ট্যাটিস্টিকস্' নামে আবার একটি প্রকাশনা বের করে। এই প্রকাশনায় তাদের তরফে দুটি নতুন বিষয়ের উপর আলোকপাত করা হয়। একটি হল মেয়েদের প্রত্যাশিত আয়ুষ্কাল এবং অন্যটি রাজনৈতিক ক্রিয়াকাণ্ডে মেয়েদের অংশগ্রহণ সম্পর্কিত তথ্য।

পরবর্তীকালে লিঙ্গ বৈষম্য, অর্থনীতির সামগ্রিক উন্নয়নের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কীভাবে কমেছে, অর্থনীতির উন্নয়ন প্রক্রিয়াটিকে এই বৈষম্য কতটা প্রতিহত করেছে, অর্থনীতির উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় মেয়েরা কী ভূমিকা পালন করেছে-এই ধরনের সব আলোচনায় রাষ্ট্রসংঘ বা বিশ্বব্যাঙ্ক সংগৃহীত পরিসংখ্যানগুলি প্রভূত সাহায্য করেছে।

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, লিঙ্গ বৈষম্য বা অর্থনীতির বিকাশে তার কী ভূমিকা এই সংক্রান্ত আলোচনাগুলি জরুরি হয়ে উঠল কোন্ পরিপ্রেক্ষিতে? এই প্রশ্নের উত্তর লুকিয়ে আছে এই তথ্যের মধ্যে যে এই বিশ্বের মোট জনসংখ্যার অর্ধেকেরও বেশি নারী এবং পৃথিবীতে মোট যে কাজ হয় তার দুই-তৃতীয়াংশ করে নারীরাই। তার পরিবর্তে কী পায় মেয়েরা? মোট কাজের দুই-তৃতীয়াংশ উপার্জন করে মোট আয়ের মোটামুটি এক-দশমাংশ। বঞ্চনার এখানেই শেষ নয়। সারা পৃথিবী জুড়েই মেয়েদের যে কেবল শিক্ষা কম, ক্ষমতা কম, হাতে অর্থ কম, পদ মর্যাদা কম তাই-ই নয়, তাদের মধ্যে আত্মমর্যাদাবোধেরও অভাব খুব বেশি। কিন্তু তা সত্ত্বেও এইরকম বঞ্চনাকে উপেক্ষা করে অর্থনৈতিক উন্নয়নের পরিমাপ সম্ভব হত না যদি অর্থনৈতিক উন্নয়নকে নিছক মাথাপিছু জাতীয় আয়ের অঙ্কে পরিমাপ করা হত। যেদিন থেকে অর্থনৈতিক উন্নয়নকে মানব উন্নয়ন হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া শুরু হয়েছে সেদিন থেকে লিঙ্গ বৈষম্যের আলোচনাও অর্থনৈতিক উন্নয়নের আলোচনার মধ্যে নিজের জায়গা করে নিয়েছে।

৮.১১ নারীর উন্নয়নের পরিমাপ (Measure of Women Development)

১৯৯০ সালে ইউ. এন. ডি. পি. কোনো দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের মাপকাঠি হিসেবে মানব উন্নয়ন সূচকটির প্রবর্তন করেছিল। এই সূচকটি প্রবর্তনের অর্থ অর্থনৈতিক উন্নয়ন যে আসলে মানুষের উন্নয়ন, সেই ভাবনাকে স্বীকৃতি দেওয়া। আর মানুষের উন্নয়নকে এই স্বীকৃতি দেবার সঙ্গে সঙ্গে একদল অর্থশাস্ত্রবিদ্ধ্বে বলতে শুরু করেন যে, উন্নয়ন তত্ত্বের এই ধরনের আলোচনা লিঙ্গ বৈষম্যের আলোচনাকে অন্তর্ভুক্ত না করা পর্যন্ত কখনই সম্পূর্ণ হতে পারে না। তাঁদের এই বক্তব্যকে সমর্থন জানিয়েই ১৯৯৫ সালের মানব উন্নয়ন প্রতিবেদনে লিঙ্গ বৈষম্যকে পরিমাপ করার জন্য দুটি নতুন সূচকের প্রবর্তন ঘটানো হয়। একটি লিঙ্গভিত্তিক উন্নয়ন সূচক (Gender related Development Index îy GDI) এবং অন্যটি লিঙ্গভিত্তিক ক্ষমতায়নের পরিমাপ (Gender Empowerment Measure বা GEM)।

৮.১২ সারাংশ

আয় বণ্টনের অসমতা অনুন্নতির একটি প্রধান কারণ। পৃথিবীর মোট আয়ের তীব্র অসম বণ্টনের ফলে

যেমন কিছু কিছু দেশ উন্নত আর কিছু দেশ অনুন্নত হয়ে পড়েছিল, ঠিক তেমনই একটি দেশের বিভিন্ন অংশে আয় বণ্টনের বৈষম্যের ফলে প্রতিদিন বেশ কিছু লোক দারিদ্র্যের রেখার তলায় চলে যাচ্ছে। আয়ের বণ্টন বৈষম্য দুভাবে পরিমাপ করা যায়। একটি পরিমাণগত বণ্টন অন্যটি কর্মগত বণ্টন। লোরেঞ্জ রেখার সাহায্যে কোনো দেশের আয় বৈষম্যের পরিমাপ করা হয়। লেখচিত্রটি একটি বর্গাকৃতি ক্ষেত্রে আবদ্ধ। এই বর্গক্ষেত্রের যেটি কর্ণ সেটিকে বলা হয় সমতা রেখা। এই রেখা থেকে বিচ্যুতি হল অসমতা বা বৈষম্য। লোরেঞ্জ রেখা ও সমতা রেখার মধ্যবর্তী ক্ষেত্র এবং সমতা রেখার ডানদিকের পুরো জায়গাটির অনুপাতটিকেই গিনি সহগ বলে।

কুজনেৎসের ধারণা: মাথাপিছু আয় বাড়লে যেমন অর্থনীতির উন্নয়ন ঘটেছে ধরে নেওয়া হয় তেমনি উন্নয়নের মাত্রা কমলে মাথাপিছু আয় কমে। অর্থনীতিবিদ সাইমন কুজনেৎসের মতে মাথাপিছু আয় পরিবর্তনের সঙ্গে আয় বৈষম্যের একটা সম্পর্ক আছে। মাথাপিছু আয় বাড়লে প্রথমদিকে বৈষম্য বাড়ে তারপর কিন্তু তা কমতে থাকে। অর্থাৎ সমতা আসে বিকাশের একটি নির্দিষ্ট মাত্রা অর্জনের পর।

৮.১৩ অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন (প্রতিটির মান ২.৫)

(১) আয় বণ্টনে অসমতা কাকে বলে?

(২) আয় বণ্টনে অসমতা কীভাবে পরিমাপ করা হয়?

(৩) Lorenz রেখার সাহায্যে কীভাবে বৈষম্য পরিমাপ করা হয়?

(৪) আয়ের বৃত্তিগত (বা কর্মগত) বণ্টনে অসাম্য কীভাবে আসে?

মাঝারি দৈর্ঘ্যের প্রশ্ন (প্রতিটির মান ৫)

(৫) গিনি সহগের সাহায্যে কীভাবে আয় বৈষম্য পরিমাপ করা হয়?

(৬) চিত্রের সাহায্যে Lorenz রেখার দ্বারা কীভাবে আয় বৈষম্য পরিমাপ করা হয়?

(৭) লিঙ্গ বৈষম্য বলতে কী বোঝায়?

(৮) লিঙ্গভিত্তিক উন্নয়ন সূচক বলতে কী বোঝায়?

বড় প্রশ্ন (প্রতিটির মান ১০)

(৯) লিঙ্গভিত্তিক ক্ষমতায়নের পরিমাপ সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করুন।

(১০) কুজনেৎস্ কীভাবে তাঁর ধারণাটি তিনটি বিকাশশীল দেশ ও দুটি উন্নত দেশের তথ্য নিয়ে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন?

৮.১৪ গ্রন্থপঞ্জী

1. Kuznets– SimonéôéEconomic Growth and Income Inequality– 1955

2. Sen– AmartyaéôéPoverty and Famines An Essay in Entitlement and Depreivation– Claredon Press– Oxford– 1984 Monthly Review Press– New York– 1972

3. Ray– DebrajéôéDevelopment Economics– Oxford University Press– New Delhi– 1998

একক ৯ দারিদ্র্য

গঠন

৯.১ উদ্দেশ্য

৯.২ প্রস্তাবনা

৯.৩ দারিদ্র্যের ধারণা

৯.৪ আপেক্ষিক দারিদ্র্য

৯.৪.১ আপেক্ষিক দারিদ্র্য সামাজিক বর্জনের একটি রূপ

৯.৫ নিরঙ্কুশ (পরম) দারিদ্র্য

৯.৬ নিরঙ্কুশ (পরম) দারিদ্র্য এবং আপেক্ষিক দারিদ্র: পার্থক্য

৯.৭ দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র

৯.৭.১ দারিদ্র্যের দুষ্টচক্রের ধারনা

৯.৭.২ দারিদ্র্য চক্রে অবদান রাখার মূল উপাদান

৯.৭.৩ দারিদ্র্য চক্রের সাথে সম্পর্কিত মূল কারণগুলি হল:

৯.৭.৩.১ শিক্ষায় সীমিত প্রবেশাধিকার

৯.৭.৩.২ কর্মসংস্থানের সুযোগের অভাব

৯.৭.৩.৩ সম্পদে অপর্যাপ্ত অধিকার

৯.৭.৩.৪ সীমিত সামাজিক পুঁজি

৯.৭.৩.৫ -প্রজন্ম সঞ্চারণ

৯.৭.৩.৬ মনস্তাত্ত্বিক কারণ

৯.৭.৪ নিম্ন আয়ের দেশে দারিদ্র্যের দুষ্ট চক্র

৯.৮ সারাংশ

৯.৯ অনুশীলনী

৯.১০ গ্রন্থপঞ্জী

এই একক টি পাঠ করলে দারিদ্র্যের বিষয়ে একটি স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাবে। এছাড়া দারিদ্র্যের ধারনাগত পার্থক্য গুলিও স্বচ্ছতা পাবে এই আলোচনা থেকে।

৯.১ উদ্দেশ্য

দারিদ্র্য অনুধাবনের ক্ষেত্রে দারিদ্র্যের ধারনার মধ্যে যে ব্যঞ্জনা আছে তা পরিষ্কার হওয়া দরকার । আপেক্ষিক ও পরম বা নিরঙ্কুশ দারিদ্র্য এর বিষয় গুলির ধারনাগত স্বচ্ছতাও আমাদের কাছে খুব জরুরী। এ সবের ভিত্তিতে কি ভাবে আমরা দারিদ্র্য-রেখা নির্ধারন করব সেটাও আলোচনার প্রয়োজন।

৯.২ প্রস্তাবনা

দারিদ্র্যের সংজ্ঞা নিয়ে যে বিতর্ক সেটি শুধুমাত্র আয়ের পরিমাণগত বিভিন্নতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ, তা নয়। জীবনযাপনের জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য বিষয়গুলি ভোগের সুযোগ কতটা আছে সেটাও এখানে বিবেচ্য। ধরা যাক একজন ধনী যদি সুস্বাস্থ্যের অধিকারী না হন তাহলে টাকা থাকা সত্ত্বেও সবকিছু ভোগের সুযোগ থেকে তিনি বঞ্চিত হবেন। হয়তো তিনি শৈশবে প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবার সুযোগ পাননি। যে রাষ্ট্র নাগরিকদের স্বাস্থ্য পরিষেবা দিতে পারে না, আয়ের মাপকাঠিতে উন্নত হলেও সত্যিই কি এই রাষ্ট্র উন্নত?

দারিদ্র্যের সঙ্গে অনুন্নতির সম্পর্কটি অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। দারিদ্র্য তীব্র হলে তা যেমন অনুন্নতিকে ডেকে আনে, তেমনই অনুন্নতির অর্থই হল দারিদ্র্যের একটি প্রকাশ। শব্দ দুটিকে তাই একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ হিসেবে গণ্য করা চলে। কোনো একটি দেশের মোট জনসংখ্যার একটা বড় অংশ দারিদ্র্যের শিকার হলে তখনই সে দেশটিকে অনুন্নত দেশ বলা যাবে। দারিদ্র্য তাই অনুন্নত দেশগুলির একটি অন্যতম প্রধান চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।

৯.৩ দারিদ্র্যের ধারণা

দারিদ্র্যের ধারণা (The Concept of Poverty)

কে দরিদ্র? কাকে বলে দারিদ্র্য? এইসব প্রশ্নের সুনির্দিষ্ট উত্তর দেওয়া বড় কঠিন। প্রথমত, দরিদ্র, এই শব্দটি তো স্থান-নিরপেক্ষ নয়। মার্কিনী জীবনযাত্রার মাপকাঠিতে, মার্কিন অর্থনীতিতে যাকে দরিদ্র হিসাবে চিহ্নিত করা হয়, ভারতীয় জীবনযাত্রার পরিমাপ অনুযায়ী সে হয়তো আদৌ দরিদ্র নয়। দ্বিতীয়ত, কোনো মানুষের দারিদ্র্য সাধারণত পরিমাপ করা হয় আয়ের মাপকাঠিতে। এই মাপকাঠি অনুযায়ী যে মানুষটি দরিদ্র নয়, জীবনের অন্য সুযোগসুবিধার কথা ধরলে হয়তো তাকে দরিদ্রই মনে হবে। উদাহরণস্বরূপ, একজন হিন্দু বিধবা, অর্থবৈভবে যিনি হয়তো অত্যন্ত বিত্তশালিনী, সামাজিক বিধিনিষেধের কথা মানলে তাকে হয়তো অত্যন্ত দরিদ্রই মনে হবে। দারিদ্র্যের অতএব কোনো সংজ্ঞা হয় না। বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন অর্থনীতিবিদ দারিদ্র্যের বিবিধ সংজ্ঞা দিয়েছেন, আর বারেবারেই সেইসব সংজ্ঞার উপর বিভিন্ন প্রশ্নবোধক চিহ্ন এঁকে দিয়েছেন আরেক দল অর্থনীতিবিদ।

তবে সাধারণভাবে দরিদ্র বলতে আয় কম, এমন মানুষকেই আমরা বুঝিয়ে থাকি। অর্থশাস্ত্রের চিরাচরিত আলোচনায় আয়কেই দারিদ্র্য-সূচক হিসেবে গণ্য করা হয়ে এসেছে। কিন্তু আয়কে দারিদ্র্য-সূচক হিসেবে গণ্য করার প্রথম সমস্যা তার পরিমাণ নিয়ে। একটি মানুষের আয় কত হলে তাকে আর দরিদ্র বলা হবে না।

প্রাথমিকভাবে এই সমস্যাটির সমাধান করা হয়েছিল এইভাবে একটি মানুষের আয় যদি এতটাই কম হয় যে তা দিয়ে তার 'জীবনধারণের জন্য ন্যূনতম প্রয়োজন টুকুও কিনে উঠতে পারছে না তবে মানুষটিকে দরিদ্র বলা হবে।

সমস্যার এই সমাধান থেকেই সমস্যাটির দ্বিতীয় ধাপের উৎপত্তি। জীবনধারণের জন্য ন্যূনতম প্রয়োজন বলতে কী বোঝানো হচ্ছে। 'জীবনধারণের জন্য ন্যূনতম প্রয়োজন', এই শব্দবন্ধটির অর্থও তো বদলে যায় এক স্থান থেকে আরেক স্থানে। উদাহরণস্বরূপ, এদেশে আমরা জীবনধারণের জন্য ন্যূনতম প্রয়োজন বলতে বোঝাই প্রাণধারণের জন্য প্রয়োজনীয় ক্যালোরিটুকুকে। অর্থাৎ কেউ যদি কোনোক্রমে বেঁচে থাকার জন্য যতটুকু কম ক্যালোরি লাগে ততটুকু ক্যালোরি কেনার বন্দোবস্ত করে ফেলতে পারে তবে তাকে আর দরিদ্র বলা হবে না, বরং বলা হবে লোকটি ন্যূনতম জীবনযাত্রার মান নির্বাহ করছে। কিন্তু জীবনযাপনের ন্যূনতম মান সম্পর্কিত বারণাটি উন্নত দেশগুলিতে ঠিক এমনটি নয়। সেখানে 'জীবনযাপনের ন্যূনতম প্রয়োজন' বলতে শুধু খাদ্য নয়, সেইসঙ্গে একটুকরো আশ্রয়, কিছু বস্ত্রাদি, এমনকী কোনো কোনো ক্ষেত্রে কিছু বিলাসদ্রব্যের প্রয়োজনকেও বোঝানো হয়। এইসব সমস্যার কারণেই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে দারিদ্র্যের আয়গত মাপকাঠিটি বিভিন্ন।

অবশ্য দারিদ্র্যের সংজ্ঞা সংক্রান্ত বিতর্কটি যে কেবলমাত্র এই আয়ের পরিমাণগত বিভিন্নতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ, তা নয়। বস্তুত, এই সংজ্ঞা নিয়ে যেসব অর্থশাস্ত্রবিদ বিতর্ক করেছেন, তাদের মধ্যে কেউ কেউ এমন প্রশ্নও তুলেছেন যে দারিদ্র্যের সঠিক পরিমাপের জন্য শুধু আয় নয়, জীবনযাপনের জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য বিষয়গুলি ভোগের অধিকার কতটা আছে সে দিকেও নজর দিতে হবে। যে মানুষটির অর্থের কোনো অভাব নেই, বিবিধ জিনিস ভোগের তার কতটা সুযোগ বা অধিকার আছে সেটাও খেয়াল রাখতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, একজন ধনী মানুষ যদি সুস্বাস্থ্যের অধিকারী না হন তাহলে টাকা থাকলেও তিনি সবকিছু ভোগের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবেন। তাহলে, অর্থশাস্ত্রবিদদের প্রশ্ন, আমরা কি আদৌ ঐ ধনী মানুষটিকে দরিদ্র নয় বলে চিহ্নিত করতে পারি? এই সঙ্গে আরও একটি প্রশ্ন তাঁরা তুলেছেন।

যে মানুষটি সুস্বাস্থ্যের অধিকারী নন, তার দুর্বল স্বাস্থ্যের একটা কারণ নিশ্চয়ই এই যে শৈশবে বা বাল্যে মানুষটি সুচিকিৎসার, প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবার সুযোগ পাননি। যে রাষ্ট্র তার নাগরিকদের সঠিক স্বাস্থ্যপরিষেবা জোগান দিতে পারে না, আয়ের মাপকাঠিতে সবল হলেও তাকে কি ধনী বলা চলে? দারিদ্র্য সংক্রান্ত আলোচনা এভাবেই বিভিন্ন প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হতে আজকে মানব-বিকাশের মাপকাঠিতে দারিদ্র্যের পরিমাপের বিষয়টিতে এসে হাজির হয়েছে।

৯.৪ আপেক্ষিক দারিদ্র্য

আপেক্ষিক দারিদ্র্য*হল যখন পরিবারগুলি গড় পরিবারের আয়ের তুলনায় ৫০ু কম পায়। তাই তাদের কাছে কিছু টাকা আছে কিন্তু মৌলিক বিষয়ের ঊর্ধ্বে কিছু বহন করার মতো পর্যাপ্ত অর্থ নেই। এই*ধরনের দারিদ্র্য*, অন্যদিকে, দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির উপর নির্ভর করে পরিবর্তনযোগ্য।

আপেক্ষিক দারিদ্র্যকে কখনও কখনও ক্ষ্মআপেক্ষিক বঞ্চনাক্ষ্ম হিসাবে বর্ণনা করা হয় কারণ এই বিভাগের অধীনে থাকা লোকেরা সম্পূর্ণ দারিদ্র্যের মধ্যে বাস করে না। তবে, তারা দেশের অন্য সকলের মতো একই জীবনযাত্রা উপভোগ করছে না। সেটা হতে পারে টিভি, ইন্টারনেট, পরিষ্কার পোশাক, একটি নিরাপদ বাড়ি (একটি স্বাস্থ্যকর পরিবেশ, অপব্যবহার বা অবহেলা থেকে মুক্ত), এমনকি শিক্ষা।

আপেক্ষিক দারিদ্রও স্থায়ী হতে পারে। এর মানে হল যে কিছু পরিবারে একই সমাজের অন্যান্য লোকেদের বর্তমানে অ্যাক্সেসের মতো জীবনযাত্রার একই মান উপভোগ করার একেবারেই কোন সুযোগ নেই। তারা মূলত একটি স্বল্প আপেক্ষিক আয় বাক্সে ক্ষ্মফাঁদেক্ষ্ম আছে।

যখন দারিদ্র্য পরিমাপ করার জন্য আপেক্ষিক পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়, তখন আরেকটি ধারণা আছে যা অন্বেষণ করা প্রয়োজন - ক্রমাগত দারিদ্র্য। এটি হল যখন পরিবারগুলি ৩ বছরের মধ্যে প্রতি ২ বছরে গড় আয়ের তুলনায় ৫০ বা ৬০ু কম আয় পায়। যেহেতু*দীর্ঘমেয়াদী দারিদ্র্য*অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার উপর আরো বেশি প্রভাব ফেলে, তাই অবিরাম দারিদ্র্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা যা মনে রাখতে হবে।

৯.৪.১ আপেক্ষিক দারিদ্র্য সামাজিক বর্জনের একটি রূপ

সামগ্রিকভাবে,*দারিদ্র্য বর্জনের বিষয়ে*। এর সবচেয়ে চরম আকারে, এটি একটি শালীন জীবনের জন্য আপনার যা প্রয়োজন তা অ্যাক্সেস করতে অক্ষমতা। তুলনামূলকভাবে বলতে গেলে, আরও উন্নত দেশগুলিতে, এটি স্বাভাবিক দৈনন্দিন জীবন গঠন থেকে বাদ দেওয়া হচ্ছে:

চাকরি বা পাবলিক সার্ভিস অ্যাক্সেস করার জন্য ইন্টারনেট

সেই চাকরি খোঁজার জন্য উপযুক্ত পোশাক

শিক্ষার জন্য অর্থ প্রদান

শালীন আবাসনে অ্যাক্সেস (শ্বাসযন্ত্রের রোগ দরিদ্র আবাসনের সবচেয়ে সাধারণ লক্ষণগুলির মধ্যে একটি)

দেশের উন্নয়নের স্তরের উপর আপেক্ষিক দারিদ্র্য নির্ভর করে। এটি প্রত্যেককে একই জীবনযাত্রার মান উপভোগ করার সুযোগ দেওয়ার বিষয়ে যাতে প্রত্যেকের তাদের পূর্ণ সম্ভাবনায় তাদের জীবনযাপন করার সমান সুযোগ থাকে। সেই অর্থে, দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে লড়াই করা হল প্রতিটি দেশের মধ্যে বিশাল, অব্যবহৃত অর্থনৈতিক সম্ভাবনাকে আনলক করা।

৯.৫ নিরঙ্কুশ (পরম) দারিদ্র্য

নিরঙ্কুশ (পরম) দারিদ্র্য হল এমন একটি অবস্থার যেখানে একটি রাষ্ট্রে একজন ব্যক্তি তার সবচেয়ে মৌলিক চাহিদা পূরণ করতে পারে না। এর মানে হল যে আপনি যদি পরম দারিদ্র্যের মধ্যে থাকেন তবে আপনি বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় ন্যূনতম পরিমাণ খাদ্য, বস্ত্র এবং বাসস্থান পেতে সক্ষম হবেন না। অন্য কথায়, আপনি ভয়াবহ পরিস্থিতিতে বসবাস করছেন। বিশ্বব্যাংকের মতে, নিরঙ্কুশ দারিদ্র্যকে সংজ্ঞায়িত

করা হয়েছে ক্ষ্মএমন একটি পরিস্থিতি যেখানে মানুষ নিরাপদ পানীয় জল, খাদ্য, স্যানিটেশন সুবিধা, স্বাস্থ্যসেবা, আশ্রয় এবং বস্ত্র থেকে বঞ্চিত হয়।ক্ষ্ম

এটি পরিমাপ করা হয় ২০১১ মূল্যের আন্তর্জাতিক দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী জনসংখ্যার শতাংশ হিসাবে প্রতিদিন ডর্ব্ব০.৯০ মূল্যে।ক্ষ্ম অন্য কথায়, আপনি যদি দিনে ০.৯০ ডলারের কম আয় করেন, তাহলে আপনাকে পরম দারিদ্র্য বলে মনে করা হয়।

৯.৬ নিরঙ্কুশ (পরম) দারিদ্র্য এবং আপেক্ষিক দারিদ্র: পার্থক্য

পরম দারিদ্র্য হল এমন একটি অবস্থা যেখানে একজন ব্যক্তির খাদ্য, বস্ত্র এবং বাসস্থানের মতো জীবনের প্রয়োজনীয়তার অভাব থাকে। বিপরীতে, আপেক্ষিক দারিদ্র্য এমন একটি শর্ত যেখানে একজন ব্যক্তির আয় সমাজের অন্যদের তুলনায় তার চাহিদা পূরণের জন্য অপর্যাপ্ত।

নিরঙ্কুশ দারিদ্র্যের কারণ অনেক এবং বৈচিত্র্যময়, তবে তাদের তিনটি প্রধান বিভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে: প্রাকৃতিক দুর্যোগ, অর্থনৈতিক কারণ এবং রাজনৈতিক কারণ। প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে রয়েছে খরা, বন্যা এবং ভূমিকম্পের মতো জিনিস যা ফসল বা বাড়ি ধ্বংস করতে পারে এবং মানুষকে খাদ্য বা আশ্রয় ছাড়াই ছেড়ে দিতে পারে। মুদ্রাস্ফীতি বা দেশের ঋণের মতো অর্থনৈতিক কারণগুলিও পরম দারিদ্র্যের দিকে নিয়ে যেতে পারে। এবং অবশেষে, যুদ্ধ বা দুর্নীতিগ্রস্ত সরকারগুলির মতো রাজনৈতিক কারণগুলিও নিরঙ্কুশ দারিদ্র্যের জন্য অবদান রাখতে পারে।

নিরঙ্কুশ দারিদ্র্যের প্রভাব তাৎক্ষণিক এবং দীর্ঘমেয়াদী উভয়ই। স্বল্পমেয়াদে, যারা পরম দারিদ্রের মধ্যে বসবাস করছে তাদের জীবনের প্রয়োজনীয়তার অভাব রয়েছে এবং তারা প্রায়শই খাদ্য, বিশুদ্ধ পানি, আশ্রয় এবং চিকিৎসা সেবা ছাড়া যেতে বাধ্য হয়। এর ফলে রোগ, অপুষ্টি, এমনকি মৃত্যুও হতে পারে। দীর্ঘমেয়াদে, নিরঙ্কুশ দারিদ্র্য মানুষকে দারিদ্র্যের একটি চক্রে আটকাতে পারে যা থেকে বেরিয়ে আসা কঠিন। যেসকল শিশু পরম দারিদ্র্যের মধ্যে বেড়ে ওঠে তাদের স্কুল ছেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি, প্রাপ্তবয়স্ক হিসাবে চাকরি খুঁজে পেতে অসুবিধা হয় এবং প্রাপ্তবয়স্কদের মতো দারিদ্র্যের মধ্যে বসবাস করে।

পরম দারিদ্র্য হল খাদ্য, জল এবং বাসস্থানের মতো মৌলিক মানবিক চাহিদা ছাড়া থাকা অবস্থা। অপরদিকে আপেক্ষিক দারিদ্র্য হল আয় বৈষম্যের একটি পরিমাপ যা মানুষের আয়কে তাদের সমাজের অন্যদের আয়ের সাথে তুলনা করে। বাকি জনসংখ্যার তুলনায় সমাজের দরিদ্রতম সদস্যরা কতটা ভালো তা দেখে। যদিও উভয় ধরনের দারিদ্র্যই গুরুতর সমস্যা যা সমাধান করা প্রয়োজন, আপেক্ষিক দারিদ্র্যকে সাধারণত একটি বড় সমস্যা হিসাবে দেখা হয় কারণ এটি মানুষকে অসুবিধার চক্রে আটকে দিতে পারে। এই কারণেই অনেক দেশ এখন দারিদ্র্য কমানোর জন্য নীতি তৈরি করার সময় আপেক্ষিক দারিদ্র্যের ব্যবস্থা ব্যবহার করে।

৯.৭ দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র

৯.৭.১ দারিদ্র্যের দুষ্টচক্রের ধারনা

দারিদ্রের চক্র একটি স্ব-স্থায়ী প্যাটার্নকে বোঝায় যেখানে ব্যক্তি বা পরিবারগুলি দারিদ্র্য অনুভব করে এবং এটি থেকে বের হয়ে আসা কঠিন বিষয় হয়ে পড়ে। এটি অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং মনস্তাত্ত্বিক কারণগুলির সংমিশ্রণ জড়িত যা বাধা সৃষ্টি করে এবং প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে মানুষকে দারিদ্র্যের মধ্যে আটকে রাখে।চক্রটি নিজেকে শক্তিশালী করে এবং ব্যক্তিদের জন্য দারিদ্র্যের কবল থেকে মুক্ত হওয়াকে দুরূহ করে তোলে।

৯.৭.২ দারিদ্র্য চক্রে অবদান রাখার মূল উপাদান

২০২৪ সালে,*৭১২ মিলিয়ন মানুষ*চরম দারিদ্র্যের মধ্যে বসবাস করছে, যা ২০২০ থেকে একটি উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, কোভিড-১৯, সংঘর্ষ এবং চরম আবহাওয়ার প্রভাব দ্বারা প্রত্যাখ্যাত মানুষের মধ্যে এর প্রভাব উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি পেয়েছে। ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য, পরিস্থিতি দারিদ্র্যের একটি চক্রকে ইন্ধন যুগিয়েছে যা স্বয়ংক্রিয় ভাবে ভেঙ্গে সম্ভাবনা নেই। অনেকে তাদের পিতামাতার কাছ থেকে এই চক্রটি উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছে। সেটা তারা তাদের পরবর্তি প্রজন্মের মধ্যে সঞ্চারিত করে যাবে।

৯.৭.৩ দারিদ্র্য চক্রের সাথে সম্পর্কিত মূল কারণগুলি হল:

৯.৭.৩.১ শিক্ষায় সীমিত প্রবেশাধিকার

দারিদ্র্য প্রায়শই মানসম্মত শিক্ষার অপর্যাপ্ত অক্ষের দিকে পরিচালিত করে। এটি বিভিন্ন কারণের ফলে হতে পারে যেমন অসহনীয় স্কুল ফি, পরিবহনের অভাব, বা অর্থনৈতিকভাবে সুবিধাবঞ্চিত এলাকায় নিম্নমানের স্কুল ইত্যাদি। সীমিত শিক্ষা দক্ষতা বিকাশের জন্য ব্যক্তিদের আয়ের সুযোগ ও চাকরির নিরাপত্তা কমিয়ে দেয় এবং তাদের ভাল বেতনের চাকরির নিরাপত্তার সম্ভাবনা হ্রাস করে।

৯.৭.৩.২ কর্মসংস্থানের সুযোগের অভাব

চাকরির সুযোগের অভাবের কারণে দারিদ্র্য স্থায়ী হতে পারে, বিশেষ করে উচ্চ বেকারত্বের হার এবং সীমিত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি সহ এলাকায়। এটি স্বল্প বেতনের চাকরি বা অনানুষ্ঠানিক ক্ষেত্রের (জ্জন্ত্রদ্রন্দ্বখত্ত (ত্রত্বঙ্গ্রন্দ) উপর নির্ভরশীল হতে পারে, যা সামান্য কাজের নিরাপত্তা বা অগ্রগতির সুযোগ দেয়।

৯.৭.৩.৩ সম্পদে অপর্যাপ্ত অধিকার

দারিদ্র্য প্রায়শই স্বাস্থ্যসেবা, পুষ্টিকর খাদ্য, বিশুদ্ধ পানীয় জল এবং পর্যাপ্ত বাসস্থানের মতো প্রয়োজনীয় সম্পদের অধিকার কে সীমিত করে। এই সীমাবদ্ধতাগুলি ব্যক্তির স্বাস্থ্য, সুস্থতা এবং সামগ্রিক উত্পাদনশীলতার উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে, যা দারিদ্র্য থেকে মুক্তি পাওয়ার বিষয়টিকে আরও দুরূহ করে তোলে।

৯.৭.৩.৪ সীমিত সামাজিক পুঁজি

সামাজিক পুঁজি বলতে বোঝায় নেটওয়ার্ক, সম্পর্ক, এবং সহায়তা ব্যবস্থা যা ব্যক্তিদের অধিকারে আছে। দারিদ্র্য ব্যক্তিদের এই ধরনের সামাজিক নেটওয়ার্কগুলি থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারে এবং তাদের জন্য সম্পদ, সুযোগ এবং জ্ঞান যা চক্র ভাঙতে সাহায্য করতে পারে তা ব্যবহার করা কঠিন করে তোলে। সীমিত সামাজিক পুঁজির ফলেও রোল মডেল এবং পরামর্শদাতাদের অভাব দেখা দিতে পারে যারা নির্দেশনা এবং সহায়তা প্রদান করতে পারে।

৯.৭.৩.৫ -প্রজন্ম সঞ্চারণ

দারিদ্র্য এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে সঞ্চারিত হতে পারে। দারিদ্র্যের মধ্যে বেড়ে ওঠা শিশুরা প্রায়ই বিভিন্ন অসুবিধার সম্মুখীন হয় যা তাদের বিকাশকে বাধাগ্রস্ত করে, যেমন অপর্যাপ্ত পুষ্টি, শিক্ষায় সীমিত প্রবেশাধিকার এবং উচ্চ স্তরের চাপের সংস্পর্শে আসা। এই পরিস্থিতিতে তারা প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর দারিদ্র্যের প্রভাবকে অতিক্রম পারেনা, ঐ পরিস্থিতি তাদের দারিদ্র্যের মধ্যে থাকার সম্ভাবনা কে বাড়িয়ে দিতে পারে, এবং যার ফলে দারিদ্র্যের চক্রটি বহমান থেকে যায়।

৯.৭.৩.৬ মনস্তাত্ত্বিক কারণ

দারিদ্র্যের অভিজ্ঞতার মানসিক প্রভাবও থাকতে পারে, যার মধ্যে নিম্ন আত্মসম্মানবোধ, হতাশার অনুভূতি এবং দারিদ্র্য থেকে পালানোর ক্ষমতার প্রতি আত্মবিশ্বাসের অভাব। এই মনস্তাত্ত্বিক বাধাগুলি মানুষকে দারিদ্র্যের দুষ্ট চক্রের বাইরে বের হওয়ার প্রচেষ্টাকে বাধা প্রাপ্ত করে।

৯.৭.৪ নিম্ন আয়ের দেশে দারিদ্র্যের দুষ্ট চক্র

অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক এবং পরিবেশগত কারণগুলির জটিল পারস্পরিক ঘাত-প্রতিঘাত এর ফলে ব্যক্তি এবং সামাজিক উভয় স্তরেই দারিদ্র্যের স্থায়ীত্বে অবদান রাখে যা নিম্ন আয়ের দেশগুলিতে দারিদ্র্যের দুষ্টচক্রকে স্থায়িত্ব প্রদান করে।

সম্পদ এবং সুযোগ সীমিত অধিকার

নিম্ন আয়ের দেশগুলির অনেক ব্যক্তি শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, পরিশুদ্ধ পানীয় জল , স্যানিটেশনের সুবিধা এবং শক্তি পরিষেবার মতো প্রয়োজনীয় সংস্থানগুলিতে অধিকারের অভাব রয়েছে। এই সীমিত অধিকার তাদের দারিদ্র্য থেকে পালানোর ক্ষমতাকে বাধাগ্রস্ত করে কারণ তারা মানসম্পন্ন শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা পরিষেবা এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ পেতে বাধার সম্মুখীন হয়।

উচ্চ মাত্রার বৈষম্য

নিম্ন আয়ের দেশগুলি প্রায়ই উল্লেখযোগ্য আয় এবং সম্পদের বৈষম্য অনুভব করে, জনসংখ্যার একটি ছোট অংশ সম্পদের একটি বড় অংশ নিয়ন্ত্রণ করে। এই বৈষম্য দারিদ্র্যের চক্রকে আরও বাড়িয়ে তোলে কারণ এটি ঊর্ধ্বমুখী গতিশীলতার সুযোগ সীমিত করে, সামাজিক বর্জনকে স্থায়ী করে এবং কিছু লোকের হাতে সম্পদ ও ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণকে শক্তিশালী করে।

দুর্বল অবকাঠামো এবং পরিষেবা

পরিবহন, যোগাযোগ এবং জ্বালানি ব্যবস্থা সহ অপর্যাপ্ত অবকাঠামো অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং মৌলিক পরিষেবাগুলিতে অ্যাক্সেসকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে। অপর্যাপ্ত অবকাঠামো সংযোগ, বাণিজ্য, এবং বাজারে প্রবেশাধিকার সীমিত করে, অর্থনৈতিক সুযোগকে বাধাগ্রস্ত করে এবং দারিদ্র্যকে স্থায়ী করে।

বাহ্যিক ধাক্কার জন্য দুর্বলতা

উন্নয়নশীল দেশগুলি প্রায়শই অর্থনৈতিক সংকট, প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের মতো বাহ্যিক ধাক্কাগুলির জন্য বেশি ঝুঁকিতে থাকে। এই ধাক্কাগুলি জীবিকাকে ব্যাহত করতে পারে, অবকাঠামো ধ্বংস করতে পারে এবং দারিদ্র্যকে আরও বাড়িয়ে তুলতে পারে, বিশেষ করে যারা ইতিমধ্যেই অনিশ্চিত অবস্থায় বসবাস করছেন তাদের মধ্যে।

আমরা কীভাবে দারিদ্র্যের চক্রটি ভাঙতে পারি

দারিদ্র্যের চক্র ভাঙ্গার জন্য এই আন্তঃসংযুক্ত কারণগুলিকে ব্যাপক এবং লক্ষ্যযুক্ত পদ্ধতির মাধ্যমে সমাধান করতে হবে। এর মধ্যে রয়েছে মানসম্পন্ন শিক্ষার অ্যাক্সেসের উন্নতি, কাজের সুযোগ তৈরি এবং দক্ষতা প্রশিক্ষণ কর্মসূচি, প্রয়োজনীয় পরিষেবাগুলিতে অ্যাক্সেস নিশ্চিত করা এবং সহায়ক সামাজিক নেটওয়ার্কগুলিকে উত্সাহিত করা। উপরন্তু, যে নীতিগুলি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে উন্নীত করে, আয় বৈষম্য হ্রাস করে এবং ব্যক্তি ও সম্প্রদায়ের ক্ষমতায়ন করে দারিদ্র্যের চক্র ভাঙতে অবদান রাখতে পারে।

দারিদ্র্যের চক্র মোকাবেলায় উদ্বেগের কাজ

Concern-এর লক্ষ্য হল চরম দারিদ্র্যের মধ্যে বসবাসকারী লোকেদের তাদের জীবনে বড় উন্নতি সাধনে সাহায্য করা যা Concern থেকে অব্যাহত সমর্থন ছাড়াই স্থায়ী হয়। এই মিশনটি অর্জনের জন্য, কনসার্ন দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়নমূলক কাজে নিযুক্ত থাকে, জরুরী পরিস্থিতিতে সাড়া দেয় এবং আমাদের উন্নয়ন শিক্ষা এবং অ্যাডভোকেসি কাজের মাধ্যমে দারিদ্র্যের মূল কারণগুলিকে মোকাবেলা করার চেষ্টা

৯.৮ সারাংশ

দারিদ্র্য অনুধাবনের ক্ষেত্রে দারিদ্র্যের ধারনার মধ্যে যে ব্যঞ্জনা আছে তা পরিষ্কার হওয়া দরকার । আপেক্ষিক ও পরম বা নিরঙ্কুশ দারিদ্র্য এর বিষয় গুলির ধারনাগত স্বচ্ছতাও আমাদের কাছে খুব জরুরী। এ সবের ভিত্তিতে কি ভাবে আমরা দারিদ্র্য নির্ধারন করব সেটার আলোচনা অত্যন্ত জরুরী। কে দরিদ্র ? কাকে বলে দারিদ্র্য ? এইসব প্রশ্নের সুনির্দিষ্ট উত্তর দেওয়া বড় কঠিন। দরিদ্র, এই শব্দটি তো স্থান-নিরপেক্ষ নয়। করে।দারিদ্র্যের বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন অর্থনীতিবিদ দারিদ্র্যের বিবিধ সংজ্ঞা দিয়েছেন, আর বারেবারেই সেইসব সংজ্ঞার উপর বিভিন্ন প্রশ্নবোধক চিহ্ন এঁকে দিয়েছেন আরেক দল অর্থনীতিবিদ। নিরঙ্কুশ বা পরম দারিদ্র্যের সাথে আপেক্ষিক দারিদ্র্যের পার্থক্য নির্ধারন করে তাদের নির্নায়ক গুলির অনুসন্ধানের চেষ্টা চালানো হয়েছে। দারিদ্র্যের দুষ্টচক্রের বিষয়টি এই আঙ্গিকে নতুন ভাবে আলোচনা করে দারিদ্র্যের সংগে

সম্পর্কিত বিষয়গুলি সবিস্তারে আলোচনা করেছে।

৯.৯ অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন (প্রতিটির মান ২.৫)

(১) দারিদ্র্য কাকে বলে?

(২) দারিদ্র্যের পরিমাপ কীভাবে করা হয়?

(৩) দারিদ্র্যের দুষ্ট চক্র বলতে কি বোঝেন?

মাঝারি দৈর্ঘ্যের প্রশ্ন (প্রতিটির মান ৫)

নিরঙ্কুশ (পরম) দারিদ্র্য এবং আপেক্ষিক দারিদ্র এর পার্থক্য টি বিবৃত করুন।

দারিদ্র্যের ধারণাটি ব্যাখ্যা করুন।

দারিদ্র্য চক্রে অবদান রাখার মূল উপাদানগুলি কি কি?

বড় প্রশ্ন (প্রতিটির মান ১০)

১. দারিদ্র্য চক্রের সাথে সম্পর্কিত বিষয়গুলি কি কি?

২. দারিদ্র্যের বিভিন্ন ধারনাগুলি সংক্ষেপে বিবৃত করুন।

১০.১২ গ্রন্থপঞ্জী

1. Sen– AmartyaéôéPoverty and Famines An Essay in Entitlement andDepreivation– Claredon Press– Oxford– 1984

2. Sen– AmartyaéôéOn Economic Inequality– Claredon Press– Oxford– 1973

3. Kuznets– SéôéEconomic Growth and Income Inequality– 1955

4. Ray– DebrajéôéDevelopment Economics– Oxford University Press– New Delhi– 1998

একক ১০ দারিদ্র্য পরিমাপের বিভিন্ন সূচকগুলি

গঠন

১০.১ উদ্দেশ্য
১০.২ প্রস্তাবনা
১০.৩ দারিদ্র্যের ধারণা
১০.৪ দারিদ্র্যের পরিমাপ
১০.৫ দারিদ্র্যের আয়ভিত্তিক পরিমাপ
১০.৬ মাথাগুনতি সূচক
১০.৭ দারিদ্র্য-ব্যবধান সূচক
১০.৮ আয়-ব্যবধান সূচক
১০.৯ দারিদ্র্যের সক্ষমতাভিত্তিক পরিমাপ
১০.১০ মানব দারিদ্র্য সূচক (Human Poverty Index)
১০.১১ বিশ্ব ক্ষুধা সূচক (Global Hunger Index GHI)
১০.১১.১ কিভাবে বিশ্ব ক্ষুধা সূচক বা GHI গণনা করা হয়
১০.১২ সারাংশ
১০.১৩ অনুশীলনী
১০.১৪ গ্রন্থপঞ্জী

১০.১ উদ্দেশ্য

এই একক টি পাঠ করলে দারিদ্র্যের বিষয়ে একটি স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাবে। এছাড়া দারিদ্র্যের ধারনাগত পার্থক্য গুলিও স্বচ্ছতা পাবে এই আলোচনা থেকে। পরিমাপ কীভাবে করতে হয় সে সম্বন্ধেও সম্যক ধারণা হবে।

১০.২ প্রস্তাবনা

দারিদ্র্যের সংজ্ঞা নিয়ে যে বিতর্ক সেটি শুধুমাত্র আয়ের পরিমাণগত বিভিন্নতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ, তা নয়। জীবনযাপনের জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য বিষয়গুলি ভোগের সুযোগ কতটা আছে সেটাও এখানে

বিবেচ্য। ধরা যাক একজন ধনী যদি সুস্বাস্থ্যের অধিকারী না হন তাহলে টাকা থাকা সত্ত্বেও সবকিছু ভোগের সুযোগ থেকে তিনি বঞ্চিত হবেন। হয়তো তিনি শৈশবে প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবার সুযোগ পাননি। যে রাষ্ট্র নাগরিকদের স্বাস্থ্য পরিষেবা দিতে পারে না, আয়ের মাপকাঠিতে উন্নত হলেও সত্যিই কি এই রাষ্ট্র উন্নত?

দারিদ্র্যের সঙ্গে অনুন্নতির সম্পর্কটি অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। দারিদ্র্য তীব্র হলে তা যেমন অনুন্নতিকে ডেকে আনে, তেমনই অনুন্নতির অর্থই হল দারিদ্র্যের একটি প্রকাশ। শব্দ দুটিকে তাই একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ হিসেবে গণ্য করা চলে। কোনো একটি দেশের মোট জনসংখ্যার একটা বড় অংশ দারিদ্র্যের শিকার হলে তখনই সে দেশটিকে অনুন্নত দেশ বলা যাবে। দারিদ্র্য তাই অনুন্নত দেশগুলির একটি অন্যতম প্রধান চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।

১০.৩ দারিদ্র্যের ধারণা (The Concept of Poverty)

কে দরিদ্র? কাকে বলে দারিদ্র্য? এইসব প্রশ্নের সুনির্দিষ্ট উত্তর দেওয়া বড় কঠিন। প্রথমত, দরিদ্র, এই শব্দটি তো স্থান-নিরপেক্ষ নয়। মার্কিনী জীবনযাত্রার মাপকাঠিতে, মার্কিন অর্থনীতিতে যাকে দরিদ্র হিসাবে চিহ্নিত করা হয়, ভারতীয় জীবনযাত্রার পরিমাপ অনুযায়ী সে হয়তো আদৌ দরিদ্র নয়। দ্বিতীয়ত, কোনো মানুষের দারিদ্র্য সাধারণত পরিমাপ করা হয় আয়ের মাপকাঠিতে। এই মাপকাঠি অনুযায়ী যে মানুষটি দরিদ্র নয়, জীবনের অন্য সুযোগসুবিধার কথা ধরলে হয়তো তাকে দরিদ্রই মনে হবে। উদাহরণস্বরূপ, একজন হিন্দু বিধবা, অর্থবৈভবে যিনি হয়তো অত্যন্ত বিত্তশালিনী, সামাজিক বিধিনিষেধের কথা মানলে তাকে হয়তো অত্যন্ত দরিদ্রই মনে হবে। দারিদ্র্যের অতএব কোনো সংজ্ঞা হয় না। বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন অর্থনীতিবিদ দারিদ্র্যের বিবিধ সংজ্ঞা দিয়েছেন, আর বারেবারেই সেইসব সংজ্ঞার উপর বিভিন্ন প্রশ্নবোধক চিহ্ন এঁকে দিয়েছেন আরেক দল অর্থনীতিবিদ।

তবে সাধারণভাবে দরিদ্র বলতে আয় কম, এমন মানুষকেই আমরা বুঝিয়ে থাকি। অর্থশাস্ত্রের চিরাচরিত আলোচনায় আয়কেই দারিদ্র্য-সূচক হিসেবে গণ্য করা হয়ে এসেছে। কিন্তু আয়কে দারিদ্র্য-সূচক হিসেবে গণ্য করার প্রথম সমস্যা তার পরিমাণ নিয়ে। একটি মানুষের আয় কত হলে তাকে আর দরিদ্র বলা হবে না। প্রাথমিকভাবে এই সমস্যাটির সমাধান করা হয়েছিল এইভাবে একটি মানুষের আয় যদি এতটাই কম হয় যে তা দিয়ে তার 'জীবনধারণের জন্য ন্যূনতম প্রয়োজন টুকুও কিনে উঠতে পারছে না তবে মানুষটিকে দরিদ্র বলা হবে।

সমস্যার এই সমাধান থেকেই সমস্যাটির দ্বিতীয় ধাপের উৎপত্তি। জীবনধারণের জন্য ন্যূনতম প্রয়োজন বলতে কী বোঝানো হচ্ছে। 'জীবনধারণের জন্য ন্যূনতম প্রয়োজন', এই শব্দবন্ধটির অর্থও তো বদলে যায় এক স্থান থেকে আরেক স্থানে। উদাহরণস্বরূপ, এদেশে আমরা জীবনধারণের জন্য ন্যূনতম প্রয়োজন বলতে বোঝাই প্রাণধারণের জন্য প্রয়োজনীয় ক্যালোরিটুকুকে। অর্থাৎ কেউ যদি কোনোক্রমে বেঁচে থাকার জন্য যতটুকু কম ক্যালোরি লাগে ততটুকু ক্যালোরি কেনার বন্দোবস্ত করে ফেলতে পারে তবে তাকে আর দরিদ্র বলা হবে না, বরং বলা হবে লোকটি ন্যূনতম জীবনযাত্রার মান নির্বাহ করছে। কিন্তু জীবনযাপনের ন্যূনতম

মান সম্পর্কিত বারণাটি উন্নত দেশগুলিতে ঠিক এমনটি নয়। সেখানে 'জীবনযাপনের ন্যূনতম প্রয়োজন' বলতে শুধু খাদ্য নয়, সেইসঙ্গে একটুকরো আশ্রয়, কিছু বস্ত্রাদি, এমনকী কোনো কোনো ক্ষেত্রে কিছু বিলাসদ্রব্যের প্রয়োজনকেও বোঝানো হয়। এইসব সমস্যার কারণেই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে দারিদ্র্যের আয়গত মাপকাঠিটি বিভিন্ন।

অবশ্য দারিদ্র্যের সংজ্ঞা সংক্রান্ত বিতর্কটি যে কেবলমাত্র এই আয়ের পরিমাণগত বিভিন্নতার মধ্যেই

সীমাবদ্ধ, তা নয়। বস্তুত, এই সংজ্ঞা নিয়ে যেসব অর্থশাস্ত্রবিদ বিতর্ক করেছেন, তাদের মধ্যে কেউ কেউ এমন প্রশ্নও তুলেছেন যে দারিদ্র্যের সঠিক পরিমাপের জন্য শুধু আয় নয়, জীবনযাপনের জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য বিষয়গুলি ভোগের অধিকার কতটা আছে সে দিকেও নজর দিতে হবে। যে মানুষটির অর্থের কোনো অভাব নেই, বিবিধ জিনিস ভোগের তার কতটা সুযোগ বা অধিকার আছে সেটাও খেয়াল রাখতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, একজন ধনী মানুষ যদি সুস্বাস্থ্যের অধিকারী না হন তাহলে টাকা থাকলেও তিনি সবকিছু ভোগের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবেন। তাহলে, অর্থশাস্ত্রবিদদের প্রশ্ন, আমরা কি আদৌ ঐ ধনী মানুষটিকে দরিদ্র নয় বলে চিহ্নিত করতে পারি? এই সঙ্গে আরও একটি প্রশ্ন তাঁরা তুলেছেন।

যে মানুষটি সুস্বাস্থ্যের অধিকারী নন, তার দুর্বল স্বাস্থ্যের একটা কারণ নিশ্চয়ই এই যে শৈশবে বা বাল্যে মানুষটি সুচিকিৎসার, প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবার সুযোগ পাননি। যে রাষ্ট্র তার নাগরিকদের সঠিক স্বাস্থ্যপরিষেবা জোগান দিতে পারে না, আয়ের মাপকাঠিতে সবল হলেও তাকে কি ধনী বলা চলে? দারিদ্র্য সংক্রান্ত আলোচনা এভাবেই বিভিন্ন প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হতে আজকে মানব-বিকাশের মাপকাঠিতে দারিদ্র্যের পরিমাপের বিষয়টিতে এসে হাজির হয়েছে।

১০.৪ দারিদ্র্যের পরিমাপ (Measurement of Poverty)

দারিদ্র্যকে দু'ভাগে পরিমাপ করা যায়। প্রথমত, দারিদ্র্যের আয়ভিত্তিক পরিমাপের ক্ষেত্রে দেখা হয় কোনো মানুষ তার উপার্জিত অর্থের সাহায্যে জীবনের প্রাথমিক প্রয়োজনগুলি মেটাতে পারছে কিনা। দ্বিতীয়ত, মানব বিকাশভিত্তিক দারিদ্র্য পরিমাপের ক্ষেত্রে একটা মানুষ তার পছন্দের জীবনযাপনের সুযোগ থেকে কতটা বঞ্চিত তা বিচার করা হয়। অর্থাৎ দারিদ্র্যের আয়ভিত্তিক পরিমাপের ক্ষেত্রে হিসাব করা হয় কোনো মানুষের আয় জীবনের প্রাথমিক প্রয়োজনগুলি মেটাবার জন্য যে পরিমাণ আয়ের প্রয়োজন তার থেকে কতটা কম। অন্যদিকে, সক্ষমতাভিত্তিক পরিমাপের ক্ষেত্রে একটি সুন্দর (ত্মত্রত্বত্র—ষ্ঠ) জীবনযাপনের জন্য যতটা সক্ষমতার প্রয়োজন, কোনো মানুষ তার চেয়ে কতটা কম সক্ষম তা বিচার করা হয়।

১০.৫ দারিদ্র্যের আয়ভিত্তিক পরিমাপ (Income Measure of Poverty)

আয়ের (বা কারও কারও মতে ব্যয়ের) পরিমাপের ভিত্তিতে দারিদ্র্য পরিমাপের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল দারিদ্র্য রেখার ধারণাটি। জীবনের প্রাথমিক কিছু প্রয়োজন, যেমন খাদ্য ও বস্ত্র সংগ্রহে অপারগতাকে যদি দারিদ্র্য বলে ব্যাখ্যা করা হয় তাহলে এই 'ন্যূনতম প্রয়োজন' মেটাতে যে টাকা লাগে

তাকেই দারিদ্র্য রেখা বলে। দারিদ্র্য রেখা অতএব একটি সুনির্দিষ্ট আয়স্তর, ন্যূনতম প্রয়োজনের ধারণাটি পাল্টানোর সঙ্গে সঙ্গে যা পাল্টে যায়। দারিদ্র্যের আয়ভিত্তিক পরিমাপ পদ্ধতি অনুযায়ী যে সমস্ত মানুষ (বা পরিবার) এই দারিদ্র্য রেখার নীচে থাকে, অর্থাৎ যারা এই ন্যূনতম অর্থটুকুও উপার্জন করে উঠতে পারে না, তারাই দরিদ্র এবং এদের এই দারিদ্র্যকে চরম দারিদ্র্য (absolute poverty) হিসেবে অভিহিত করা হয়। ১৯৯০ সালের ওয়ার্ল্ড ডেভেলপমেন্ট রিপোর্টে একটি আন্তর্জাতিক দারিদ্র্য রেখার কথা উল্লেখ করা হয়। আন্তর্জাতিক এই দারিদ্র্য রেখা নির্দেশিত আয়স্তরটি হল প্রতিদিন মাথাপিছু এক ডলার। রিপোর্ট অনুযায়ী ১৯৮৫ সালের ক্রয়ক্ষমতার সমতা নির্ধারণকারী দামস্তর (Purchasing power parity price) অনুযায়ী আয়ের হিসাবটি করা হবে। এই আন্তর্জাতিক দারিদ্র্য রেখাটি ঘোষণা করার কারণ বিভিন্ন দেশের দারিদ্র্যের ভয়াবহতার একটি তুলনামূলক পরিমাপ করা। সারা পৃথিবীব্যাপীই অতঃপর যে সব মানুষের দিনপ্রতি উপার্জন ক্রয়ক্ষমতার হিসাবে এক ডলারের কম হবে তাকেই দরিদ্র হিসাবে গণ্য করা হবে।

১০.৬ মাথাগুনতি সূচক (Headcount Index)

দারিদ্র্য রেখাটি, বা আরও স্পষ্ট করে বলতে হলে দারিদ্র্য রেখা নির্দেশিত আয়স্তরটি, এক দেশ থেকে আরেক দেশে বদলে যায়। কারণ, দেশ থেকে দেশান্তরে বদলে যায় ন্যূনতম প্রয়োজন সংক্রান্ত ধারণাটি। কিন্তু একবার এই রেখাটিকে চিহ্নিত করে ফেলতে পারলে কোনো দেশের মোট দরিদ্র মানুষের সংখ্যাটি বের করে ফেলা খুবই সহজ। যে সমস্ত মানুষের আয় দারিদ্র্য রেখা নির্দেশিত আয়ের চেয়ে কম হবে স্রেফ তাদের মাথা গুনে নিলেই কোনো দেশের মোট দরিদ্রের হিসাবটি পাওয়া যাবে।

তবে দরিদ্রের কেবল এই মাথাগুনতি হিসাব থেকে কোনো দেশের দারিদ্র্যের ভয়াবহতা সম্বন্ধে কিছুই আঁচ করা যায় না। ফলত এই হিসাবের সাহায্যে দুটি দেশের দারিদ্র্যের মাত্রার তুলনামূলক পরিমাপও সম্ভবপর হয় না। তুলনার জন্য প্রয়োজন একটি আপেক্ষিক হিসাবের। মোট জনসংখ্যার সাপেক্ষে মোট দরিদ্রের সংখ্যা এমনই একটি হিসাব। দারিদ্র্য পরিমাপের এই আপেক্ষিক হিসাবটিকে বলা হয় মাথাগুনতি সূচক। যদি কোনো দেশের মোট জনসংখ্যা N হয় এবং তার মধ্যে H সংখ্যক মানুষ দারিদ্র্য রেখার নীচে থাকে তাহলে

মাথাগুনতি সূচকগু (H/N) × 100

অর্থাৎ মাথাগুনতি সূচকের সাহায্যে কোনো দেশে শতকরা কতজন মানুষ দারিদ্র্য রেখার নীচে আছে তা জানা যায়। কিন্তু এই সূচকটিকেও দারিদ্র্যের খুব একটা ভালো পরিমাপ হিসেবে গণ্য করা যায় না। কারণ এই পরিমাপের সাহায্যে কোনো দেশের 'দারিদ্র্যের গভীরতা' সম্পর্কে কোনো আন্দাজ পাওয়া যায় না। 'দারিদ্র্যের গভীরতা' বলতে আমরা বলতে চাইছি একজন ব্যক্তি দারিদ্র্য রেখার থেকে ঠিক কতটা নীচে আছে অথবা একটা দেশের গরিব মানুষেরা সামগ্রিকভাবে দারিদ্র্য রেখার কতটা নীচে আছে।

মাথাগুনতি সূচকের সাহায্যে দারিদ্র্য পরিমাপের আরও অসুবিধা আছে। এই পদ্ধতিতে দারিদ্র্য পরিমাপ করা হলে অনেক সময় দেখা যায়, যারা ক্ষমতায় আছে তারা দেশের দারিদ্র্যকে নির্বাচনী লড়াই জেতার

হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে। যে সমস্ত মানুষ দারিদ্র্য রেখার কাছাকাছি আছে, অর্থাৎ দারিদ্র্যের প্রকোপ যাদের কম ভোগ করতে হচ্ছে, তাদেরকে সরকার এককালীন থোক কিছু টাকা সাহায্য দিচ্ছে বা তাদের সাময়িক কোনো কাজের সুযোগ দিচ্ছে। এর ফলে সাময়িকভাবে কিছু মানুষ দারিদ্র্য রেখার উপরে উঠে আসছে, মাথাগুনতি দারিদ্র্য সূচকটির মান কমছে আর শাসকপক্ষ সদম্ভে তাদের এই সাফল্য ঘোষণা করে পুনর্নির্বাচিত হবার সম্ভাবনা বাড়িয়ে নিচ্ছে। মাথাগুনতি সূচকের এই সব সীমাবদ্ধতার কারণে বিকল্প সূচক হিসেবে দারিদ্র্য-ব্যবধান সূচকটির উদ্ভব।

১০.৭ দারিদ্র্য-ব্যবধান সূচক (Poverty-Gap Index)

কোনো দেশের দারিদ্র্যের গভীরতার অন্যতম প্রধান মাপকাঠি হল দারিদ্র্য-ব্যবধান। দারিদ্র্য-ব্যবধানের সাহায্যে যা আসলে পরিমাপ করা হয় তা হল প্রকৃত আয় ও দারিদ্র্য-রেখা নির্দেশিত আয়ের মধ্যে পার্থক্য কতটুকু। দারিদ্র্য-ব্যবধান একটি সামগ্রিক হিসেব। কোনো দেশে যতজন গরিব মানুষ আছেন তাদের প্রত্যেকের ক্ষেত্রে দারিদ্র্যের ব্যবধান হিসেব করে ঐ দেশের মোট দারিদ্র্য-ব্যবধানটুকু পাওয়া যায়। ধরা যাক ্দ্ম, হল দারিদ্র্য রেখা নির্দেশিত আয় এবং Yi– £œ ié-তম মানুষটির উপার্জন। সেক্ষেত্রে

$$\text{দারিদ্র্য-ব্যবধান} = \sum_{i=1}^{H}(y_P - y_i) \quad \text{যেখানে H হল দারিদ্র্য রেখার নীচে লোকের সংখ্যা।}$$

অর্থাৎ দারিদ্র্য-ব্যবধানের ধারণাটি থেকে আমরা বুঝতে পারি দেশের সমস্ত গরিব মানুষকে দারিদ্র্য রেখার উপর টেনে তুলতে হলে মোট আয় কতটা বাড়ানো প্রয়োজন বা মোট কতটা অর্থের প্রয়োজন। দারিদ্র্য ব্যবধানের এই হিসেবটিকে সাধারণত একটি অনুপাত হিসেবে প্রকাশ করা হয়। বিভিন্ন দেশের দারিদ্র্যের একটি তুলনামূলক হিসেবের জন্যই এমনটি করা হয়। এই অনুপাতটিকে বলা হয় দারিদ্র্য-ব্যবধান সূচক। কোনো দেশের সমস্ত দরিদ্র মানুষকে দারিদ্র্য রেখার উপরে তুলে আনার জন্য প্রয়োজনীয় গড় আয় এবং ঐ দেশের গড় আয়, এই দুইয়ের অনুপাতকেই বলা হয় দারিদ্র্য-ব্যবধান সূচক। যদি কোনো দেশের গড় আয় ঞ হয় তাহলে দারিদ্র্য-ব্যবধান সূচক (PGI)-টি হবে,

$$PGI = \frac{\sum_{i=1}^{H}(y_P - y_i)/N}{M} = \frac{\sum_{i=1}^{H}(y_P - y_i)}{MN} \quad \text{যেখানে N হল মোট জনসংখ্যা।}$$

১০.৮ আয়-ব্যবধান সূচক (Income-Gap Index)

মাথাগুনতি সূচকের মতো দারিদ্র্য-ব্যবধান সূচকটিরও কিছু সীমাবদ্ধতা আছে। উদাহরণস্বরূপ, একটি দেশের দরিদ্র শ্রেণির মধ্যেও প্রকারভেদ থাকে। আয়-বৈষম্যের কারণেই এমনটি ঘটে থাকে। কেউ হয়তো সামান্য গরিব, কেউ বা ভীষণ গরিব। দরিদ্র শ্রেণির মধ্যে আয়-বৈষম্য সূচকের সঙ্গে আয়-ব্যবধান সূচকের

তফাৎ অতি সামান্য। দারিদ্রদ্র্য-ব্যবধান সূচকের ক্ষেত্রে আমরা দেশের সমস্ত গরিব মানুষকে দারিদ্র্য সীমার উপরে তুলে আনার জন্য প্রয়োজনীয় গড় আয়কে দেশটির গড় আয় দিয়ে ভাগ করি। অন্যদিকে আয়-ব্যবধান সূচকের ক্ষেত্রে মোট দারিদ্র্য-ব্যবধানকে দেশের সমস্ত দরিদ্র মানুষের মোট আয় দিয়ে ভাগ করা হয়। অর্থাৎ দেশে মোট দরিদ্র মানুষের সংখ্যা যদি ছ হয় আর তারা সবাই দারিদ্র্য রেখার ঠিক উপরে আছে ধরে নিলে (অর্থাৎ প্রত্যেকের আয়া, ধরে নিলে) আয়-ব্যবধান সূচক (IGI)-টি হবে,

$$, \ IGI = \frac{\sum_{i=1}^{H}(y_P - y_i)}{y_P.H}$$

এভাবে হিসাব করার উদ্দেশ্য হল দেশের সমস্ত দরিদ্র মানুষকে দারিদ্র্য রেখার উপরে তুলে আনার জন্য যে পরিমাণ অর্থের (বা আয়ের) দরকার মোট আয়ের তুলনায় তা কতটা সেটা দেখা।

ফস্টার-গ্রিয়ার-থরবেক সূচক (Foster-Greer-Thorbecke Index): দারিদ্র্য পরিমাপের মাপকাঠি হিসাবে আয়-ব্যবধান সূচকটিরও কিছু ত্রুটি আছে। সূচকটির সাহায্যে দরিদ্রদের মধ্যেও যে আয়-বৈষম্য বর্তমান তা পরিমাপের চেষ্টা করা হলেও দারিদ্র্যের বণ্টনজনিত দিকটিকে একেবারে উপেক্ষা করা হয়েছে। এই ত্রুটি সংশোধনের চেষ্টা করা হয়েছে ফস্টার-গ্রিয়ার-থরবেক সূচকে। ফস্টার, গ্রিয়ার এবং থরবেক যে মাপকাঠিটির কথা বলেছেন তা সাধারণভাবে Pa শ্রেণির মাপকাঠি হিসেবে পরিচিত।

$$P_\alpha = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{H}\left(\frac{y_P - y_i}{y_P}\right)^\alpha$$

এই সমীকরণে α-র বিভিন্ন মান বসিয়ে আমরা দারিদ্র্য পরিমাপের বিভিন্ন মাপকাঠি পেতে পারি। যেমন $\alpha = 0$ হলে P_α সূচকটি মাথাগুনতি সূচকটির অনুরূপ হবে। আর যখন $\alpha = 2$ হবে, তখন

$$P_2 = HI\,[\,IGI^2 + (1 - IGI)^2\,(CV_p)^2\,]$$

হবে। CV_p এক্ষেত্রে দরিদ্র মানুষদের আয়ের বিচ্যুতির (গড় আয় থেকে বিচ্যুতির) এক ধরনের পরিমাপ। এই P_2 পরিমাপ অনুযায়ী যদি HI, IGI বা CV_p বাড়ে তাহলে দারিদ্র্যও বাড়বে।

১০.৯ দারিদ্র্যের সক্ষমতাভিত্তিক পরিমাপ (Capability Measure of Poverty)

আয়ভিত্তিক পরিমাপের ক্ষেত্রে আমরা জীবনের প্রাথমিক কয়েকটি প্রয়োজন থেকে বঞ্চনাকেই দারিদ্র্য হিসাবে ব্যাখ্যা করছিলাম। সক্ষমতাভিত্তিক পরিমাপের ক্ষেত্রে এই 'প্রাথমিক প্রয়োজন'-এর গণ্ডি ছাড়িয়ে আরেকটু প্রসারিত করা হয়েছে প্রয়োজনের তালিকাটিকে। কেবলমাত্র জৈবিক প্রয়োজনটুকু কোনোমতে

মিটে যাওয়ার অর্থই কি বেঁচে থাকা? বেঁচে থাকার জন্য মানুষ যেমন খাদ্য চায়, বস্ত্র চায়, মাথা গোঁজার ঠাঁই চায়, তেমনই সে চায় সবকিছু জানতে, শিখতে। শুধু কোনোমতে বেঁচে থাকা নয়, সে চায় একটু সুন্দরভাবে বাঁচতে। চায় দীর্ঘ জীবনও। মানুষের এই সব আকাঙ্ক্ষাকে স্বীকৃতি দিয়েই আমাদের দারিদ্র্যের পরিমাপ করতে হবে, সক্ষমতাভিত্তিক পরিমাপের এটিই মূল কথা। দারিদ্র্যের সক্ষমতাভিত্তিক পরিমাপের ক্ষেত্রে তাই তিনটি বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়-আয়ুষ্কাল, শিক্ষার মান ও জীবনযাত্রার মান। ১৯৯৭ সাল থেকে সক্ষমতার এইসব ধারণার ভিত্তিতে ইউ.এন.ডি.পি. দারিদ্র্য পরিমাপের যে সূচকটির প্রবর্তন করে তার নাম দেওয়া হয় মানব দারিদ্র্য সূচক। মানব দারিদ্র্য সূচকের মাপকাঠিও ঐ তিনটিই-আয়ুষ্কাল, শিক্ষার মান ও জীবনযাত্রার মান। বস্তুত ইউ.এন.ডি.পি. যে মানব উন্নয়ন সূচক প্রকাশ করে সেখানেও এই তিনটিই উন্নতি পরিমাপের মাপকাঠি। অর্থাৎ মানব উন্নয়ন সূচক যেখানে প্রাপ্তির দিকটি বিবেচনা করে, মানব দারিদ্র্য সূচক সেখানে বঞ্চনার পরিমাণটি হিসেব করে। মানব উন্নয়ন সূচক ও মানব দারিদ্র্য সূচককে তাই একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ হিসেবে গণ্য করা চলে।

১০.১০ মানব দারিদ্র্য সূচক (Human Poverty Index)

দীর্ঘদিন বেঁচে থাকা, সুস্থ ও সুন্দরভাবে বেঁচে থাকা এবং ঠিকমত শিক্ষালাভ, এই তিনটি সুযোগ থেকে কোনো দেশের নাগরিকরা কতটা বঞ্চিত তা দিয়েই সেই দেশের দারিদ্র্যের সঠিক পরিমাপ সম্ভব। দারিদ্র্যের এমনতরো পরিমাপকে বলা হয় মানব দারিদ্র্য সূচক। বিকাশশীল দেশগুলিতে সাধারণত এটা দেখা যায় যে যারা গরিব তারা খুব অল্প বয়সেই মারা যাচ্ছে। যথাযথ খাদ্য ও চিকিৎসার অভাবেই এটা হয়ে থাকে। দীর্ঘদিন বেঁচে থাকার সুযোগ থেকে মানুষ কতটা বঞ্চিত তা পরিমাপের জন্য তাই মাপকাঠি হিসেবে ধরা হয় চল্লিশ বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকার সম্ভাবনাকে, জন্মের পর কোনো মানুষের চল্লিশ বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকার সম্ভাবনা কতটা, সেটিকে। অন্যদিকে জ্ঞানলাভের সুযোগ থেকে বঞ্চনার অর্থ লেখাপড়ার মধ্য দিয়ে বৃহত্তর জগতের সঙ্গে যোগাযোগের সুযোগ থেকে বঞ্চিত থাকা। প্রাপ্তবয়স্কদের নিরক্ষরতার হার থেকেই এই বঞ্চনার হিসেবটা নেওয়া হয়।

১৯৯৭ সালে যখন ইউ. এন. ডি. পি. মানব দারিদ্র্য পরিমাপ শুরু করে তখন সুন্দর জীবনযাত্রার মান থেকে বঞ্চনার হিসেব করার জন্য তিনটি মাপকাঠিকে বেছে নেওয়া হয়েছিল। এক, মোট জনসংখ্যার শতকরা কতজন পরিশ্রুত জল পাওয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত। দুই, শতকরা কতজন শিশুর ওজন তাদের বয়সের তুলনায় কম। এবং তিন, জনসংখ্যার শতকরা কতজন স্বাস্থ্য পরিষেবা পাওয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত। কিন্তু প্রয়োজনীয় পরিসংখ্যানের অভাবে ২০০৩ সাল থেকে তৃতীয় মাপকাঠিটিকে বাদ দেওয়া হয়েছে। প্রথম দুটি মাপকাঠির গড় হিসেব দিয়েই এখন হিসেব করা হচ্ছে কোনো দেশের মানুষ সুন্দর জীবনযাত্রার সুযোগ থেকে কতটা বঞ্চিত।

মানব দারিদ্র্য সূচক অতএব তৈরি করা হয় বঞ্চনার উপরোক্ত তিনটি ধারণার উপর ভিত্তি করে। এই সূচক প্রকৃতপক্ষে তিনটি চলরাশি P1, P2, P3-এর গুরুত্বশীল গড় যেখানে

P1 = জন্মের পর ৪০ বছরের বেশি না বাঁচার সম্ভাবনা (এটিকে ১০০ দিয়ে গুণ করা হয়)

P2 = বয়স্ক নিরক্ষরতার হার

P3 = জনসংখ্যার কতজন পরিদ্রুত জলের সুযোগ থেকে বঞ্চিত এবং কতজন শিশুর ওজন বয়সের তুলনায় কম, এই দুইয়ের সাধারণ গড়। কোনো দেশে এই তিনটি চলরাশির মান নির্ধারণ করার পর নীচের সমীকরণটির সাহায্যে মানব দারিদ্র্য সূচক (HPI)-টির পরিমাপ করা হয়:

$$HPI = \left[\frac{1}{3}\left(P_1^{\alpha} + P_2^{\alpha} + P_3^{\alpha}\right)\right]^{1/\alpha}$$

এখানে a একটি ধ্রুবক। এই ধ্রুবকটির মান বাড়ার অর্থ বঞ্চনার মাত্রা বৃদ্ধি। যদি a = 1 হয় তাহলে মানব দারিদ্র্য সূচকটি বিভিন্ন ধরনের সাধারণ গড়ের সমান হবে। বঞ্চনার মাত্রাগুলি যত বাড়বে, সূচকের মানও তত বড় হবে।

UNDP কোনো দেশের মানব দারিদ্র্য সূচক নির্ণয় করার সময় a = 3 এই মান ব্যবহার করে। a = 3 ব্যবহার করার কারণ হল, যে ক্ষেত্রগুলিতে বঞ্চনা পরিলক্ষিত হয় সেগুলিকে অতিরিক্ত গুরুত্ব প্রদান করা। ২০০৪ সালের মানব উন্নয়ন প্রতিবেদনে মানব দারিদ্র্য সূচকের ক্ষেত্রে ২০০৩ সালে ভারতের ক্রম-অবস্থান ছিল ৯৬টি দেশের মধ্যে ৪৮। ২০০২ সালে এই অবস্থান ছিল ৯৬টি দেশের মধ্যে ৫৩।

অর্থনৈতিক সহযোগিতা ও উন্নয়ন সংগঠনের (Organization for Economic Coéôéoperation and Development বা OECD) কয়েকটি নির্বাচিত ক্ষেত্রে মানব দারিদ্র্য সূচকে তিনটির স্থানে চারটি উপাদান বিবেচিত হয়। উপরোক্ত তিনটি বঞ্চনা ছাড়াও সামাজিক পরিত্যাগের (social exclusion) বঞ্চনাও বিবেচনা করা হয়। এখানে UNDP-র মানব দারিদ্র্য সূচককে HPI-1 দ্বারা সূচিত করা হয় এবং OECD-র মানব দারিদ্র্য সূচককে HPI-2 দ্বারা চিহ্নিত করা হয়। HPI-2 হিসাব করার সূত্র হল নিম্নরূপ:

$$HPI-2 = \left[\frac{1}{4}\left(P_1^{\alpha} + P_2^{\alpha} + P_3^{\alpha} + P_4^{\alpha}\right)\right]^{1/\alpha}$$

যেখানে P_1 = জন্মের পর আয়ু 60 বছরের বেশি না হওয়ার সম্ভাবনা (100 গুণ)

P_2 = প্রাপ্ত বয়স্কদের কার্যকর সাক্ষরতার অভাব,

P_3 = আয়-দারিদ্র্য রেখার নীচে অবস্থানকারী জনসমষ্টি,

P_4 = দীর্ঘকালীন (একবছর বা তার বেশি) বেকারত্বের হার।

$\alpha = 4$

লক্ষণীয় যে, $\alpha = 1$ হলে উন্নয়নশীল এবং উন্নত উভয় দেশের ক্ষেত্রে মানব দারিদ্র্য সূচক মূল বঞ্চনার পরিমাপগুলির সরল যৌগিক গড়ে পরিণত হয়।

১০.১১ বিশ্ব ক্ষুধা সূচক (Global Hunger Index GHI)

এটি জাতীয়, আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক ক্ষুধার একটি বহুমাত্রিক পরিমাপ পদ্ধতি। এর মাধ্যমে ক্ষুধার বিভিন্ন দিকের ওপর ভিত্তি করে একটি সংখ্যা সূচক মান নির্ধারন করা হয় এবং তার ভিত্তিতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশগুলির মধ্যে তুলনা করা যেতে পারে। সময়ের সাথে সাথে ক্ষুধার পরিবর্তনের মূল্যায়ন ও বিশ্লেষণ করা সম্ভব। ২০০৬ সালে এই সূচকটি প্রবর্তন করা হয়, ইন্টারন্যাশনাল ফুড পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউট (IFPRI) এবং Welthungerhilfe এর যৌথ প্রচেষ্টায় এটি প্রকাশিত হয়।

২০২৪ সালের রিপোর্ট লিঙ্গ ন্যায়বিচার, জলবায়ু স্থিতিস্থাপকতা এবং খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তায় এর ভূমিকার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। লিঙ্গ বৈষম্য, ক্ষুধা এবং জলবায়ু পরিবর্তন এমনভাবে একত্রিত হয় যা পরিবার, সম্প্রদায় এবং দেশগুলিকে প্রভাবিত করে চরম চাপের মধ্যে রাখে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে মেয়েরা এই পরিস্থিতিতে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

ক্ষুধার সমস্যা জটিল, এবং এর বিভিন্ন রূপ বর্ণনা করতে বিভিন্ন পদ ব্যবহার করা হয়।

ক্ষুধা সাধারণত পর্যাপ্ত ক্যালোরির অভাবের সাথে সম্পর্কিত। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO) খাদ্য বঞ্চনা বা অপুষ্টিকে সংজ্ঞায়িত করে, একজন ব্যক্তির লিঙ্গ, বয়স এবং অভ্যাসগত ব্যবহারকে বিবেচনা করে ন্যূনতম খাদ্যতালিকা তৈরি করা যা তাকে ন্যুনতম শক্তি প্রদানে সমর্থ হয়। ব্যক্তির লিঙ্গ, বয়স, উচ্চতা, এবং শারীরিক কার্য্যকলাপ এক্ষেত্রে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়।

১০.১১.১ কিভাবে বিশ্ব ক্ষুধা সূচক বা GHI গণনা করা হয়

প্রতিটি দেশের GHI স্কোর একটি সূত্রের উপর ভিত্তি করে গণনা করা হয় যা চারটি সূচককে একত্রিত করে যা একসাথে ক্ষুধার বহুমাত্রিক প্রকৃতিকে ক্যাপচার করে:

অপুষ্টি: জনসংখ্যার অংশ যাদের ক্যালরি গ্রহণ অপর্যাপ্ত;

শিশু স্টান্টিং: পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুদের অংশ যাদের বয়সের জন্য কম উচ্চতা, দীর্ঘস্থায়ী অপুষ্টিকে প্রতিফলিত করে;

শিশু অপচয়: পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুদের অংশ যাদের উচ্চতার জন্য ওজন কম, তীব্র অপুষ্টি প্রতিফলিত হয়; এবং

শিশুমৃত্যু: তাদের পঞ্চম জন্মদিনের আগে মারা যাওয়া শিশুদের ভাগ, যা কিছু অংশে অপর্যাপ্ত পুষ্টি এবং অস্বাস্থ্যকর*পরিবেশের মারাত্মক মিশ্রণকে প্রতিফলিত করে।

১০.১১.২ GHI স্কোর একটি তিন-পদক্ষেপ প্রক্রিয়া ব্যবহার করে গণনা করা হয়:

আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত উত্স থেকে উপলব্ধ সর্বশেষ প্রকাশিত ডেটার উপর অঙ্কন করে প্রতিটি দেশের জন্য চারটি উপাদান সূচকের জন্য মান নির্ধারণ করা হয়।

চারটি উপাদান সূচকের প্রতিটিকে ১৯৮৮ সাল থেকে সেই সূচকের জন্য বিশ্বব্যাপী পরিলক্ষিত সর্বোচ্চ দেশ-স্তরের মানগুলির সামান্য উপরে থ্রেশহোল্ডের উপর ভিত্তি করে একটি প্রমিত স্কোর দেওয়া হয় । উদাহরণস্বরূপ, এই সময়ের মধ্যে অনুমান করা অপুষ্টির সর্বোচ্চ মান হল ৭৬.৫ শতাংশ, তাই থ্রেশহোল্ড প্রমিতকরণের জন্য ৮০ শতাংশে একটু বেশি সেট করা হয়েছে । একটি নির্দিষ্ট বছরে, যদি একটি দেশে ৪০ শতাংশের অপুষ্টির প্রাদুর্ভাব থাকে, তবে সেই বছরের জন্য তার মানসম্মত অপুষ্টির স্কোর ৫০। অন্য কথায়, সেই দেশটি কোনও অপুষ্টি নেই এবং সর্বাধিক পর্যবেক্ষণ করা স্তরে পৌঁছানোর মধ্যে প্রায় অর্ধেক পথ। এখানে প্রতিটি সূচককে প্রমিত করার জন্য ব্যবহৃত সূত্রগুলি রয়েছে:

(অপুষ্টির ব্যাপকতা/৮০) x 100 = মানসম্মত অপুষ্টির মান

(শিশু স্টান্টিং হার/৭০) x 100 = মানসম্মত শিশু স্টান্টিং মান

(শিশু নষ্টের হার/৩০) x 100 = মানসম্মত শিশু নষ্ট মূল্য

(শিশু মৃত্যুর হার/৩৫) x 100 = প্রমিত শিশু মৃত্যুর মান

প্রতিটি দেশের জন্য GHI স্কোর গণনা করার জন্য প্রমিত স্কোরগুলিকে একত্রিত করা হয়। অপুষ্টি এবং শিশুমৃত্যু প্রতিটি জিএইচআই স্কোরের এক-তৃতীয়াংশ অবদান রাখে, যখন শিশু স্টান্টিং এবং শিশু অপচয় প্রতিটি স্কোরের এক-ষষ্ঠাংশ অবদান রাখে, যেমন সূত্রে দেখানো হয়েছে।

এই গণনার ফলে ১০০-পয়েন্ট স্কেলে GHI স্কোর পাওয়া যায়, যেখানে ০ হল সেরা স্কোর (ক্ষুধা নেই) এবং ১০০ হল সবচেয়ে খারাপ। অনুশীলনে, এই চরমে পৌঁছানো যায় না। ১০০ এর মান ইঙ্গিত করবে যে একটি দেশের অপুষ্টি, শিশুর অপচয়, শিশু স্টান্টিং এবং শিশুমৃত্যুর মাত্রা প্রতিটি সাম্প্রতিক দশকগুলিতে বিশ্বব্যাপী পর্যবেক্ষণ করা সর্বোচ্চ মাত্রার থেকে সামান্য উপরে সেট করা থ্রেশহোল্ডগুলিকে ঠিক পূরণ করে। ০ এর মান মানে হবে যে একটি দেশের জনসংখ্যার মধ্যে কোন অপুষ্টির শিকার মানুষ নেই, পাঁচ বছরের কম বয়সী কোন শিশু নেই যারা নষ্ট বা অস্থির হয়ে পড়েছে এবং কোন শিশু নেই যারা তাদের পঞ্চম জন্মদিনের আগে মারা গেছে।

কীভাবে GHIé-এর অন্তর্নিহিত চারটি সূচক ক্ষুধার বহুমাত্রিক প্রকৃতিকে ধরে রাখে- -

পরিমাপ করে অপর্যাপ্ত খাদ্য অধিকার, ক্ষুধার একটি গুরুত্বপূর্ণ সূচক

শিশু এবং প্রাপ্তবয়স্ক উভয়ই সমগ্র জনসংখ্যাকে বোঝায়

সহনশীল উন্নয়ন লক্ষ্য 2S(DG2) জিরো হাঙ্গার সহ আন্তর্জাতিক ক্ষুধার লক্ষ্যমাত্রার জন্য একটি প্রধান সূচক হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

ক্যালোরি প্রাপ্যতার বাইরে যান, খাদ্যের গুণমান এবং ব্যবহারের দিকগুলি বিবেচনা করুন

পুষ্টির ঘাটতির জন্য শিশুদের বিশেষ দুর্বলতা প্রতিফলিত করুন

পরিবারের মধ্যে খাদ্যের অসম বণ্টনের প্রতি সংবেদনশীল

SDG 2 (শূন্য ক্ষুধা) এর জন্য পুষ্টি সূচক হিসাবে ব্যবহৃত

১০.১২ সারাংশ

দারিদ্র্যের সংজ্ঞা সঠিকভাবে দেওয়া খুবই কঠিন। সাধারণভাবে দরিদ্র বলতে আয় কম এমন মানুষকেই আমরা বুঝিয়ে থাকি। জীবনধারণের জন্য ন্যূনতম প্রয়োজন আবার স্থান, কাল এবং পাত্র ভেদে বিভিন্ন হয়। আবার দারিদ্র্য শুধু আয়ের বিভিন্নতার উপরই নির্ভরশীল তাও বলা যাবে না। দারিদ্র্যের আয়ভিত্তিক পরিমাপের ক্ষেত্রে দেখতে হয় যে কোনো মানুষ তার উপার্জিত অর্থে জীবনের প্রাথমিক প্রয়োজনগুলো মেটাতে পারছে কিনা। অন্যদিকে সক্ষমতাভিত্তিক পরিমাপের ক্ষেত্রে একটি সুন্দর জীবনযাপনের জন্য যতটা সক্ষমতা প্রয়োজন, তার থেকে কতটা কম সক্ষম তা বিচার করা হয়। দীর্ঘদিন বেঁচে থাকা, সুস্থ ও সুন্দরভাবে বেঁচে থাকা এবং ঠিকমতো শিক্ষালাভ, এই তিনটি সুযোগ থেকে কোনো দেশের নাগরিকরা কতটা বঞ্চিত তা দিয়েই সেই দেশের দারিদ্র্যের সঠিক পরিমাপ সম্ভব। দারিদ্র্যের এমন পরিমাপকে বলা হয় মানব দারিদ্র্য সূচক।

১০.১৩ অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন (প্রতিটির মান ২.৫)

(১) দারিদ্র্য কাকে বলে?

(২) দারিদ্র্যের পরিমাপ কীভাবে করা হয়?

(৩) দারিদ্র্যের সক্ষমতাভিত্তিক পরিমাপ কীভাবে করা হয়?

(৪) বিশ্ব ক্ষুধা সূচক কি ভাবে পরিমাপ করা হয়?

মাঝারি দৈর্ঘ্যের প্রশ্ন (প্রতিটির মান ৫)

(৪) দারিদ্র্যের আয়ভিত্তিক পরিমাপ কীভাবে করা হয়?

(৫) মাথাগুনতি সূচকের মাধ্যমে কীভাবে দারিদ্র্যের পরিমাপ করা হয়?

(৬) UNDP ১৯৯৭ সালে কীভাবে মানব দারিদ্র্যের পরিমাপ শুরু করে?

(৫) কীভাবে বিশ্ব ক্ষুধা সূচক বা GHI-এর অন্তর্নিহিত চারটি সূচক ক্ষুধার বহুমাত্রিক প্রকৃতিকে ধরে রাখে-

বড় প্রশ্ন (প্রতিটির মান ১০)

(৭) দারিদ্র্যের আয়-ব্যবধান সূচক কীভাবে নির্ণয় করা হয়?

(৮) দারিদ্র্য-ব্যবধান সূচকের মাধ্যমে কীভাবে দারিদ্র্য পরিমাপ করা হয়?

(৯) মাথাগুনতি সূচক কাকে বলে? মাথাগুনতি সূচকের সুবিধা ও অসুবিধাগুলি ব্যাখ্যা করুন।

(১০) মানব দারিদ্র্য সূচকের উপর একটি সংক্ষিপ্ত টীকা লিখুন।

সঠিক উত্তর নির্বাচনের প্রশ্নাবলী

১) বিশ্ব ক্ষুধা সূচক বা বহুজ্জ স্কোর গণনা করা হয়-

অ) তিন-পদক্ষেপ প্রক্রিয়া ব্যবহার করে গণনা করা হয়:

আ) দুই -পদক্ষেপ প্রক্রিয়া ব্যবহার করে গণনা করা হয়:

ই) তিন-পদক্ষেপ প্রক্রিয়া ব্যবহার করে গণনা করা হয়:

ঈ) পাঁচ-পদক্ষেপ প্রক্রিয়া ব্যবহার করে গণনা করা হয়:

২) কোন বছরের বিশ্ব ক্ষুধা সূচকের রিপোর্ট লিঙ্গ ন্যায়বিচার, জলবায়ু স্থিতিস্থাপকতা এবং খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তায় এর ভূমিকার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে।

অ) ২০০৬,

আ) ২০১২

ই) ২০১৮

ঈ) ২০২৪

৩) কীভাবে GHI-এর অন্তর্নিহিত চারটি সূচক ক্ষুধার বহুমাত্রিক প্রকৃতিকে ধরে রাখে -

অ) পরিমাপ করে অপর্যাপ্ত খাদ্য অধিকার, ক্ষুধার একটি গুরুত্বপূর্ণ সূচক

আ) পুষ্টির ঘাটতির জন্য শিশুদের বিশেষ দুর্বলতার প্রতি লক্ষ্য করা

ই) পরিবারের মধ্যে খাদ্যের অসম বণ্টনের প্রতি সংবেদনশীল থাকা দরকার

ঈ) সব কটিই

১০.১৪ গ্রন্থপঞ্জী

1. Sen– AmartyaéôéPoverty and Famines An Essay in Entitlement and Depreivation— Claredon Press– Oxford– 1984
2.. Sen– AmartyaéôéOn Economic Inequality– Claredon Press– Oxford– 1973
3. Kuznets– SéôéEconomic Growth and Income Inequality– 1955
4. Ray– DebrajéôéDevelopment Economics– Oxford University Press– New Delhi– 1998
5. Report of International Food Policy Research &Welthungerhlilfe. 2006